জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য

ও তাঁর জীবন ও দর্শন

পৃথ্বীরাজ সেন

জগদগুরু শঙ্করাচার্য

জীবন ও দর্শন

পৃথ্বীরাজ সেন

২২/সি কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :
শুভ রথযাত্রা, ১৪২৫
জুলাই, ২০১৮

প্রকাশক :
শ্রীপ্রশান্ত চক্রবর্ত্তী
গিরিজা লাইব্রেরী
২২/সি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯
ফোন : ২২৪১-৫৪৬৮/৯৬৭৪৯২১৭৫৮
Website : www.girijalibrary.com
Email : info@girijalibrary.com

ISBN No. : 978-93-87194-30-4

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীসঞ্জয় মাইতি

বর্ণ সংস্থাপনায় :
বর্ণায়ন
২বি/৩, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণ :
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রা. লি.
কলকাতা-৭০০ ০১৬

উৎসর্গ

ভারতের বৌদ্ধিক চিন্তনের মূর্ত প্রতীক
ডাঃ সুভাষ সরকারকে সশ্রদ্ধ অভিবাদনে

পৃথ্বীরাজ সেন

লেখকের কথা

সারা পৃথিবীর আধ্যাত্মিক জগতে জগদগুরু শঙ্করাচার্য এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। আজ থেকে অনেক বছর আগে দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্যের তালাদি গ্রামে পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন এই মহান মানুষটি। মাত্র ৩২টা বসন্ত পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ইতিবাচক কাজে লাগিয়েছেন। তিনি যখন আবির্ভূত হন তখন বৌদ্ধ ধর্ম সারা ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করেছিল। কিন্তু মহাত্মা বুদ্ধ যে অহিংসা মন্ত্রের কথা বলেছিলেন, তখনকার বৌদ্ধরা সেই মন্ত্র ভুলে গিয়েছিলেন। তখন বৌদ্ধ ধর্ম নানা তন্ত্রাচারে ছিল আক্রান্ত। ধর্মের নামে চলত ব্যভিচার। ধর্মের মুখোশ আঁটা কিছু মানুষ বুদ্ধের নাম বলে সাধারণ মানুষকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করত। এভাবেই তারা জীবিকা সংগ্রহ করত।

জগদগুরু শঙ্করাচার্য এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। এজন্য তাঁকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। এমনকি বেশ কয়েকবার তাঁর জীবন সংশয়ও দেখা দেয়। অকুতোভয় শঙ্করাচার্য কোনও কিছুকে তোয়াক্কা করেননি। জীবনব্যাপী সাধনার মাধ্যমে তিনি বৈদিক হিন্দুধর্মকে আবার তার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

শঙ্করাচার্য বুঝতে পেরেছিলেন হিন্দুধর্মকে একটি শক্ত সংগঠনের ওপর দাঁড় করাতে হবে। তা নাহলে হিন্দুধর্মের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তিনি ভারতের চারপ্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করেন। স্থাপন করেন দশজন বিশিষ্ট সাধকের নামে দশনামী সম্প্রদায়। তিনি অদ্বৈত দর্শনের নতুন ব্যাখ্যা সকলের সামনে তুলে ধরেন। এছাড়া অন্যান্য নানা বিষয়কে অবলম্বন করে একাধিক কালজয়ী বই রচনা করেন।

এভাবেই শঙ্করাচার্য ভারতের ধার্মিক সত্তাকে নতুনভাবে উদ্ঘাটিত করেছিলেন। আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়েও তাঁর প্রাসঙ্গিকতার কথা আমরা ভুলতে পারব না। আজকে যে হিন্দুধর্ম সারা ভারতবর্ষে শক্ত ভিত্তিমূলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার অন্তরালে আছেন এই মহাপ্রাণ মানুষটি। এই বইটির মাধ্যমে আমি শঙ্করাচার্যের অলৌকিক জীবনকথা বিবৃত করেছি। দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে তাঁর দ্বারা উপস্থাপিত অদ্বৈত দর্শনের কথা। তিনি কীভাবে দর্শনকে নানাভাবে নানা প্রকরণে এবং নানা ব্যবহারিক প্রয়োগের সাহায্যে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তারই একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে এই বইটির মধ্যে।

আশা করি এই বইটি জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকারা সাদরে গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদান্তে,
পৃথ্বীরাজ সেন

শুভ রথযাত্রা
১৪২৫

শঙ্করাচার্যের জীবন-কথা

আমাদের প্রকাশনায় লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—

1 হাজার বছরের ভারতের সাধক-সাধিকা
1 ভারতের ঋষি : জীবন ও সাধনা
1 শিবপুরাণ
1 অষ্টাদশ পুরাণ : কাহিনি সমগ্র
1 উপনিষদ গল্পসমগ্র
1 বাইবেল গল্পসমগ্র
1 ভারততীর্থ সমগ্র
1 সিদ্ধিদাতা গণেশ
1 কৃষ্ণসাধিকা মীরাবাঈ
1 বাংলার মাতৃসাধনা
1 লালন ফকির : জীবন ও সাধনা
1 ভগিনী নিবেদিতা : জীবন ও সাধনা
1 মহাত্মা কবীর : জীবন ও দোঁহাবলি
1 বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ
1 মহিয়সী রানী অহল্যাবাঈ

পুরাণে কথিত আছে পরশুরামের কুঠার নিক্ষেপের ফলে সমুদ্র থেকে কিছু ভূমিখণ্ড উঠে আসে। পরবর্তী সময়ে সেটাই কেরল নামে পরিচিত হয়। একসময়ে কেরল বোম্বাইয়ের অন্তর্গত ছিল। দীর্ঘদিন ধরে এখানকার মালাবারে নম্বুরি বা নম্বুভরি ব্রাহ্মণরা বাস করতেন। কথিত আছে সেই সময় পরশুরাম ঘোষণা করেছিলেন যে কলিযুগে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে সমগ্র আর্যাবর্তে বৈদিক ধর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। এই বৈদিক ধর্মকে সজীব রাখার জন্য তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণকুলকে আর্যাবর্ত থেকে দক্ষিণাপথের মালাবারে নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণরা সেখানে গিয়েই পরম নিষ্ঠা সহকারে বেদচর্চা করতে থাকেন। তাঁরা প্রাচীন বেদের বিভিন্ন ধারাকে কঠোর ও কঠিন অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে মেনে চলেন। ভাবতে অবাক লাগে, আজও কেরলের সেই গ্রামে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল একই রকম বিশুদ্ধ আছে। সেখানকার বেশির ভাগ মানুষের ভাষা সংস্কৃত। সন্ধ্যাবেলায় সেখানে ঈশ্বরের আরতি বন্দনা হয়। মানুষ যে ব্রহ্মের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা—এই উপলব্ধি অনুভব করার চেষ্টা করেন। আজও বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার তীব্র অহংকার প্রকাশিত হয় না।

মালাবার অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম কালাডি। এই কালাডিকে অনেকেই বলে থাকেন প্রকৃতির এক অপরূপা কন্যা। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এই গ্রামের। গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে কলস্বিনী আলোয়াই নদী। নারকেল আর সুপারি গাছে ঘেরা এই কালাডি, সত্যিই যেন এক টুকরো স্বর্গ! পাহাড় আর নদীর বিন্যাসে তার অপরূপ শোভা। প্রভাতে সূর্যের আলো যখন কালাডিকে স্পর্শ করে তখন শোনা যায় প্রভাত-সংগীত। পাখিরা কাকলি ধ্বনি করে। এই ভাবেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কালাডিতে প্রবহমান থাকে এক অপরূপ ভাবধারা। এ যেন মর্ত্যেই অভিভূত হবার পক্ষে স্বর্গের দেবতার উপাস্য ভূমিখণ্ড!

আজ থেকে তেরোশো বছর আগে নম্বুরি ব্রাহ্মণ বংশে শিবগুরু নামে বিশি এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ঈশ্বর—গবেষণায় মগ্ন। কৈশরেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রাজ্ঞ। তিনি সবসময় চোখ বন্ধ করে ভগবানের কথা চিন্তা করতেন। উপযুক্ত সময়ে তাঁকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়েছিল যদিও সংসারের প্রতি ছিল তাঁর বিতৃষ্ণা। শিবগুরুর বয়স যতই বাড়তে থাকে তাঁর উদাসীনতাও ততই বাড়তে থাকে। মানুষ কে? মানুষ কোথা থেকে এসেছে? মানুষের অন্তিম পরিণতি কী? এই সকল জটিল প্রশ্ন তাঁর মনে ঘুরতে থাকে। এই সব দেখে তাঁর পিতা চিন্তিত হয়ে পড়েন ও পুত্রের বিবাহ দেবেন বলে মনঃস্থির করেন। শিবগুরু ছিলেন তাঁদের একমাত্র সন্তান।

বিভিন্ন স্থানে লোক গেল পাত্রীর সন্ধানে। অবশেষে কাছেই একটি গ্রামে মখপণ্ডিতের কন্যা বিশিষ্টাদেবীর সঙ্গে শিবগুরুর বিয়ে ঠিক হয়। পাত্র ও পাত্রীর কুষ্ঠি পরীক্ষা করে সকলেই বললেন—একে অন্যের পরিপূরক। এই বন্ধন ছিল অবিচ্ছেদ্য। পবিত্র অগ্নিকে সাক্ষী করে এই বন্ধন রচনা করা হয়, সেই কারণেই হয়তো শিবগুরু এবং বিশিষ্টাদেবী সুখে শান্তিতে তাঁদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করতে পেরেছিলেন।

তবে দারিদ্র্য ছিল তাঁদের নিত্যসঙ্গী। তাঁদের ছিল সামান্য কিছু দেবত্তোর সম্পত্তি। সেই থেকে যে অর্থ আয় হত তাই দিয়েই তাঁরা সংসার চালাতেন। শিবগুরু শাস্ত্রালোচনায় যোগ দিতেন। তাঁর দিন কাটত দেব-সেবা করে। অল্পে তুষ্ট এই সাধু দম্পতির কোনো দুঃখ ছিল না। তবে একটি বিষয়ে শিবগুরুর দুঃখ ছিল। বার্ধক্য এলেও তাঁদের কোনো সন্তান হয়নি। সেই কারণে মাঝে মাঝে মনটা উদাস হয়ে যেত। তাঁর মৃত্যুর পর এই বংশের অবলুপ্তি ঘটবে এই কথাটা ভেবেই তিনি আকুল হয়ে পড়তেন।

বিশিষ্টাদেবী ছিলেন খুব অল্পে সুখী। তিনি সবসময় তাঁর স্বামীকে সাধ্যমতো সাহায্য করতেন ও ভালোবাসতেন। তাঁর স্বামী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হওয়ায় তিনি গর্ব বোধ করতেন। মাঝে মাঝে তাঁর মনও হাহাকার করত। ভাবতেন দেবতার করুণা ছাড়া কোনো মহিলা কি জননী হতে পারে? তাঁদের বয়স বেড়েছে। তাঁরা দুজনেই পুত্র কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। বিশিষ্টাদেবী ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান—হে ঈশ্বর, তুমিই তো এই জগতের প্রতিষ্ঠাতা। তোমারই নির্দেশে বিশ্বভুবন পরিচালিত হচ্ছে। তুমি এক সুশৃঙ্খল নিয়মনীতির জনক। তুমি কি হতভাগ্য এই দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মনোবাসনার কথা শুনবে না?

একদিন তাঁরা হঠাৎই আশার আলো দেখতে পেলেন। অমাবস্যার অন্ধকার ঘনীভূত। তাঁদের মনে হল ওই বৃষপর্বতের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে যে চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবলিঙ্গ রয়েছে তাঁকে আরাধনা করতে হবে। তাঁর কাছে বলতে হবে মনের কথা। শিব অল্পতেই তুষ্ট। তাঁদের বিশ্বাস, একদিন তাঁরা মহাদেবের অনুগ্রহ লাভ করতে পারবেন।

সেই থেকেই শুরু হল কৃচ্ছ্রসাধনা, আন্তরিক উপাসনা, গার্হস্থ্য কর্মে আর তাঁদের মন বসে না। তাঁরা দুজনেই তখন চোখ বন্ধ করে শিবের ধ্যানে মগ্ন। হঠাৎ একদিন মহেশ্বরের সিংহাসন টলে উঠল। চন্দ্রমৌলীশ্বর তাঁর এই দুই ভক্তের আকুল আহ্বান শুনে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি তাঁদের স্বপ্নে দেখা দিলেন। অলৌকিক জ্যোতির্বলয় দেখা দিল চারপাশে। ঘুম ভেঙে গেল দুজনের। বিস্ময়ে তাঁরা পরস্পরের দিকে তাকালেন।

স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব এসে উপস্থিত হয়েছেন এমন মনে হল। তিনি বলছেন—তোমাদের তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট। বলো কী বর চাও?

মহাদেবকে সামনে দেখে শিবগুরু কেমন হয়ে গেছেন। তাঁর মনে অনেক কথা, তিনি অনেক কিছু বলতে চাইলেও তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে। অবশেষে কম্পিত কণ্ঠস্বরে তিনি বললেন—কী আর চাইব প্রভু, আমাদের একটি পুত্র দাও।

মহাদেব হাসলেন, সেই হাসির মধ্যে একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যের ভাব ছিল। তাঁরা অবাক হলেন। তবে কি কোনো অমঙ্গলের নিশানা?

মহাদেব বললেন—বেশ এই প্রার্থনা সফল হবে। কিন্তু যদি সর্বজ্ঞ পুত্র প্রার্থনা করো, তবে তাঁর আয়ু হবে স্বল্প। আর যদি দীর্ঘায়ু পুত্র কামনা করো, তবে সে হবে নির্গুণ।

তাঁরা এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন—ভগবান, আমাদের, সর্বজ্ঞ পুত্র দেবেন। পুত্র দীর্ঘায়ু হলে কী লাভ যদি সে মুর্খ হয়ে বেঁচে থাকে?

তাঁদের এই কথা শুনে মহাদেব খুশি হয়ে বললেন—বেশ তাই হবে। আমি পুত্র হিসাবে তোমাদের কাছে ধরা দেবো।

তার পরেই সব অন্ধকার হয়ে গেল। তাঁরা দুজনে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। আকাশে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র ভিড় করেছে। তাঁদের অদ্ভুত চেতনার জাগরণ হল। তাঁরা বুঝতে পারলেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করলে নিজেদের কেমন মনে হয়।

ভগবানের পূজা শুরু হল। অপেক্ষা কবে আসবে এই মাহেন্দ্রক্ষণ? কবে স্বয়ং মহাদেব পুত্ররূপে ধরা দেবেন? অবশেষে ৬৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে মায়ের কোল আলো করে আবির্ভাব হলেন স্বয়ং মহেশ্বর। নবজাতকের নাম দেওয়া হল শঙ্কর। দেবজ্ঞদের কাছে গিয়ে শঙ্করের জন্মকুণ্ডলী তৈরি করা হল। এই ছেলে যে দেব-অবতার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নবজাতকের সকল অঙ্গ থেকেই দেব-চিহ্নের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। দেখা গেল বত্রিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার ছাড়পত্র পাবে এই শিশুটি। তারপর পৃথিবী থেকে বিদায়ের পালা।

এই অল্পায়ুর কথা শুনে তাঁরা দুজনেই দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। তবে তাঁরা জানতেন এটাই বিধির বিধান। মহাদেব বলেছিলেন—পণ্ডিত পুত্র হলে সে হবে স্বল্পায়ু। এ ব্যাপারে মানুষের কিছু করার নেই। সবই ভাগ্যের পরিহাস! তাঁরা সেই পুত্রকে প্রতিপালন করতে থাকলেন।

শৈশব থেকেই শঙ্কর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। এক বছর পূর্ণ না হতেই তিনি মাতৃভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন, যে কোনো লোকের সঙ্গে অনর্গল কথা বলতে পারতেন। শঙ্কর তাঁর মায়ের কাছ থেকে শুনেই পুরাণ ও ইতিহাস-ইতিবৃত্ত আয়ত্ত করেছিলেন। দু-তিন বছর বয়সেই আয়ত্ত করেন পুরাণের গল্প। পুরাণের বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করে দেখাতেন। যা দেখে আত্মীয় পরিজনেরা অবাক হয়ে যেতেন।

তিন বছর বয়সের মধ্যে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, উপনিষদ, জ্ঞান, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক প্রভৃতি শাস্ত্র আত্মস্থ করেন। এই সময়েই কয়েকদিনের জ্বরে শঙ্করের পিতার মৃত্যু হয়। সংসারে নেমে আসে আরও দারিদ্র্য। সদ্যবিধবা শঙ্করের মা-কে অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সংসার প্রতিপালন করতে হল। ছেলের বয়স পাঁচ পূর্ণ হলে বংশের নিয়ম অনুসারে তাঁর উপনয়ন হল। এরপরে তাঁর মা চোখের জলে তাঁকে বিদায় জানালেন। পাঠালেন গুরুগৃহে। সেখানে না গেলে বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হবে না। এবারে বিশিষ্টাদেবীর দিন কাটতে থাকে একাকী। স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, একমাত্র পুত্র সে-ও গুরুগৃহে। তিনি এই দুঃখের দিনেও ভেঙে পড়েননি। তিনি ছিলেন সহনশীলা রমণী। পুত্রের মঙ্গল-কামনায় তিনি স্তব করতেন।

দিন কাটতে থাকে। দু-বছরের মধ্যেই শঙ্কর সব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন। তাঁর যখন সাত বছর বয়স তখন তাঁর জ্ঞানের প্রাচুর্য দেখে পণ্ডিতেরা অবাক হয়ে গেলেন। বয়োজ্যেষ্ঠদের তিনি সম্মান করতেন। তর্কযুদ্ধে আহ্বান করতেন অন্যান্য ছাত্রদের। তাদেরকে একের পর এক প্রশ্ন করতেন। শঙ্করের জ্ঞানের গভীরতা দেখে মাস্টারমশাইরা অবাক হয়ে যেতেন। গুরুগৃহের অধ্যক্ষ তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—একদিন তুমি জ্ঞান-আলোচনায় আমাকেও ছাড়িয়ে যাবে, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

বৈদিক ধর্মের নীতি অনুযায়ী আবাসিক ছাত্রদের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। কারণ সহ্যশক্তি, বিনয় ইত্যাদির পরীক্ষা। শঙ্করকেও তাই ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করতে হল। গেরুয়া পোশাক পরলেন। শঙ্কর একদিন ভিক্ষায় বের হয়ে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর ঘরে কিছুই ছিল না। কী করে ভিক্ষা দেবেন? বালক শঙ্করের মুখ দেখে ব্রাহ্মণীর হৃদয় গলে গেল। শঙ্করের মুখ থেকে বের হল তিনটি শব্দ—ভবতি ভিক্ষাং দেহি অর্থাৎ আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও, এই কথা শুনে ব্রাহ্মণীর প্রাণ আকুল হয়ে উঠল।

নিরুপায় হয়ে ব্রাহ্মণী শঙ্করের হাতে একটি আমলকি ফল তুলে দিলেন। তারপরে তিনি চোখের জলে তাঁর সংসারের দরিদ্রতার কথা শোনালেন। বাল্যকাল থেকেই দেব-দেবীর প্রতি শঙ্করের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি জানতেন মানুষের জীবনে দুঃখের ঘন কালো আঁধার কাটাতে হলে এক মনে ঈশ্বরের প্রার্থনা করা উচিত। অহংবোধকে বিসর্জন দিতে হবে। থাকবে না আমিত্ব বোধ। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কর চোখ বন্ধ করে লক্ষ্মীর স্তব রচনা করলেন। সেই সঙ্গে লক্ষ্মীর বন্দনা। তাঁর বন্দনাতে মা লক্ষ্মী খুশি হয়েছিলেন। শঙ্কর করজোড়ে প্রার্থনা করলেন—মা, ব্রাহ্মণের সংসারে সব দুঃখ দূর করে দাও।

রাত্রি শেষ হলে, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ঘুম থেকে উঠে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলেন। তাঁরা দেখলেন সমস্ত ঘরে সোনার আমলকি ছড়ানো রয়েছে। তাঁরা বুঝতে পারলেন এসবই হল ওই কিশোর সন্ন্যাসীর অপার করুণা!

শঙ্কর শাস্ত্রপাঠ ছাড়া অন্য কাজে মন বসাতে পারতেন না। শাস্ত্র পাঠে কেটে যায় সারাদিন। তিনি ছিলেন অসম্ভব স্মৃতিধর। তিনি সাবলীলভাবে পুঁথি থেকে যে কোনো স্তোত্র উচ্চারণ করতে পারতেন। মানুষকে মোহিত করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে। সাতবছর বয়সেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। দলে দলে লোক আসে তাঁকে দেখতে। এবারে অনেক ছাত্র আসে শঙ্করের কাছে বেদশিক্ষা নিতে। শঙ্কর কাউকে ফেরান না। ক্লান্তি তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। তিনি সকলের সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলছেন। সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠে তিনি ঈশ্বরের প্রার্থনা করতেন। নিয়মিত ধ্যান ও যোগ অভ্যাস করে শুরু করতেন শাস্ত্র আলোচনা। হাসিমুখে শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মত-বিনিময় করতেন। অজ্ঞানকে জ্ঞান দিতেন। যে সকল মানুষের ভগবানের প্রতি বিশ্বাস নেই, সেই সব নাস্তিকেরাও শঙ্করের সংস্পর্শে এসে একেবারে পালটে গেছেন। তিনি ছড়িয়ে আছেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা থেকে বৃহৎ-নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝে। মানুষ তাঁর কাছে অসহায় এক ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। শঙ্কর বালক বয়স থেকেই সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের দ্বারাই বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের অন্তরালে প্রয়োজন আধ্যাত্মিক চেতনা। মানুষের মনকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত না করতে পারলে কোনো বিপ্লবই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

শঙ্করের এই জনপ্রিয়তার কথা কেরলের রাজার কানে গিয়ে পৌঁছল। কেরলের রাজা ছিলেন অত্যন্ত পণ্ডিত। তিনি শ্রদ্ধা করতেন বিদ্বানদের। তিনি অর্থ উপার্জনকেই জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে স্বীকার করতেন না। তাঁর রাজসভায় আসতেন অনেক জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতরা। তিনি শঙ্করকে দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এবং এই অলৌকিক বালককে দেখার জন্য রাজা স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে মন্ত্রিকে পাঠালেন। মন্ত্রি স্বর্ণমুদ্রা শঙ্করের হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু, শঙ্কর এই স্বর্ণমুদ্রায় বিন্দুমাত্র প্রলোভিত হলেন না। কিন্তু তিনি সরাসরি এই স্বর্ণমুদ্রা প্রত্যাখ্যানও করতে পারলেন না। তিনি হেসে মন্ত্রিমশায়কে বললেন—মন্ত্রিমশাই, রাজানুগ্রহে আমার কোনো অভাব নেই। স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আমি কী করব? আমি তো একদিন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হব। জাগতিক বিষয়ের ওপর আমার আকর্ষণ থাকবে কী করে। শাস্ত্রানুসারে ভিক্ষাই আমার একমাত্র জীবিকা। রাজাকে বলবেন, তিনি যেন প্রোলোভন দেখিয়ে আমাকে বিপথে চালিত না করেন। তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন তার জন্যই আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করতে পারব না। আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আশা করি আপনি আমার অক্ষমতার কথা রাজাকে বুঝিয়ে বলবেন।

শঙ্করের মতো বালকের কাছে এসে মন্ত্রি বুঝলেন, পৃথিবীর সব মানুষকে অর্থ দিয়ে কেনা সম্ভব নয়। অথচ শঙ্করের আচরণের মধ্যে বিন্দুমাত্র ঔদ্ধত্যের ছাপ নেই।

মন্ত্রি রাজার সঙ্গে দেখা করে রাজার কাছে সব কথা জানালেন। সকলেই ভেবেছিলেন কেরলরাজ এই কথা শুনে খুব রেগে যাবেন। কিন্তু দেখা গেল অন্য দৃশ্য! কেরলরাজ বুঝতে পারলেন, শঙ্করকে এভাবে আমন্ত্রণ জানানো ধৃষ্টতার নামান্তর মাত্র। অবশেষে তিনি নিজে নগ্ন পায়ে এসে হাজির হন শঙ্করের বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অমাত্যরা, ছিলেন মন্ত্রিসভার সদস্যরা।

রাজা শঙ্করের পর্ণকুটিরে পদার্পণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শঙ্কর তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন। শঙ্করের জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখে কেরলরাজা অবাক হলেন। কেরলরাজের সঙ্গে শুরু হল নিভৃত আলোচনা। একটির পর একটি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তির পরিচয় দেন তিনি।

কেরলের রাজা বুঝতে পারলেন, শঙ্কর শাস্ত্রের অন্তঃস্থলে প্রবেশের অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যে কোথাও কোনো ত্রুটি বা অতিরঞ্জন ছিল না। এই সভায় যোগ দিয়ে রাজা নিজের দীনতা এবং অক্ষমতাকে বুঝতে পারলেন। কেরলের রাজা বংশ পরম্পরায় রাজ্যকে শাসন করছেন। কেরলের অসংখ্য মানুষের ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসে আছেন রাজ সিংহাসনে। কিন্তু, শিক্ষার দিক থেকে তাঁরা শঙ্করের কাছে ম্রিয়মান। রাজা শঙ্করকে বহু স্বর্ণমুদ্রা দান করতে চাইলেন।

শঙ্কর বিনীতভাবে রাজাকে জানালেন—মহারাজ, আপনার অনুগ্রহ আমি মাথায় রাখছি। কিন্তু, এই দান আমি গ্রহণ করতে পারব না। আমি ব্রহ্মচারী, আমি কোনো দান গ্রহণ করতে পারব না। আমাদের কিছু দেবত্তোর সম্পত্তি আছে। সেই সম্পত্তি থেকে যা আয় হয় তাই দিয়ে আমার বিধবা মা দিন অতিবাহিত করেন।

রাজা তখন বললেন—আপনাকে দান করব বলে আমি যা নিয়ে এসেছি, তা ফিরিয়ে নিয়ে যাব? তাহলে আমার পাপ হবে। আপনার পাণ্ডিত্যের ছটায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে পরাঙ্মুখ করবেন না।

রাজা বারে বারে শঙ্করকে অনুরোধ করলেন, শঙ্কর তখন উভয় সংকটে পড়ে গেলেন। চেতনার প্রথম প্রহর থেকে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে সবকিছু নিবেদন করেছেন। অবশেষে শঙ্কর একটি সুন্দর সমাধান সূত্র বের করলেন। তিনি বললেন—আপনি এইসব বস্তু কোনো সৎপাত্রে দান করুন।

রাজা বললেন—ব্রাহ্মণের জীবন বিদ্যাদানের জন্য। আর রাজার কাজ হল ধনদান। ঈশ্বর এভাবেই শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ এবং রাজাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এর আগে অনেক জটিল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করেছি। এই সমস্যার সমাধান কী করে করব? এটি আপনিই ভালোভাবে করতে পারবেন।

শঙ্কর তখন বললেন—আপনি উপস্থিত ব্রাহ্মণদের হাতে সব কিছু বিলিয়ে দিন। দেখবেন, তাহলে আপনার অন্তর শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

শঙ্করের এই বিচক্ষণতা দেখে রাজা আরও একবার খুশি হলেন। রাজার আদেশে সমস্ত ধনসম্পত্তি মণিমাণিক্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরিত হল। ব্রাহ্মণেরা উচ্চস্বরে শঙ্করের নামে জয়ধ্বনি করলেন। শঙ্করের সঙ্গে কথা বলে তিনি আবার রাজধানীর দিকে যাত্রা করলেন।

ছেলেবেলা থেকেই শঙ্কর মাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি মাকে জীবন্ত ঈশ্বর হিসাবে পুজো করতেন। তাঁর মা প্রতিদিন আলোয়াই নদীতে স্নান করতে যেতেন। একদিন গ্রীষ্মকালে তাঁর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে শঙ্কর মায়ের খোঁজে বের হলেন। কিছুদূর গিয়ে দেখেন রাস্তার একধারে বিশিষ্টাদেবী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ।

মাকে এই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে শঙ্করের বুক ফেটে গেল। তিনি ভাবলেন এ কী হল? কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণের চরণে শঙ্কর বারবার প্রার্থনা জানাতে থাকলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেন মায়ের সমস্ত যন্ত্রণার উপশম ঘটান।

এর কিছুদিন বাদে শুরু হল বর্ষা। বর্ষায় আলোয়াই নদী পূর্ণ হয়ে উঠল। এবং এই নদী তার গতি পরিবর্তন করল। আগে সে গ্রামের অনেক মাইল দূর দিয়ে প্রবাহিত হত, এরপর থেকে সে গতি পরিবর্তন করে শঙ্করের গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করল। তার মানে বিশ্বাসের অসাধ্য কিছু নেই! বিশিষ্টাদেবীকে আর স্নান করতে দূরে যেতে হবে না। জয় হল শঙ্করের মাতৃভক্তির। এই ঘটনায় বিশিষ্টাদেবীর আনন্দের সীমা থাকল না। তিনি বুঝতে পারলেন, শঙ্করের সাধনার দ্বারাই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। যদিও এতে শঙ্করের মা খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। কারণ এইভাবে শঙ্করের অলৌকিক ক্ষমতা উদ্ভাসিত হতে থাকলে শঙ্কর কি সংসারী হবেন? কোনো মা-ই চান না তাঁর পুত্র সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবেন। শঙ্করের মা বুঝতে পারলেন এবারে বোধ হয় সর্বনাশা সংকেত দেখা দিয়েছে। শঙ্করকে আর বেশিদিন গৃহাঙ্গনে আটকে রাখা সম্ভব হবে না।

শঙ্করের এই অলৌকিক প্রতিভার কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এবারে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে অসংখ্য মানুষ এলেন তাঁকে দেখতে। নানা মানুষ নানা সমস্যা নিয়ে উপস্থিত। বন্ধ্যা জননীরা আসছেন পুত্র কামনায়, দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসেন ধন কামনায়, যোদ্ধা আসে যুদ্ধে জয়লাভের আসায়, কেউ-বা অপরের ওপর প্রভাব বিস্তারে আগ্রহী। নানা মানুষের নানা কৌতূহল! শঙ্করকে তখন নানা ধরনের অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। যে কাজ তিনি করতে পারবেন না সেখানে তিনি নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করছেন। যে-সকল মানুষ উদ্ধত আচরণ করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা শঙ্করের সান্নিধ্যে এসে বদলে গেলেন। কখন যে তাঁরা শঙ্করের অনুগামী হয়ে গেছেন কেউ জানে না।

এরপর কয়েকজন পণ্ডিত এলেন শঙ্করের ঠিকুজি পরীক্ষা করতে। কারণ তাঁর জন্মের সময়ে যে-সকল গ্রহ-নক্ষত্রের সন্নিবেশ ঘটেছিল, তা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। এবারে তাঁরা বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনার মধ্যে দিয়ে চিহ্নিত করতে চাইলেন। হঠাৎ পণ্ডিতেরা গণনা থামিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বিশিষ্টাদেবী বুঝতে পারলেন তাঁরা কোনো একটি সর্বনাশা ঘটনার কথা জানতে পেরেছেন। পণ্ডিতেরা কী বলছেন তা তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা আরও একটু সময় নিয়ে ভালো করে কুষ্ঠি বিচার করে দেখলেন, শঙ্করের আয়ু আট বছর। কিন্ত সে-কথা তাঁরা মায়ের কাছে বলবেন কী করে? তাহলে আর দু—-তিন বছর বাদেই শঙ্করের ভবলীলা সাঙ্গ হবে।

অবশেষে পণ্ডিতেরা মাঝামাঝি একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রধান পণ্ডিত বললেন—শঙ্করের আয়ু আট বছর। তবে তপস্যায় আরও আট বর্ধিত হবে।

এই কথা শুনে বিশিষ্টাদেবী অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আট বছর পূর্ণ হতে তখন আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। কবে থেকে শঙ্কর তপস্যা করবেন? তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হলে, আর মাত্র আট বছর পরমায়ু বাড়বে।

শঙ্করও একথা জানতে পারলেন। তিনি ভাবলেন, জ্ঞান লাভ না করে যদি মৃত্যু হয় তাহলে ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হবার জন্য আবার জন্ম নিতে হবে। জীবন কত দিনের? পদ্মপাতায় জলের মতো এত অল্প সময়ের মধ্যে কি জ্ঞানলাভ করা সম্ভব? তবে শাস্ত্রে আছে, সন্ন্যাস গ্রহণ করলে পরকালে সদগতি লাভ হয়। তখন আর মনুষ্য জন্ম নিতে হয় না।

শঙ্কর অনেক কিছু ভেবে তাঁর মায়ের কাছে এসে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করলেন। তখন মধ্যরাত্রি, মা ও পুত্রের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা চলেছে। মা এখন কী করবেন? যদি পুত্রকে বাধা দেন তাহলে অচিরেই পুত্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন। শোকাচ্ছন্ন মাকে জীবন কাটাতে হবে একাকিনী। আর যদি শঙ্করের প্রস্তাবে মা রাজি হন, তাহলেও তাঁকে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হবে।

রাত্রি কাটল। মা ও ছেলের দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে সময় কাটতে থাকল। শঙ্কর তাঁর মায়ের কাছ থেকে তখনও কোনো সম্মতি পেলেন না। মায়ের কাছ থেকে সম্মতি না পেলে তিনি কখনোই সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন না।

এর কয়েকদিন বাদে শঙ্কর আর তাঁর মা আলোয়াই নদীতে স্নান করতে যান। এই নদীতে তাঁরা মাঝেমধ্যেই স্নান করতে আসতেন। স্নান শেষ হয়ে গেছে। হঠাৎ বিশিষ্টাদেবী শঙ্করের চিৎকার শুনতে পেলেন। তিনি ফিরে দেখলেন প্রকাণ্ড একটা কুমির শঙ্করকে মুখে করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই সঙ্গে যাঁরা স্নান করছিলেন সকলেই জলে ঝাঁপ দিলেন। বিশিষ্টাদেবী বুঝতে পারলেন একটু বাদেই নদীর জল লাল হয়ে উঠবে। হায় ঈশ্বর! তুমি আমার এ কী করলে? মহাদেবকে স্মরণ করতে থাকলেন তিনি।

তখন শঙ্কর মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন—মাগো, আমার শেষ সময় উপস্থিত। তুমি যদি আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিতে তাহলে হয়তো আমার ভাগ্যে এমন ঘটত না। এখন আমার অন্তিম সময়, মা তুমি আজ্ঞা করো, আমি যেন সন্ন্যাস ব্রত নিতে পারি। ঈশ্বরকে স্মরণ করে অন্তিম সময়ে আমি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতে চাইছি।

ছেলের এই অবস্থা দেখে মা বলেন—বেশ তাই হোক। অনুমতি দিলাম বাবা।

বিশিষ্টাদেবী জ্ঞান হারালেন। ধরাধরি করে তাঁকে ডাঙায় তোলা হল। কুমির-সহ শঙ্করকে তাঁরা জালে জড়িয়ে ডাঙায় তুলে আনলেন। গ্রামের লোকেরা শুশ্রূষা করে মা এবং ছেলে দুজনকেই ভালো করে তুললেন। শঙ্করকে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হল। ধীরে ধীরে তাঁর ক্ষত নিরাময় হল। শঙ্কর বুঝতে পেরেছিলেন এবার তাঁকে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করতে হবে। তিনি আর গৃহে বাস করতে পারেন না। শঙ্কর ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি জানেন মায়ের বচন আর ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

শঙ্কর বললেন—মা, এখন থেকে আমাকে গাছতলায় থাকতে হবে। না হলে তুমি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হবে।

মা হেসে বললেন—সে কী বাবা? তুই বড্ড ছেলেমানুষ। তুই যদি আজ আমাকে ছেড়ে চলে যাস তাহলে আমাকে কে দেখবে? কে আমার অন্ন-পথ্য আর জলের ব্যবস্থা করে দেবে?

মায়ের দিকে তাকিয়ে শঙ্করের বুক ভেঙে গেল তবে শঙ্কর নিজের কর্তব্যে অনড়। মা শঙ্করের কাছে নিজের অসহায়তার কথা বলে কাঁদতে লাগলেন। শঙ্কর তখন অসহায়, মায়ের মৃত্যুকালে তাঁকে দর্শন দেবেন বলে তাঁর কাছে অঙ্গীকার করলেন।

শঙ্করের মায়ের চোখে সবকিছু পরিষ্কার। তিনি জানতেন শঙ্করের জন্মবৃত্তান্ত। মহাদেব বলেছিলেন যে জ্ঞানবান পুত্র হলে সে হবে স্বল্পায়ু। প্রতিবেশীরা এখন সশ্রদ্ধ চিত্তে বিশিষ্টাদেবীর দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন তিনি পুত্র-গৌরবে, আনন্দে আত্মহারা। বিশিষ্টাদেবী আর বাধার সৃষ্টি করলেন না। দেবতার বিধানে এবং আশীর্বাদে মায়ের মন এখন অনেকটা শক্ত হয়ে গেছে। তাঁর মনের ভেতর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জন্ম হয়েছে। তিনি নিজের হাতে ছেলেকে সন্ন্যাস-বেশে সাজিয়ে দিলেন।

কালাডি গ্রামের সকলেই অবাক হলেন। আট বছরের বালক শঙ্কর সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করলেন। গ্রামের অসংখ্য মানুষের সঙ্গে তাঁর মা বিশিষ্টাদেবীও তাঁকে অনুসরণ করলেন। শঙ্কর জানেন পেছন দিকে তাকালে তাঁর হৃদয় ভেঙে যাবে। তিনি তাঁর ব্রতে অনড় থাকতে পারবেন না। তিনি এও জানেন তাঁর জীবনের আয়ু বেশিদিনের নয়। মাত্র কয়েকদিনের জন্য তিনি পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁর অনেক কাজ বাকি। ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটাতে হবে।

দুই

ধীরে ধীরে শঙ্কর এসে উপস্থিত হলেন কেশব মন্দিরে। তাঁর কণ্ঠে কেশববন্দনা। চোখের জলে তিনি ধুয়ে দিলেন কেশবের পা-দুটি। এই মন্দিরের বিগ্রহ সহ্য করেছে দীর্ঘ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। কেশব বিগ্রহকে বুকে করে বাইরে নিয়ে এসে তাঁকে নিরাপদ স্থানে প্রতিষ্ঠা করলেন। গ্রামবাসীদের বললেন, এখানে অচিরে একটি মন্দির তৈরি হবে।

এবারে শঙ্করের লক্ষ্য নর্মদা তীর—সেখানে অনেক মানুষ তপস্যা করে জ্ঞানলাভ করেছেন। এখানেই ব্রহ্মবিদ্যার মহাযোগী গোবিন্দপাদের দর্শন লাভ করতে হবে। এ খুবই কঠিন কাজ! তিনি যখন গুরুগৃহে থেকে পাতঞ্জলি মহাভাষ্য পাঠ করতেন তখনই তিনি শুনেছিলেন গোবিন্দপাদের নাম। তিনি এও শুনেছিলেন, গোবিন্দপাদ হলেন যোগসূত্রের প্রণেতা। তিনি নর্মদার তীরে কোনো এক অজ্ঞাত গুহায় সমাধি লাভ করে আছেন।

গোবিন্দপাদ কে? তাঁর ঐতিহাসিক পরিচয়ই বা কী? তা আমরা জানি না।

আচার্য গৌড়পাদের মাণ্ডুক্য উপনিষদকারিকা সুপ্রসিদ্ধ। গোবিন্দপাদাচার্যের কোনো রচনা এখন আর পাওয়া যায় না। যদিও রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট তখন তিনি গোবিন্দপাদাচার্যের কারিকা উদ্ধৃত করেছিলেন।

গোবিন্দপাদ কাউকে শিষ্যপদে বরণ করতে চাননি, প্রবাদ আছে যে ব্যক্তি সমগ্র নর্মদার পবিত্র জল একটি কুম্ভ অর্থাৎ কলসীর মধ্যে ভরতে পারবেন, তিনি যদি তাঁর সন্নিকটে আসেন তাহলেই গোবিন্দপাদের সমাধি ভঙ্গ হবে। শঙ্করাচার্য তাঁর সন্ধানে বার হলেন, জনপথ, পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল। তিনি নির্ভয়ে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে এগিয়ে চললেন। এই দেব-প্রতিভার অধিকারী শিশু সন্ন্যাসীকে দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে পথচলতি মানুষজন। পথের মাঝে যাদের সঙ্গে দেখা হয় তাকেই তিনি আকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করছেন—বলতে পারেন নর্মদা আর কত দূর? বলতে পারেন নর্মদা তীরের কোন গুহায় গোবিন্দপাদ ধ্যানমগ্ন?

কেউই তাঁকে সঠিক জবাব দিতে পারলেন না। কিন্তু, শঙ্কর দৃঢ় সংকল্প যে তিনি যে কাজের জন্য বেরিয়েছেন, সেই কাজ তাঁকে করতেই হবে। চলতে চলতেই একদিন তিনি একটি অলৌকিক দৃশ্য দেখলেন। পুকুরে কয়েকটি ব্যাঙ লাফালাফি করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আর তখন তাদের ছায়া দান করছে কৃষ্ণবর্ণ একটি সাপ। এমন ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখলে মনে হবে এর কাছাকাছি হয়তো মুনি-ঋষিরা বাস করেন। তারই প্রভাবে সাপটির এমন আচরণ। সামনে একটি পাহাড় পড়ল। পাহাড়ে সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি বেয়ে শঙ্কর পাহাড়ের ওপর উঠে এলেন। সেখানে এক নির্জন কুটিরে এক মহাত্মা বসে আছেন। মহাত্মার কাছে গিয়ে তিনি ঘটনাটি উল্লেখ করলেন। মহাত্মা জানালেন এই নৈসর্গিক শোভামণ্ডিত শান্তির রাজ্য থেকে হিংসাকে চিরদিনের জন্য নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। কারণ, এটি হল শৃঙ্গিঋষির আশ্রম। এর পাশে আছে অসাধারণ প্রাকৃতিক শোভা। পরবর্তী সময়ে এখানে শৃঙ্গেরি মঠ স্থাপন হয়।

এখান থেকে বিদায় নিয়ে শঙ্কর এসে পৌঁছোন ওঁকারনাথে। সেখানে জানলেন এক গুহার মধ্যে দীর্ঘকাল এক তপস্বী তপস্যারত। সেখানে গিয়ে দেখেন, সামনে অনেক সাধু অপেক্ষা করছেন। অপেক্ষা করতে করতে অনেকে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। ওই তপস্বী অত্যন্ত জ্ঞানবান। তাঁর মুখের নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করলে জীবনে আর কোনো দুঃখ কষ্ট থাকে না।

এই কথা শুনে শঙ্কর ভক্তিনম্র চিত্তে তপস্বীর বন্দনাগীতি গাইতে লাগলেন। তাঁর মুখনিঃসৃত শব্দগুলি দূরের পাহাড় থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। সৃষ্টি হল চারপাশে এক স্বর্গীয় পরিবেশের। শঙ্কর বুঝতে পারলেন এবারে গোবিন্দপাদের সমাধি ভঙ্গ হবে। দীর্ঘদিন ধরে যে গুরুর কথা চিন্তা করেছেন, সেই গুরুর শ্রীচরণযুগল অবলোকন করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হল। তাঁরই চরণে হৃদয়ের সবকিছু উপহার দিতে হবে, আমিত্ব ত্যাগ করে হৃদয়ের সব কিছু ওই চরণে বিসর্জন দিতে হবে—শঙ্কর সব কিছুই ত্যাগ করলেন শ্রীগুরুর নিরাপদ আশ্রয়ে।

গুরু এবং শিষ্য দুজনেই খুবই আনন্দিত। ধ্যান ভাঙার পর সদ্য জাগ্রত মহাতাপস শুদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গ প্রার্থনা করে থাকেন। অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ ভালো লাগে না। যুগে যুগে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক এভাবেই নির্ধারিত হয়ে আসছে। ভারতবর্ষ গুরু পরম্পরার দেশ!

গোবিন্দপাদ ভাবলেন এই তো সেই দুর্লভ শক্তির অধিকারী সাধক যাঁর মধ্যে অনেক সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। যিনি জ্ঞানধারণ ও সত্য অনুসন্ধানের জন্য এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন।

শঙ্কর ভাবছেন শাস্ত্রে লেখা গুরুপদের সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে এই মহাযোগী আমার সামনে উপস্থিত হয়েছেন। এঁর তনুবাহার দেখে বুঝতে পারছি যে, গুরু হবার সবকটি লক্ষণ ইনি আত্মস্থ করেছেন। ইনি পারবেন মনের অন্ধকার দূর করতে। জ্বালাতে পারবেন জ্ঞানের প্রদীপশিখা।

শুরু হল শঙ্করের নতুন জীবন। শঙ্কর হাতজোড় করে নিজের অভীপ্সার কথা গোবিন্দপাদের কাছে ব্যক্ত করলেন। গোবিন্দপাদ তাঁকে শিষ্যত্বপদে বরণ করতে রাজি হলেন। শঙ্করের সমস্ত স্নায়ুপুঞ্জ তখন অনাস্বাদিত আনন্দে স্পন্দিত। তিনি চোখ বন্ধ করলেন। হাজার সূর্যের দীপ্তি অবলোকন করলেন। মনে হল তিনি যেন আর এই পৃথিবীতে বসে নেই, তাঁর দেহ চলে গেছে সুদূর মহাশূন্যে। সেখানে আছে গতিমান নক্ষত্ররজির মেলা। সেখানে গেলে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের নৈকট্য অনুভূত হয়।

শঙ্কর গুরুর স্তব করলেন। তাঁর বিগলিত কণ্ঠস্বর গোবিন্দপাদকে আশ্চর্য করে দিল। উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে উপযুক্ত শিষ্য এসেছেন!

ক-দিন ধরে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। অনবরত বৃষ্টি হওয়ায় বেড়ে গেছে নর্মদার জল। যে কোনো সময়ে বন্যা হতে পারে। একদিন গোবিন্দপাদ গুহার মধ্যে সমাধিস্থ অবস্থায় বসে আছেন। তখন নর্মদার জল প্রবল আক্রোশে ফুঁসতে লাগল। গোবিন্দপাদ সমাধিস্থ অবস্থায়। তিনি নিশ্চয় এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন না। মহাদুর্যোগ শুরু হলে তাঁকে আর বাঁচানো যাবে না। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা চিন্তায় পড়লেও শঙ্করের মনে কোনো চিন্তা নেই।

তিনি একটি মাটির কলসী সংগ্রহ করলেন। তিনি আগেও একবার আলোয়াই নদীর কাছে প্রার্থনা করে ফল পেয়েছিলেন। তাই তিনি আবারও সেই নদীর কাছে প্রার্থনা জানালেন। আলোয়াই তাঁর কথা রেখেছিল। এবার তিনি নর্মদার কাছে প্রার্থনা করলেন এই দুর্যোগ থেকে রেহাই পেতে। নর্মদা কলসীর মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল। তীব্র জলস্রোত শুরু হয়ে কলসীতে ঢুকে পড়ল। একবিন্দু জলও কলসীর বাইরে পড়ল না। তীব্র বিশ্বাস আর প্রবল শক্তিযোগে মানুষ কী অসাধ্য সাধন করতে পারে, তা দেখে সকলেই অবাক হয়ে গেলেন।

বন্যার জল বিদায় নিলে গোবিন্দপাদের ধ্যান ভঙ্গ হলে, তিনি শিষ্যদের মুখে সব শুনলেন। তিনি বললেন, আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কত যুগ ধরে আমি শুধু এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষায় ছিলাম। এতদিন বাদে ব্যাসদেবের ভবিষ্যৎবাণী সফল হল। আমি আশীর্বাদ করি, সমস্ত বেদের অর্থকে তুমি ব্রহ্মসূত্রর ভাষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে জগতের কল্যাণ সাধন করবে। তোমাকে শেখানোর মতো আমার কিছু নেই। বলো তোমার কি কিছু চাওয়ার আছে?

এই কথা শুনে শঙ্কর অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন—গুরুদেব, আপনার কৃপায় আমি সবকিছু পেয়েছি। আমাকে আপনি এমন সম্পদ দেবেন যা আমি যুগ যুগান্তর ধরে বহন করতে পারব। যে সম্পদ আমি

পৃথিবীর সকলকে বিতরণ করতে পারব, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি চিরনির্বাণের আস্বাদন করতে পারি।

শাস্ত্র পাঠের সময়ে যেমন শঙ্কর অল্পেই বিষয়গুলি আত্মস্থ করেছিলেন এবারেও তেমন ঘটল। শঙ্কর কিছুক্ষণের মধ্যে সমাধিস্থ হলেন। গভীর থেকে গভীরতর সমাধি সোপান পেরিয়ে গেলেন শঙ্কর। অবশেষে তিনি উপস্থিত হলেন নির্বিকল্প সমাধিতে। সেখানে সব কিছু আনন্দময়, সে এক অখণ্ড সত্তাযুক্ত জগৎ। একটা জ্ঞেয়হীন জ্ঞানের জগত। শঙ্করের মনে হল তিনি ক্রমশ সেই আনন্দসাগরে তলিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর চারপাশে আনন্দের ধারাসম বিগলিত করুণা এগিয়ে চলেছে।

গোবিন্দপাদ জানতেন শঙ্করের আয়ু অল্প, তার মধ্যেই তাঁকে এমন কিছু অসাধ্য সাধন করতে হবে, যা তাঁর নাম চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তাই আর বেশি সময় নষ্ট করলেন না।

শঙ্কর আবার ইহজগতে ফিরে এলেন। ফিরলেন মানবলোকের সাধারণ স্তরে। পৃথিবীতে কোনো কিছু চিরস্থায়ী নয়—অথচ আমরা সবকিছুর ওপর এত আকর্ষণ বোধ করি। পৃথিবীর সকল মানুষ চোখ বন্ধ করে বসে আছে। অথচ তাদের হৃদয় লালসায় পূর্ণ। তিনি ভাবলেন আমি তো স্বর্গলোকেই ভালো ছিলাম। এখানে কেবল হানাহানি পারস্পরিক বিদ্বেষ অবিশ্বাসের বাতাবরণ—তুমি আমাকে এই অন্ধকার জগৎ থেকে উদ্ধার করো।

শ্রীশ্রী গুরুদেবের কণ্ঠ শঙ্করের হৃদয় স্পর্শ করল। তিনি বললেন—শোনো পুত্র, যখন দ্বাপর যুগের শেষে ব্রহ্মবিদ্যা লুপ্ত হবার পথে, তখন সেই বিদ্যাকে রক্ষা করার জন্য এসেছিলেন কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন। বৌদ্ধ বিপ্লব যখন সনাতন ধর্মের প্রাণস্বরূপ বেদকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চলেছে তখন ঈশ্বরের আদেশে তুমি আবির্ভূত হয়েছ। তোমাকে এই গোপন বিদ্যা প্রদানের জন্য আমি এসেছি। তাই হাজার হাজার বছর ধরে আমি এই অমূল্য সম্পদ বহন করে সমাধিস্থ অবস্থায় ছিলাম। ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত এই বিদ্যা গুপ্তই থেকে যাবে। তোমাকে পেয়ে আমি আপ্লুত হয়েছি। বেদের মতানুযায়ী বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য রচনা করো। শিষ্যদের কাছে বিতরণ করো। তোমার জীবন সার্থকতার প্রান্তে উপনীত হোক। এবার তোমার গন্তব্য স্থল হবে পবিত্র কাশী। শিষ্যকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে গুরু গোবিন্দপাদ মহাসমাধি অবলম্বন করলেন। শঙ্কর গুরুর উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে পরলৌকিক ক্রিয়াকর্মের উদ্দেশ্যে কাশীর উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললেন। তখন শঙ্করকে অনুসরণ করেন কয়েকজন জ্ঞানপিপাসু সন্ন্যাসী।

তিন

ভারতীয় শাস্ত্রমতে কাশী এক ঐতিহাসিক শহর। কাশীতে আছে দুটি নদী বরুণা ও অসি। কাশীতে অনেক মুনিঋষি তপস্যা করে গেছেন। কাশীকে বলা হয় মর্ত্যের স্বর্গ। বারাণসীতে পৌঁছে শঙ্কর মণিকর্ণিকা ঘাটের কাছে আশ্রয় নিলেন। গঙ্গায় প্রাতঃস্নান সেরে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথের পূজাপাঠ শেষ করে শাস্ত্র আলোচনা করেন। ধীরে ধীরে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল নানা স্থানে। অদ্বৈত বেদান্ত শেখার জন্য বিদ্যার্থীরা তাঁর কাছে হাজির হলেন। শঙ্করের কণ্ঠে ব্রহ্মসূত্রের নতুন ব্যাখ্যা শুনে বারাণসীর বৌদ্ধিক সমাজ অবাক হয়ে গেল। চোল দেশীয় যুবক সুনন্দন এই সময়ে শঙ্করের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

বারাণসীতে থাকাকালীন শঙ্করের জীবনে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটে। একদিনের ঘটনা, এক যুবতি তাঁর স্বামীর মৃতদেহ পথের মাঝখানে রেখে যে আসছে তারই কাছে অর্থের জন্য প্রার্থনা করছেন। কারণ দেহটি সৎকার করার মতো অর্থ যুবতির নেই। যাবার অসুবিধার জন্য শঙ্কর বললেন—মৃতদেহ সরাতে। যুবতি সেই অনুরোধ রাখলেন না। শঙ্কর বললেন, মৃতদেহের কি নড়বার শক্তি আছে? তুমি ওটাকে সরিয়ে দাও।

যুবতি প্রশ্ন করলেন—শক্তি না থাকলে এতটুকু কি সরা যায় না?

শঙ্কর এই প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে বললেন—তার মানে? কী অসম্ভব কথা বলছ?

যুবতি হাসি মুখে বললেন—অসম্ভব কেন? অনাদি অনন্ত প্রতিটি চৈতন্যহীন শক্তি যদি নড়তে পারে, তাহলে শবদেহ কেন তা পারবে না?

শঙ্করের মনে বজ্রপাত ঘটে গেল। এতদিন ধরে তিনি নির্গুণ ব্রহ্মানুভূতিতেই মগ্ন ছিলেন। সগুণ ব্রহ্মের কথা তাঁর একবারও মনে আসেনি। তিনি বুঝতে পারলেন যে নির্গুণব্রহ্ম ক্রমমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়ে সগুণ মূর্তিতে বিরাজমান। নিখিল বিশ্বকে তিনি তাঁর দেহে ধারণ করেছেন। তিনিই লীলাচ্ছলে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় খেলায় মগ্ন। শঙ্কর 'মা মা' বলে কেঁদে ফেললেন। নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধির সঙ্গে সগুণ ভাব প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক জগতের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেল।

আর একদিনের ঘটনা—শঙ্কর একটি দৃশ্য দেখে বিরক্ত হলেন। তিনি বারে বারে চণ্ডালকে পথ ছেড়ে দিতে বললেন। অবশেষে চণ্ডাল বলল—আপনি শিষ্যদের অদ্বৈত শিক্ষা দেন। কিন্তু, আমার মনে হয় আপনি অদ্বৈত তত্ত্বের কিছুই বোঝেন না। সে প্রশ্ন করে, জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে যদি পরম ব্রহ্মের অবস্থান হয়ে থাকে তাহলে আপনি কাকে সরে যেতে বলছেন? বলুন তো আত্মাকে না দেহকে? আপনার মতো অদ্বৈতবাদী কেন ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালের মধ্যে ভেদজ্ঞান করছেন?

চণ্ডালের কথা শুনে শঙ্কর বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হয়নি। তিনি বুঝতে পারলেন যে চৈতন্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ থেকে মহাবিশ্বের বৃহত্তম বস্তুর মধ্যে স্ফুরিত হচ্ছে সেই চৈতন্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, তাঁর চেতনা হল। চণ্ডাল এবার তাঁর মিথ্যে আবরণ ছেড়ে বিশ্বনাথ মূর্তিতে শঙ্করকে আশীর্বাদ করলেন। এবং অবিলম্বে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনার জন্য আদেশ করলেন।

গুরু ও মহাদেবের আদেশে তিনি বেদান্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা রচনা করার জন্য উদ্যোগী হলেন।

তিনি স্থির করলেন, বারাণসীর জনবহুল এলাকা ছেড়ে অন্য স্থানে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত তিনি বদরিকা আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি উপনিষদ, গীতা এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করলেন। দেখতে দেখতে চার বছর কেটে গেল, তিনি আরও কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হলেন।

তিনি সেখানে সত্যযুগের নারায়ণ মূর্তির বদলে শালগ্রাম শিলা পুজোর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। পুরোহিত জানালেন চিনা দস্যুদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নারায়ণ মূর্তিকে নারদকুণ্ডে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। বহু চেষ্টা করেও মূর্তিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তখন থেকেই শালগ্রাম শিলায় নারায়ণ পূজা শুরু হয়েছে। এই কথা শুনে শঙ্কর খুব দুঃখ পেলেন। তিনি সেই নারদকুণ্ডে নামতে থাকলেন। এই নারদকুণ্ডের সঙ্গে অলকানন্দার যোগ আছে তাই পুরোহিতেরা শঙ্করকে বারণ করলেন। তিনি কারো কথা না শুনে চোখ বন্ধ করে কুণ্ডের মধ্যে ডুব দিলেন। উঠে এলেন হাতে একটি চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ নিয়ে। যদিও তার একটি অংশ ছিল ভাঙা। তিনি সেই মূর্তিটি কুণ্ডের জলে বিসর্জন দিয়ে আবার ডুব দিলেন। উঠলেন আর-একটি বিগ্রহ নিয়ে। কিন্তু সেটিরও অঙ্গ ভাঙা। তিনি ভাবলেন এ কী দেবীমায়া! ভাঙা মূর্তিতে কি পূজার্চনা করা সম্ভব? এমন সময় আকাশবাণী হল—কলিকালে এই মূর্তিরই পুজো হবে। মহানন্দে শঙ্কর সেই মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন। নম্বুরি ব্রাহ্মণের ওপর পড়ল তাঁর সেবার ভার।

এবারে তিনি এলেন যোশীমঠে। সেখানেও একটি মঠ তৈরি করলেন। সমুদ্রের তট থেকে ৬,১৬০ ফুট উঁচুতে সেটি অবস্থিত। বদ্রীনাথ থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে। এখানে মন্দিরে ছিল নৃসিংহদেবের মূর্তি। যার একটি হাত অত্যন্ত সরু। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বিশ্বাস করতেন এই হাত একদিন ভেঙে যাবে। সেদিন নরনারায়ণ পর্বত ধ্বংস হবে। সেদিন থেকে কেউ বদ্রীনাথ দর্শন করতে পারবেন না। কারণ বদ্রীনাথে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কুমার সংহিতার মতে, যেদিন বিষ্ণুজ্যোতি বিলীন হবে সেদিন বদ্রীনাথের পথ বন্ধ হবে। আর সেদিন ধৌলীঘাট তপোবনে বদ্রীর উপাসনা হবে।

শঙ্কর বুঝতে পারলেন তাঁকে এবার ব্যাসগুহায় যেতে হবে। যেখানে পৃথিবীর কোনো কোলাহল প্রবেশ করতে পারে না। লক্ষ শ্লোক মহাভারত এখানে রচিত হয়েছিল। একটু নীচে ডান দিকে প্রবাহিত হয়েছে সরস্বতী নদী। বাঁদিকে গণেশ মন্দির। পাশ দিয়ে গেছে অলকানন্দা। আর আছে কেশবগঙ্গা।

কথিত আছে, ব্যাসদেব মহাভারতের শ্লোক রচনার জন্য গণেশকে স্মরণ করলেন। গণেশ বললেন যে, তিনি একটি শর্তে লিপিকার হতে রাজি আছেন। শ্লোক বলতে বলতে থেমে গেলে গণেশ লেখা থামিয়ে

দেবেন।

ব্যাসদেব বললেন—ঠিক আছে, কিন্তু আমারও একটি শর্ত আছে। আমি যে শ্লোক বলব আপনি তার অর্থ না বুঝে লিখতে পারবেন না।

সরস্বতী সেখানে উপস্থিত, তিনি সাক্ষী থাকলেন। এভাবে ব্যাসদেবের মহাভারত রচনা হয়েছিল। তাই গুহার দু-দিকে আছে গণেশ আর সরস্বতীর মন্দির।

প্রত্যেক দিন ধ্যানযোগে শঙ্কর সূত্রের অর্থগুলি অবগত হতেন। তারপর ভাষ্য রচনা করতেন। ভাষ্য রচনা শেষ হলে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সবথেকে বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন সনন্দন। শঙ্কর তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

কিছুদিন পরে সনন্দন কোনো কাজের উদ্দেশ্যে অলকানন্দার ওপারে গিয়েছিলেন। অন্য পারে তখন শঙ্কর শিষ্যদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ সনন্দনের মনে হল গুরু বিপদে পড়েছেন। গুরু তাকে স্মরণ করছেন। গুরুর গলা তিনি চিনতেন। তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে প্রচণ্ড গতিতে স্রোতস্বিনী নদীর ওপর দিয়ে ছুটতে লাগলেন।

গুরুর কাছে থাকা শিষ্যরা সনন্দনকে দেখতে পেলেন। তাঁরা আশ্চর্য হলেন। অলকানন্দার উন্মত্ত জলরাশির উপর সনন্দন যেখানেই পা রাখছেন সেখানে একটি শ্বেতপদ্ম ফুটে উঠছে। এই অলৌকিক ঘটনা দেখে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে এর অন্তরালে নিশ্চয়ই শঙ্করের আশীর্বাদ রয়েছে।

শঙ্কর তখন বললেন—আজ থেকে সনন্দন 'পদ্মপাদ' নামে পরিচিত হবে।

এর চার বছরের মধ্যে শঙ্কর বিখ্যাত ১৬টি গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এবারে তিনি চললেন জ্যোতিধামে। সেখান থেকে যাবেন কেদারধামে। কেদারধামের দুর্গম পথের ও-পারে আছে স্বর্গারোহন পর্বত। যে পথ ধরে পঞ্চপাণ্ডবরা মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছিলেন।

শঙ্কর এগিয়ে চলেছেন দুর্গম গিরিপথ ধরে। উত্তর দিক থেকে ছুটে আসছে কনকনে বাতাস। শেষ পর্যন্ত তিনি পৌঁছান গোমুখীতে। তিনি জানতেন তাঁর ষোলো বছর বয়সে দ্বিতীয় মৃত্যুযোগ আছে। যদি এখনই তাঁর মৃত্যু হয় তাহলে আক্ষেপ করবেন না। তাঁর ওপর দেওয়া কাজের দায়িত্ব প্রায় সবকটিই তিনি পালন করেছেন। তবে কিছু কাজ বাকি থেকে গেছে।

তাঁর শিষ্যরাও জানতেন তিনি দ্বিতীয় মৃত্যুযোগের মুহূর্তে পৌঁছে গেছেন। শঙ্কর এত ভাষ্য সৃষ্টি করেছেন, তা লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজে লাগল কই? একমাত্র দৈব অনুগ্রহের মাধ্যমে তিনি মৃত্যুযোগকে অতিক্রম করতে পারবেন।

একদিন সকালে শঙ্করের শিষ্যরা ভাষ্য-শিক্ষা করছেন, এমন সময়ে এক কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ এসে প্রশ্ন করলেন—তোমরা কী শিক্ষা করছ?

শিষ্যরা করজোড়ে জানালেন—উপনিষদ ভাষ্য। ইনি আমাদের প্রভু। ইনি দ্বৈত মতকে খণ্ডন করে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চান। এজন্য অসংখ্য ভাষ্য রচনা করেছেন।

ব্রাহ্মণ তখন বললেন—আমি এমন একজনকে খুঁজছি যিনি বাদরায়ণ ব্যাসের সূত্রের মর্ম উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো মানুষকে খুঁজে পাননি যে তাঁর কাছে একটি সূত্র সম্পর্কে সন্দেহের অবসান করতে পারবেন।

এই খবর শিষ্যদের দ্বারা শঙ্করের কাছে পৌঁছে গেল। শঙ্কর এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। তাঁকে নমস্কার জানালেন। তারপর বললেন—আমি সামান্য বিদ্যা লাভ করেছি। সেই বিদ্যার দ্বারা আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

এরপর একটি একটি করে বেশ কিছু শক্ত প্রশ্ন করলেন ওই সন্ন্যাসী। শঙ্কর সবকটি প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর দিলেন।

সাতদিন ধরে চলল ওই প্রশ্নোত্তরের পালা। ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করছেন, শিষ্যরা তাকিয়ে আছেন শঙ্করের মুখের দিকে। শঙ্কর হাসিমুখে শ্লোক ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। ব্রাহ্মণের প্রশ্ন করার ভঙ্গি দেখে পদ্মপাদের মনে হল কোনো মহাপুরুষ ছদ্মবেশ ধারণ করে শঙ্করকে পরীক্ষা করতে এসেছেন। পদ্মপাদ গোপনে তাঁর সন্দেহের কথা শঙ্করকে জানালেন।

পরের দিন তাঁর সন্দেহ সত্যে পরিণত হল। তর্ক শেষ হল। ব্রাহ্মণ বুঝলেন এবারে আর ছদ্মবেশ ধারণের প্রয়োজন নেই। শঙ্কর সত্যই ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি তখন নিজের পরিচয় পরিস্ফুটিত করলেন। বোঝা গেল মৃগচর্ম পরিহিত জটাজুটধারী বিশাল দেহী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এভাবে সামনে এসেছেন। তাঁর দিব্য জ্যোতিতে চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠল।

এভাবে ব্যাসদেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে একথা শঙ্কর ভাবতে পারেননি। তিনি আভূমি আনত হয়ে প্রণাম করলেন।

ব্যাসদেব বললেন—হে তাপস, তোমার নিরহঙ্কারী মনোভাব আমাকে মুগ্ধ করেছে। এত বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও তোমার মনে অহংকার নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছা ও কৃপায় তোমার ষোলো বছর পরমায়ু বৃদ্ধি পেল। এবারে তুমি তোমার কাজ আরও ভালোভাবে করতে পারবে। তিনি আরও বলেন, অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের যে উপলব্ধি তুমি অর্জন করেছ, তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দাও। মানুষের মন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। পারমার্থিক অর্থকে তারা ভুলে গেছে। তোমার প্রথম কাজ কুমারিল ভট্টকে পরাজিত করা। হিন্দুধর্মের ভেতর নানা বিভাজন দেখা দিয়েছে। এত বিভাজন থাকলে ধর্মের ঐক্য থাকে না। তুমি মহাদেবের অংশ, তুমি অশেষ শক্তিশালী। তোমার উদ্যম সত্যে পরিণত হলে, তোমার স্বপ্ন যদি বাস্তব হয়, তাহলে হিন্দুধর্ম আবার পুনঃজাগরিত হবে। অধ্যাত্ম চিন্তায় পরিস্ফুটিত হবে।

ব্যাসদেবের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শঙ্কর কুমারিল ভট্টের সন্ধানে যাত্রা করলেন। শঙ্কর খবর পেয়েছেন কুমারিল ভট্ট ত্রিবেণীতে অবস্থান করছেন।

চার

কুমারিল ভট্ট কে ছিলেন? এই প্রসঙ্গে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক তারকনাথ বলেন, কুমারিল ভট্ট দক্ষিণ ভারতের চূড়ামণি রাজ্যের অন্তর্গত ত্রিমলয় নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কুমারিলের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন বৌদ্ধন্যায়ের বিখ্যাত পণ্ডিত ধর্মকীর্তি।

আবার অনেকের মতে উত্তর ভারত অর্থাৎ কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব থেকে এসে কুমারিল বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতদের পরাভূত করেছিলেন। সুপণ্ডিত সারিকনাথ কুমারিলের তিনশো বছরের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি কুমারিলকে ব্যতিকার মিশ্র নামে উল্লেখ করেছেন। কুমারিল ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। তাঁর পাঁচশত দাসদাসী ছিল। গুরুনন্দের কাছে পরাজিত হয়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ দর্শন সম্পর্কেও গুরুনন্দের মনে আগ্রহ ছিল। তিনি জানতেন, কুমারিল ছাড়া আর কেউ এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেননি।

কুমারিলকে কীভাবে সন্তুষ্ট করা যায়? অক্লান্ত সেবার মধ্যে দিয়ে গুরুনন্দ আচার্যদেবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। কুমারিলের স্ত্রীও তাঁর ওপর অত্যন্ত তুষ্ট হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীদের কাছে বসে ব্রাহ্মণ দর্শন শোনার সুযোগ পেলেন। খুব অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত শাস্ত্রেই তাঁর বুৎপত্তি জন্মাল। একদিন তিনি স্বমূর্তি ধারণ করলেন। ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীদের শাস্ত্রচর্চায় আহ্বান জানালেন। সমস্ত ব্রাহ্মণ পরাস্ত হলেন। অবশেষে কুমারিলকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন।

এখানে একটি শর্ত ছিল যিনি পরাজিত হবেন তাঁকে অপরের ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। কুমারিল শিষ্যের কাছে পরাস্ত হলেন। পাঁচ শিষ্য-সহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন। কুমারিল আন্তরিক ভাবে চেয়েছিলেন বৌদ্ধধর্মকে পরাস্ত করতে। সেই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে না পারলে তিনি তা খণ্ডন করতে পারবেন না। ধর্মনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কুমারিল বৌদ্ধদর্শন শিক্ষালাভ করেছিলেন।

ধর্মনাথ শিষ্য-পরিবৃত হয়ে বেদবিরোধী আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন কুমারিল [illegible] কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন—বেদের সম্যক উপলব্ধি ছাড়া ধর্মনাথ কেন বেদের নিন্দা করছেন? এই ঘটনায় তিনি মর্মাহত!

একথা শুনে গুরু অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। ধর্মনাথের শিষ্যরা তাঁকে পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে ফেলে দিলেন। কুমারিল ভাবলেন—বেদ যদি সত্যি হয়, তাহলে আমার কিছুই হবে না।

সেই কুমারিল অবশেষে ধর্মনাথকে বৌদ্ধদর্শন সংক্রান্ত তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন।

দুই মহাপণ্ডিতের মধ্যে শুরু হল বাকবিতণ্ডা! একে অন্যকে কঠিন প্রশ্ন করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত এই যুদ্ধে ধর্মনাথ পরাস্ত হলেন। শর্তানুযায়ী তাঁকে তুষানলে প্রাণত্যাগ করতে হল। গৌড়ের স্বাধীন হিন্দু রাজা শশাঙ্ক তাঁর পৌরহিত্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। কুমারিলের প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৈদিক ধর্মের পতাকা উত্থিত হল।

শঙ্কর এগিয়ে চলেছেন কুমারিলের সন্ধানে। শেষপর্যন্ত কোথায় কুমারিলের সঙ্গে দেখা হবে তাই ভাবছেন। বৌদ্ধগুরুকে বিচারে পরাস্ত করে জৈমিনী মতকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ঈশ্বরকে অসিদ্ধ প্রমাণ করার জন্য পাপ এসেছে কুমারিলের মনে। তাই তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এজন্য তিনি তুষানলে প্রাণ বিসর্জন করবেন।

এমন সময়ে দূরে শঙ্করকে দেখে কুমারিল অভিবাদন করে বললেন—অন্তিম সময়ে আপনার মতো এক মহাত্মা পুরুষের সাক্ষাৎ পেলাম। আমার জীবন ধন্য হল!

এই কথা শুনে শঙ্কর অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। শঙ্কর বললেন—বেদব্যাস কর্তৃক আদিষ্ট ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য আমি রচনা করেছি। তার টীকা রচনার জন্য আপনার কাছে এসেছি।

উত্তরে কুমারিল একটু হাসলেন। তিনি বললেন—আগে যদি শঙ্কর তাঁর কাছে আসতেন তা হলে তিনি শঙ্করের এই অনুরোধ রাখতে পারতেন। মন্ডণকে জয় করতে পারলে শঙ্কর বিশ্বজয়ী হবেন। অর্থাৎ মন্ডণের পরাজয় হবে কুমারিলের পরাজয়।

কুমারিল আরও বললেন এই মন্ডণ ব্রহ্মার অবতার এবং মন্ডণের স্ত্রী দুর্বাসা কর্তৃক শাপভ্রষ্টা সরস্বতী হিসাবে পরিচিতা।

মিথিলার অধিবাসী হিমমিথের পুত্র বিশ্বরূপই মন্ডন নামে পরিচিত। তাঁর জন্ম হয়েছিল মান্ধাতা নগরীতে।

শঙ্কর শেষ পর্যন্ত অনেক পরিশ্রম করে মন্ডণের বাড়ি পৌঁছোন। সেখানে গিয়ে আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী হলেন। দেখলেন পিঞ্জরাবদ্ধ শুক এবং শারি বেদার্থ আলোচনা করছে। জগৎ পিতা কে তা নিয়ে মত বিনিময় হচ্ছে। গৃহের প্রবেশ দ্বার বন্ধ। প্রাসাদ সদৃশ অট্টালিকার সামনে প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। প্রহরীকে মন্ডনের কথা জিজ্ঞাসা করলে প্রহরী জানাল পণ্ডিতজি পিতৃশ্রাদ্ধ করছেন, তাই এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। অনেক মতান্তরের পরে দুই মহান পণ্ডিতের দেখা হল। শুরু হল শাস্ত্র আলোচনা। বিভিন্ন শ্লোক নিয়ে তর্ক।

দু-পক্ষের শিষ্যরাই দেখছে তর্কযুদ্ধ। কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারছেন না।

শঙ্কর কথায় কথায় বললেন—ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদ দর্শন নিষ্ফল। আগের শ্রুতিবাক্যে বুদ্ধি এবং পুরুষ জীব ও ঈশ্বরে ভেদ দেখানো হয়েছে। শ্রুতির কথা হল যে বুদ্ধি কর্মফল ভোগ করে পুরুষ তা থেকে ভিন্ন। তাই দুঃখ সুখের ফলাফল সে কখনোই পায় না।

শঙ্কর বললেন—বুদ্ধি কর্মফলের ভোক্তা—জীব সাক্ষী। ব্রাহ্মণ গ্রন্থকে মানতে হলে বলা যায় যে, জীব এবং বুদ্ধি আলাদা।

মন্ডন জবাব দিলেন—ব্রাহ্মণ বাক্য অনুযায়ী অর্থ দাঁড়ায় যে, স্বত্ব হল যার দ্বারা স্বপ্ন দেখা যায়। স্বপ্নকে দর্শনকারী সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হলেন ক্ষেত্রজ্ঞ।

শঙ্কর জানালেন—স্বত্ব কারণ, কর্তা নয়। সুতরাং এই পদের অর্থ জীবন নয়, বুদ্ধি। যেহেতু শরীর ক্ষেত্রজ্ঞের বিশেষণ তাই যে শরীরে বাস করে সে ঈশ্বর নয়।

কথায় কথায় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। উভয়ভারতী দেবী দুজনের গলায় দুটি মালা পরিয়ে দিয়ে গৃহকার্য করেন আর শোনেন তাঁদের শাস্ত্র আলোচনা। এইভাবে সতেরোটি দিন কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত এই তর্কযুদ্ধে কে জয়ী হবেন?

উপস্থিত শ্রোতারা এই আলোচনা শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন।

উভয়ের বাচিক ক্ষমতায় লুকিয়ে আছে কথা বলার আশ্চর্য দক্ষতা। একে অন্যকে সম্মোহিত করার চেষ্টা করছেন। কেউ কারো কাছে হার মানবেন না—এমন ধনুকভাঙা পণ করেছেন।

এর পরের আলোচনার বিষয়বস্তু অর্ধোপনিষদ। দুজনের মধ্যে দেখা দিল মত-পার্থক্য।

মন্ডন বলেছিলেন—যেহেতু আরও অনেক প্রমাণ দ্বারা পুষ্টিসাধন সম্ভব, তাই আমি মনে করি ভেদ—প্রতিবাদনকারী শ্রুতি উভয় দিক থেকেই বলবান।

শঙ্কর এর উত্তরে বলেন—অন্য প্রমাণ দ্বারা শ্রুতিকে পুষ্ট করা যায় ঠিকই তাই বলে তাকে প্রবল বলা যায় না।

শেষ পর্যন্ত শঙ্করের যুক্তিজালে মন্ডন মিশ্র আবদ্ধ হলেন। তাঁর মুখে আর স্বর বের হল না। এই ঘটনা ঘটল আঠারোদিন পরে।

মন্ডন এই ঘটনাতে দুঃখিত হলেন। জৈমিনি প্রমাণ করলেন যে মুনির জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বেদের অর্থ প্রচার করা। তিনি কেন এমন সূত্র রচনা করলেন যার অর্থ ঠিক মতো বোধগম্য হল না?

শঙ্কর বললেন—আমাদের বোঝার ভুল। আমি বিশ্বাস করি কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়। চিত্ত শুদ্ধি তাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে জীবকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই কর্মমীমাংসায় কর্মের স্থান এত উঁচুতে।

মন্ডন বললেন—যদি চারবেদ কর্মফলের দাতা হিসাবে চিহ্নিত করে থাকে, তবে যে কর্ম পরমাত্মা থেকে ভিন্ন তাই ফল প্রদানকারী—এই সিদ্ধান্তের দ্বারা জৈমিনি মুনিতো ঈশ্বরের নিরাকরণের কথাই বলেছেন।

শঙ্কর বললেন—নৈয়ায়িকরা যখন বলেন যে, এই জগতের কর্তা স্বয়ং পরমেশ্বর, তখন তাঁরা এই অনুমানের ভিত্তিতেই ঈশ্বরের সত্তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন। তিনি এই ব্রহ্মকে জানতে পারেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, অনুমানের দ্বারা কি ব্রহ্মের জ্ঞান হয়?

ক্ষুরধার এই যুক্তি শুনে উভয়ভারতী অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। তিনিও সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হতে চাইলেন। শঙ্কর যেন এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন।

ভারতীর কথা শুনে শঙ্কর বললেন—নারীর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনায় পণ্ডিতরা প্রবৃত্ত হন না—আপনি নিশ্চয় এই তথ্য জানেন?

তখন ভারতীদেবী বললেন—সে কী মহাত্মা, মহর্ষি জনক, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করতেন।

শঙ্কর তখন বুঝতে পারলেন ভারতীদেবী তাঁর বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেনই। শুরু হল শঙ্করের সঙ্গে উভয়ভারতীর তর্কযুদ্ধ। ভারতীদেবী ধর্মশাস্ত্র, যুক্তিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে শঙ্করকে বিভ্রান্ত করতে থাকলেন। শঙ্কর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সাবলিলভাবে দিতে থাকলেন।

হঠাৎ ভারতীদেবী প্রশ্ন করলেন পুষ্পধনুর কৌশল কি আপনার জানা আছে?

শঙ্কর ভারতীদেবীর এই প্রশ্ন শুনে অবাক হলেন। এর আলোচনার অর্থ হল সন্ন্যাসব্রতকে অপমান করা।

শঙ্কর তখন বললেন—হে দেবী, আপনি তো আমার জীবনের সব কথা অবগত আছেন। সন্ন্যাস ধর্মই আমার জীবনের সব থেকে বড়ো ব্রত। আপনি যে কোনো শাস্ত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলে যথাসাধ্য উত্তর দেব। কিন্তু যে জীবন সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, সে-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর আমি দেব কী করে?

ভারতীদেবী হেসে বললেন—কেন, কাম শাস্ত্রকে শাস্ত্র নয় বলে আপনার মনে হয়?

শঙ্কর তখন বললেন—ঠিক আছে। আমাকে একমাস সময় দিন। আমি একমাস পরে ফিরে এসে আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেব।

শঙ্কর ভাবলেন এটা হয়তো ঐতিহাসিক যোগসূত্র। তিনি মৃতদেহের মধ্যে নিজেকে প্রবেশ করাতে চাইলেন। তাহলে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। তবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য পদ্মপাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন তিনি।

সব কথা শুনে পদ্মপাদের মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। তিনি একেবারে নিথর হয়ে গেলেন! কিছুক্ষণ পরে বললেন, গুরুদেব, আপনি সর্বত্যাগী, আপনি যদি পরকায়ায় প্রবেশ করে কামশাস্ত্র জ্ঞান অর্জন করেন তাহলে তা হবে নীতির বহির্ভূত। সারা পৃথিবীতে আপনার যত ভক্ত আছে, তারা আপনার নিন্দা করতে বাধ্য হবে।

শঙ্কর তাঁকে বললেন—তুমি যে কথা বলছ, তা তোমার মতো ব্যক্তির মুখে শোভা পায় না। তারপর শঙ্কর পদ্মপাদকে সকল প্রকার যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

এবং শেষ পর্যন্ত পদ্মপাদ সবকিছু বিবেচনা করে বললেন—হ্যাঁ প্রভু, আপনার কথার মধ্যে অকাট্য যুক্তি আছে। আপনি অবশ্যই এই কাজ করতে পারেন।

পাঁচ

শঙ্কর একটি নির্জন গুহার মধ্যে দেহত্যাগ করলেন। শঙ্করের শিষ্যরা মৃতদেহের চারপাশে পাহারা দিতে লাগলেন। শঙ্কর স্থূল শরীর ত্যাগ করে লিঙ্গ শরীর করে এক অকাল মৃত যুবক রাজার শরীরে প্রবেশ করলেন। রাজা মারা গেছেন বলে সকলে শোক প্রকাশ করছিল। এখন আবার নিশ্বাস বইতে শুরু করল, রাজার চেতনা ফিরে এল। তাঁকে জাগতে দেখে সকলেই আনন্দিত হলেন। মনে হল রাজার ঘুম ভেঙেছে। রাজাকে নিয়ে সকলে রাজবাড়িতে ফিরে এলেন।

রাজা পুনর্জীবন লাভ করে আবার আনন্দের সঙ্গে রাজকর্মে মন দিলেন। রানিদের সঙ্গে কামক্রীড়ায় রত হলেন। রমন করলেন, আনন্দ দান করলেন। ধীরে ধীরে কামসূত্রে সিদ্ধ হলেন তিনি। দেখতে দেখতে একটি মাস কেটে গেল। শঙ্করের শরীর যাঁরা পাহারা দিচ্ছিলেন তাঁরা এবারে চিন্তিত হলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা পদ্মপাদের ওপর গুরুর দেহে ফিরে আসার ব্যাপারে তদ্বির করার পরামর্শ দিলেন।

পদ্মপাদ গায়কের বেশে রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলেন। ধর্মভীরু সংগীতানুরাগী রাজা গায়ককে সাদর আহ্বান করলেন। অধ্যাত্ম-সংগীতের মূর্ছনায় আমোদিত হয়ে উঠল পরিমণ্ডল।

শঙ্কর মুগ্ধ বিস্ময়ে সংগীতের প্রতিটি শব্দ অনুধাবনের চেষ্টা করছিলেন। তিনি বুঝতে পারছেন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এবার তাঁকে আবার শঙ্করের দেহে প্রবেশ করতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি জ্ঞান হারালেন। রাজদেহ ছেড়ে তিনি প্রবেশ করলেন শিষ্যগণের দ্বারা রক্ষিত নিজদেহে। সেই শরীরে আবার দেখা দিল চেতনার উন্মেষ। যে শিষ্যরা মৃতদেহ পাহারা দিচ্ছিলেন তারা আবার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

শঙ্কর কামসূত্রের উত্তর নিয়ে ভারতীদেবীর কাছে উপস্থিত হলেন। শুরু হল তর্ক। প্রথম দিকে ভারতীদেবী একটির পর একটি যুক্তি নিক্ষেপ করলেন। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি শঙ্করের কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হলেন। ভারতীদেবী বললেন—শঙ্কর, এবার আপনার বিজয় সম্পূর্ণ হল। আমাদের প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়ই রক্ষিত হবে। আমি স্বধামে গমন করব।

শঙ্কর বললেন—শৃঙ্গেরিতে একটি মঠ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করি। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি সেখানে অধিষ্ঠিতা হয়ে জ্ঞান বিতরণ করুন।

ভারতীদেবী প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি দেবী—শরীরে শৃঙ্গেরি মঠে উপস্থিত থাকবেন। এই কথা বলে তিনি যোগবলে দেহত্যাগ করলেন।

মণ্ডন মিশ্রকে পরাস্ত করার পর ভারতীয় পণ্ডিত-সমাজে আচার্য শঙ্করের নাম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। তখন সমগ্র ভারতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ ছিল না। শঙ্কর এবারে বুঝলেন তাঁকে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পরিভ্রমণ করতে হবে। সেই সময়ে নিম্নশ্রেণির মানুষরা গৌতম বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে। তাঁরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করছেন।

শঙ্কর অনুভব করলেন গায়ের জোরে বৌদ্ধ ধর্মকে উৎখাত করা সম্ভব নয়। বৌদ্ধধর্মের যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, সেগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার প্রয়োজন। এই কথা চিন্তা করে তিনি দিগ্বিজয় পর্বে প্রবেশ করলেন।

ছয়

উত্তর ভারতের দুটি হিমতীর্থ হল কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ। শঙ্করের কাছে এই দুটি স্থান ছিল অত্যন্ত প্রিয়। তিনি শিষ্যদের নিয়ে সেখানে বসবাস করছিলেন। বদ্রী পৌঁছে তিনি তাঁর রচিত স্তবে নারায়ণকে বন্দনা করেন। তখন শঙ্করের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। হিমালয়ের আশেপাশের গ্রামগুলির জনসংখ্যা খুবই কম। পার্বত্য অঞ্চল, পথ দুর্গম। শীতের প্রভাব প্রখর। এই অবস্থাতেও সেখানকার মানুষ আসে শঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে। বদ্রীনারায়ণ থেকে ২০ মাইল দূরে অথর্ব বেদের প্রতীক স্বরূপ জ্যোতিমঠ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

এরপর শঙ্করের গন্তব্য ইন্দ্রপ্রস্থপুর। যার বর্তমান নাম দিল্লি। শঙ্করাচার্য যখন ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করলেন তখন এখানে যাঁরা বাস করতেন তাঁরা যুবরাজ ইন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। ওই অঞ্চলে তাঁদের বিশেষ প্রভাব ছিল। আচার্য শঙ্কর ওই সম্প্রদায়ের প্রধান পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। বেদের অভিন্নতার বিষয়ে একটির পর একটি প্রশ্ন করলেন। সেখানে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী সকলেই ছিলেন আচার্যদেবের বিরোধী। আচার্যদেব তীকষ্ন বুদ্ধির সাহায্যে বিপক্ষ বক্তাদের যুক্তিজাল ছিন্ন করেন। এবং শেষ পর্যন্ত বক্তারা তাঁর শরণাপন্ন হন এবং তাঁরা শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রস্থতে শঙ্করের জয়পতাকা উড্ডীন হল।

শঙ্কর প্রথম বারাণসীতে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। বারাণসী হল মর্ত্যের স্বর্গভূমি। কাশীশ্বর বিশ্বনাথের অনুপ্রেরণাতেই শঙ্কর ওই কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন কাশীর মনিকর্ণিকার ঘাটে অবস্থান করেন। তখন তাঁর কাছে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসতেন। সাধারণ জনগণের কাছে তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ। তাঁর মুখের নিঃসৃত অমর বাণী শ্রবণ করে শ্রোতামণ্ডলী যথেষ্ট প্রীত এবং আনন্দিত হতেন। জীবন অনিত্য এই সত্য উপলব্ধি করতেন।

এবার তিনি যান গয়া। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে গয়া একটি পবিত্র স্থান। গয়াধামের সঙ্গে নারায়ণের অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ। ভগবান বিষ্ণুর পাদপদ্ম গয়াতেই অঙ্কিত আছে। পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানের জন্য গয়াতে মানুষ সমবেত হন। পুণ্যসলিলা নিরঞ্জনা নদী গয়ার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

গয়ায় শঙ্করকে কঠিনতম প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়। তবু তিনি সাহস হারাননি। তিনি বৌদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিতর্ক সভায় আহ্বান করলেন। একটির পর একটি যুক্তি দিয়ে বোঝালেন, বুদ্ধদেব ছিলেন আর্য সন্তান। বুদ্ধদেব যে নির্বাণ পথের কথা বলেছেন তা বলা আছে বেদান্তের মোক্ষলাভের মধ্যে।

শেষ পর্যন্ত অনেক পণ্ডিত শঙ্করের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। আবার অনেকে গৌতম বুদ্ধকে হিন্দুধর্মের এক অবতার হিসাবে মেনে নেন। শঙ্কর গৌতমবুদ্ধকে বিষ্ণুর দশম অবতার হিসাবে মেনে নেন। শঙ্কর চেয়েছিলেন বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন সহনশীল মনোভাব বজায় থাকে। হিন্দুধর্মের ভেতর যে ত্রুটি ছিল গৌতম বুদ্ধ সেগুলি দূর করার জন্য আন্তরিক ভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন। অনেকে গৌতম বুদ্ধের পূজার্চনা করা সত্ত্বেও নিজেকে হিন্দু বলে ঘোষণা করেন। এটি ছিল শঙ্করের দিগ্বিজয় পর্বের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দ্বাপর যুগের তখন শেষ পর্যায়। কিছুদিন পরেই পৃথিবীতে শুরু হবে কলিযুগ। কলিযুগে দেখা দেবে ধর্মের অবক্ষয়। অধিকাংশ মানুষ অধার্মিক হয়ে উঠবেন। দেবদ্বিজে ভক্তি কমে যাবে। লোভ, লালসা, বাসনা, কামনা মানুষকে গ্রাস করবে।

এই অবস্থায় মানুষকে কীভাবে ঈশ্বরের দিকে ফেরানো যায় তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। শৌনক মুনি একটি সভার আযোজন করলেন। সভাধিপতির আসনে ছিলেন রোমহর্ষণ পুত্র সুনতক্রমণি। তিনি সাতদিন ধরে ভগবতী কথা বন্দনা করে চললেন। উপস্থিত সকলের মনে কৃতজ্ঞতাভাবের উদয় ঘটল এবং এই অঞ্চলটি এক বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হল।

এবারে শঙ্কর গয়া থেকে গেলেন নৈমিষে। সেখানে একটি ধর্মমহাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। শঙ্কর সেখানে যোগ দিলেন। সেখানে শঙ্কর সুললিতভাবে এবং ভাষায় ঈশ্বরের বন্দনা করলেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, কলিযুগে ধর্ম আক্রান্ত হবে, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে মানুষ অধার্মিক হয়ে উঠছে তবে তা কখনোই হবে না। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে তাকে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে হয়। তবে একদিন এই আকর্ষণ কমে যাবে। মানুষ সেদিন বুঝতে পারবে সে হল ঈশ্বরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

শঙ্করের কথা শুনে উপস্থিত জনগণের চিত্তে আলোড়ন দেখা দিল। অনেকের মনেই দেখা গেল পরিবর্তন। শঙ্কর সকলকে নিবৃত্ত করে বলেছিলেন—আমরা গৃহে বাস করেও সন্ন্যাস জীবন যাপন করতে পারি। এটাই হল আমাদের সব থেকে বড়ো পরীক্ষা।

এরপর শঙ্কর এলেন মথুরাতে। অন্ধকার ভারতবর্ষে যিনি হাজার সূর্যের আলো জ্বেলেছিলেন তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণ। শঙ্কর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে মথুরাতে এলেন। এলেন গোকুল এবং বৃন্দাবনে। কুলদেবতা বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণের শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। শঙ্কর পবিত্র ধর্মোপদেশ প্রদান করলেন। এইভাবে মথুরায় আর্য ভারতের বিজয়গান গীত হল।

এবারে প্রয়াগ। তিনটি নদীর সঙ্গমে অবস্থিত এই ক্ষেত্র। সমুদ্র মন্থনের পর উত্থিত অমৃত কাহিনির সঙ্গে প্রয়াগ যুক্ত হয়েছে। আজও কুম্ভমেলার সময়ে প্রয়াগে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর আবির্ভাব ঘটে। প্রয়াগে শঙ্কর আসেন মহর্ষি বেদব্যাস দ্বারা আদিষ্ট হয়ে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কুমারিল ভট্টের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া। সেখানে যারা বেদান্তের সত্যতা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা শঙ্করের বৌদ্ধিক প্রাখর্যের কাছে পরাস্ত হলেন।

প্রয়াগে বিজয়ের পরে শঙ্কর এলেন ভূস্বর্গ কাশ্মীরে। বরফের সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক ভূমিখণ্ড। বিধাতা মনে হয় নিজের ইচ্ছায় কাশ্মীরকে রচনা করেছেন। শাস্ত্র পণ্ডিতেরা দর্শন, সাহিত্য, তন্ত্র এবং ব্যাকরণ চর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে কাশ্মীরকে বেছে নিয়েছিলেন। এখানে এলে প্রকৃতির সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করা যায়। মনে হয় আমরা বুঝি স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি!

জ্ঞানের এই অফুরন্ত উন্মেষের জন্য কাশ্মীরকে একদা সারদাপীঠ বলা হত। এখানে সারদাদেবীর মন্দির অবস্থিত ছিল। কথিত আছে এই মন্দিরের কাছে এক কুণ্ড ছিল। ওই কুণ্ডের জল ছিটিয়ে দিলে মৃতের শরীরে প্রাণ ফিরে আসে।

এখানে বেশ কিছু প্রবাদ বাক্য শোনা যায়। তার মধ্যে একটি—মহিষকর্ণ নামে কর্নাটকের এক রাজা অসুস্থ হয়ে কাশ্মীরে এসেছিলেন। কোনো কারণে রাজকুমারীর কোপে পড়ে যান তিনি। রাজকুমারীর আদেশে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর দেহ খণ্ড খণ্ড করে অলিন্দপ্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে ভগবানের এক সেবক সেই মাংস খণ্ডগুলিকে একত্রিত করে কুণ্ডের জল ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। এই ভাবেই রাজা মহিষকর্ণ নতুন জীবন লাভ করেন।

সারদা মন্দিরের চারটি দুয়ার। এই চারটি দ্বার চারটি দিককে নির্দেশ করছে। প্রত্যেক দুয়ারে আছে এক—একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। এখানে প্রবেশ করতে হলে দ্বারে বসে থাকা পণ্ডিতকে পরাস্ত করতে হবে। তবেই এই দ্বার দিয়ে প্রবেশের অধিকার পাওয়া যাবে।

শঙ্কর দক্ষিণ দিকের দরজা একেবারে বন্ধ থাকায় জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারেন দক্ষিণ ভারত থেকে এখনও কোনো সর্বজ্ঞ পণ্ডিত এখানে আসেননি। যিনি সেখানে উপবিষ্ট পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত করতে পারেন।

এই কথা শুনে শঙ্কর অবাক হলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে-করেই হোক দক্ষিণের দুয়ার খুলতে হবে। তিনি পদ্মপাদ সুরেশাচার্য, হস্তানল আচার্য, আনন্দগিরি প্রমুখ শিষ্যদের নিয়ে মন্দিরে গেলেন। তিনি দক্ষিণের দরজার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে যে সব পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন—তাঁরা বললেন—হে মহাত্মা, সর্বজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে তবেই এই দুয়ার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার অর্জন করুন।

শঙ্কর তাঁদের স্পষ্টভাবে বললেন, হে সুপণ্ডিতগণ, আপনারা প্রশ্ন করুন, আমি দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছি। আমি আশা করি প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব সঠিক দিতে পারব।

প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হল। সেখানে নৈয়ায়িক, কপিল, বৈশেষিক, জৈমিনি, মীমাংসক, গৌতম মতাবলম্বী মহান বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।

শঙ্কর সকলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। যুক্তিতর্কের সাহায্যে অথচ তাঁর বক্তব্য ছিল সুললিত এবং সাবলীল। একে একে সব পণ্ডিতেরা পরাস্ত হলেন। শঙ্করের জয়ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হল। পার্বত্য প্রদেশের নীরবতা ভেঙে বাদ্যযন্ত্রের কলতান ধ্বনিত হল।

শঙ্কর বিনম্র পদক্ষেপে দক্ষিণ দুয়ার দিয়ে সারদা মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তখনই দৈববাণী শোনা গেল—সর্বজ্ঞ বৎস শঙ্কর, এই সিদ্ধপীঠে তুমি আরোহন করো।

শঙ্করের সমস্ত শরীরে আনন্দধারা বয়ে গেল। তিনি মন্দিরে প্রবেশের ছাড়পত্র অর্জন করেছেন। শিষ্যদের নিয়ে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

এরপর ডাক আসে সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে। একদিন এই দক্ষিণতম কেরল প্রদেশেই পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন শঙ্কর। তিনি আবার ঈশ্বরের অনুগ্রহে চলেছেন দক্ষিণাঞ্চলে। সেখানে গিয়ে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করতে হবে। তবেই তিনি তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার অনুমতি পাবেন।

শঙ্কর দক্ষিণ প্রদেশে গিয়ে প্রথম আসেন শ্রীপর্বতে। এই শ্রীপর্বত অবস্থিত বর্তমান তামিলনাড়ু বা আগেকার মাদ্রাজ শহরে। এখানে আছে একটি বিশাল শিব মন্দির। এই মন্দিরটি ৬৬০ ফুট লম্বা এবং ৫১০ ফুট চওড়া। এখানে অবস্থিত দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মল্লিকার্জুন আছেন। মল্লিকার্জুন হলেন মহাদেবের মূর্তি।

এখানে এই মন্দির নিয়ে অনেক গল্পকথা আছে। কথিত আছে, বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ নাগার্জুন এখানে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এখানে অনেক সাধক পুরুষ দীর্ঘ তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাই শ্রীপর্বত সিদ্ধপীঠ হয়ে উঠেছে।

শঙ্কর এবারে শ্রীপর্বতে পৌঁছলেন। সেখানকার পণ্ডিতেরা একসঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে শঙ্করের এই প্রভাব প্রতিপত্তি সহ্য করতে পারছিলেন না। শঙ্কর উত্তর-ভারত জয় করেছেন এই খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এবার তিনি দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করতে চাইছেন। যেসব পণ্ডিতেরা সেখানে দীর্ঘ দিন ধরে শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করে আসছেন, তাঁরা চাইছেন না শঙ্কর সেখানে আসুন।

যাঁরা সেখানে ধর্ম আলোচনার নাম করে অর্থ উপার্জন করেন, তাঁরা কিছুতেই এই প্রভাব প্রতিপত্তি মেনে নেবেন না শপথ করলেন।

শুরু হল তর্কযুদ্ধ। শঙ্করের দুই প্রধান শিষ্য পদ্মপাদ ও সুরেশ্বরাচার্যের কাছে পরাস্ত হয়ে বিপক্ষ দলের পণ্ডিতেরা ফিরে গেলেন।

তাঁরা গোপনে তান্ত্রিক কাপালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কাপালিক প্রধান কচ উগ্রভৈরবকে নিযুক্ত করলেন শঙ্করকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু তিনি শঙ্করের সঙ্গে এমন আচরণ করলেন যেন শঙ্করকে কত শ্রদ্ধা করেন। তিনি শঙ্করের শিষ্য হয়ে তাঁরই মতাবলম্বী হয়ে উঠলেন।

ইতিপূর্বে শঙ্কর একদিন জানতে চাইলেন, কী তোমার প্রার্থনা, আমাকে খুলে বলো।

শঙ্কর জানেন তাঁর অদেয় কিছু নেই। যদি সে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বস্তুটি চায় তবে শঙ্কর প্রত্যাখ্যান করবেন। আর যদি সমগ্র মানব জাতির সার্বিক উন্নতির জন্য কিছু প্রার্থনা করে তবে তা মঞ্জুর করবেন।

উগ্রভৈরব বলল—আমার এমন একটি মস্তকের প্রয়োজন যিনি সর্বজ্ঞ। সর্বজ্ঞ মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া যায় না, যদি আপনি আপনার মাথা কেটে আমাকে ভিক্ষা দেন, তাহলে আমি বড়ো উপকৃত হই। তাহলে আমার আরাধ্য কাজ শেষ হয়।

শঙ্কর এই কথা শুনে মনে মনে হাসলেন। আর বললেন—বেশ, আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করব। তবে দ্যাখো, আমার শিষ্যরা যেন এই সংবাদ জানতে না পারে। তারা আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। তাহলে তুমি কৃতকার্য হতে পারবে না।

উগ্রভৈরব বলল—আগামী অমাবস্যার দিন অমানিশায় আমি অরণ্যের মধ্যে ভৈরব পূজার ব্যবস্থা করব। আশা করি আপনি উপস্থিত থেকে আমার প্রার্থনা পূরণ করবেন।

শঙ্কর দৃঢ় চিত্তে বললেন—বেশ আমি প্রস্তুত থাকব। শঙ্কর বিষয়টিকে ঈশ্বরের লীলা হিসাবে গ্রহণ করলেন। ভগবান এইভাবে শঙ্করের মৃত্যু চাইলে পৃথিবীর কেউ তা আটকাতে পারবে না। অবশেষে অমাবস্যার দিনটি এসে গেল। সূর্য অস্ত গেল। শঙ্করের মা-বাবার কথা মনে পড়ল। আলোয়াই নদীর কথা মনে পড়ল। শঙ্কর হয়তো যোগবলে আসন্ন মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করতে পারছেন। মধ্যরাত্রি এসে গেল। উগ্রভৈরব আচার্যকে ইশারায় নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গেল। প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম শেষ করে আচার্যকে প্রস্তুত হতে বলল।

আচার্য বললেন—আমি সমাধিস্থ হলে তোমার কাজ ভালোভাবে সমাধান হবে। আচার্য শান্ত ভাবে ঈশ্বরের চিন্তা করছেন। উগ্রভৈরব খড়গ নিয়ে সামনে উপস্থিত। হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন পদ্মপাদ। তাঁর আগমনে উগ্রভৈরব ভয় পেয়ে গেল। পদ্মপাদ এত রেগে গিয়েছিল যে, মনে হল সৃষ্টি বিনষ্ট হবে। যেসব কাপালিকরা এসেছিল তারা ভয়ে পালাল। উগ্রভৈরবের হাতের খড়গ কেড়ে নিয়ে পদ্মপাদ তার শিরচ্ছেদ করল। পদ্মপাদের চিৎকার শুনে শঙ্করের ধ্যান মগ্নতা ভেঙে গেল। তিনি তাকিয়ে দেখলেন পদ্মপাদের ইষ্টদৈব নৃসিংহদেব শিষ্যের শরীরে আশ্রয় নিয়েছেন। শঙ্কর নৃসিংহদেবের স্তব স্তুতি শুরু করলেন। নৃসিংহদেব পদ্মপাদের দেহ থেকে বেরিয়ে গেলেন। পদ্মপাদ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। চোখের সামনে এমন ঘটনা দেখে উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে গেলেন।

পদ্মপাদের জ্ঞান ফিরলে তিনি সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার বিবরণ দিলেন। শঙ্কর, পদ্মপাদকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। অন্য শিষ্যরাও পদ্মপাদের গুরুভক্তি দেখে চমৎকৃত হলেন।

একদিন শঙ্কর শিষ্যদের সঙ্গে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি দেখলেন সেখানে গিরি অনুপস্থিত। তিনি গিরির জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। আগ্রহী বৌদ্ধিক শিষ্যরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করল। গিরির মতো জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শিষ্যের জন্য অপেক্ষা করে কী লাভ? গিরি তখন তুঙ্গভদ্রা নদীতে গুরুদেবের অন্তর্বাস কাচছিল। হঠাৎ তার কানে গুরুদেবের কণ্ঠস্বর পৌঁছাল। এক অলৌকিক শক্তিতে গিরির তনুমন পূর্ণ হয়ে উঠল।

গিরি ছুটতে ছুটতে শিক্ষা কেন্দ্রে এসে পৌঁছোল। তারপর সকলকে অবাক করে দিয়ে সুললিত কণ্ঠস্বরে আধ্যাত্মিক কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলী অবাক হয়ে গেলেন।

শঙ্কর বুঝতে পারলেন এবার গিরিকে শাস্ত্রমতে দীক্ষা দিতে হবে। একটি শুভ দিন দেখে তিনি গিরিকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিলেন। তার নাম রাখা হল তোটকাচার্য। পরবর্তীকালে এই তোটকাচার্য জ্যোতির্মঠের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

সমাজের বৃহৎ বর্গের সঙ্গে এই শাস্ত্র যোগাযোগ হারিয়েছে। তাই প্রাধান্য পেয়েছে বৌদ্ধধর্ম। মহামতি গৌতমবুদ্ধ সহজ সরল ভাষায় সাধারণ মানুষদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন। শঙ্কর চেয়েছিলেন, হিন্দুধর্মের মূল বিষয়গুলিকে সহজ ভাষায় সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে।

সেই কারণেই তিনি শৃঙ্গেরিতে কিছুদিন অবস্থানের কথা ভাবলেন। কলস্বিনী তুঙ্গভদ্রার তীরে এমন সুন্দর জায়গা আছে, অন্যত্র গিয়ে কী লাভ? এই কাজের জন্য শঙ্কর সুরেশ্বরকেই নির্বাচিত করলেন।

শঙ্কর এই কাজের জন্য সমালোচিত হলেন। কারণ সুরেশ্বর সাংসারিক জীবনে কর্মমীমাংসার পণ্ডিত। তর্কে হেরে গিয়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। সকলে এই কাজের জন্য পদ্মপাদকে নির্বাচন করলেন। পদ্মপাদ আবার হস্তামলকে এই কাজের জন্য মনোনীত করলেন। শঙ্কর তখন চিন্তায় পড়লেন এই গুরুদায়িত্ব কাকে

দেওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি সব কথা সুরেশ্বরের কাছে খুলে বললেন। সুরেশ্বরকে আদেশ করলেন, তিনি যেন বেদান্ত তত্ত্বের প্রতিপাদক একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

সুরেশ্বর এই গ্রন্থ রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার পরিচয় প্রমাণ করলেন। তাঁর গ্রন্থটি পাঠ করে বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতেরাও অবাক হয়ে যায়। তাঁরা সকলেই শঙ্করের কাছে গিয়ে বললেন—সুরেশ্বর যেন আরও গ্রন্থ রচনা করেন। এর জন্য শঙ্করকে আদেশ দিতে হবে। সুরেশ্বর তৈত্তেরীয় এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের ওপর বার্তিক রচনা করলেন। এইভাবেই তিনি বার্তিকার নাম সার্থক করলেন। পদ্মপাদ শারীরিক ভাষ্যের ওপর বার্তিক রচনা করেছেন।

পদ্মপাদ তখন বিজয়ডিনডিম নামে সূত্রভাষ্যের টীকা রচনা করেন। পদ্মপাদের মনে তখন আকুল সংশয়। মনের ভেতর অনুশোচনার আগুনে জ্বলছে। তিনি একটি পাপ কাজ করেছেন। তিনি বার্তিক রচনার ক্ষেত্রে গুরুদেবের ইচ্ছার বিরোধীতা করেছিলেন। তাই তিনি কিছুদিন তীর্থ ভ্রমণ করতে চাইলেন। শঙ্কর তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারলেন। তাঁকে ডেকে পাঠালেন। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হল। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। শঙ্কর তাঁকে তীর্থভ্রমণের অনুমতি দিলেন।

গুরুর কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে পদ্মপাদ শিবতীর্থ কালহস্তিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে গেলেন কাঞ্চীতীর্থে। তারপর পুণ্ডরিকপুর এবং শিবগঙ্গা দর্শন করে যাত্রা করলেন রামেশ্বরের পথে। সেখানে ছিল তাঁর মাতুলালয়। তিনি কয়েকজন সহপাঠীকে নিয়ে মামার বাড়ি উপস্থিত হলেন। মামা তাঁর বিদ্যাবত্তা দেখে একেবারে অবাক হলেন। পণ্ডিত প্রভাকর বুঝতে পারলেন যে এই গ্রন্থটি থাকলে দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা একেবারে নস্যাৎ হয়ে যাবে। তাঁর মনে কু-ভাবনা জেগে উঠল। যে করেই হোক এই গ্রন্থখানিকে নষ্ট করতে হবে।

তিনি ষড়যন্ত্রের জাল পাতলেন। মামা এবার পদ্মপাদের স্মৃতি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে তাঁর খাবারে বিষ প্রয়োগ করলেন। বিষক্রিয়ায় পদ্মপাদের স্মৃতি নষ্ট হতে লাগল। সহপাঠীরা বুঝতে পারল অবিলম্বে এখান থেকে চলে না গেলে পদ্মপাদের মৃত্যু হবে।

শঙ্করাচার্য বুঝতে পারছেন, এবার তাঁর মাতৃদেবীকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে। মনে পড়ল তাঁর জননীর কথা, শৈশবের স্মৃতি। তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মাকে তিনি সাক্ষাৎ দেবী হিসাবে পূজা করতেন। মানুষের কল্যাণের জন্যই মা তাকে মাত্র আটবছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন। শঙ্কর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, অন্তিম সময়ে তিনি মায়ের কাছে উপস্থিত হবেন। এবার বোধ হয় সেই সময় এসেছে। শঙ্কর তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। যোগবলে আকাশপথে পরিভ্রমণ করলেন। সবশেষে পৌঁছে গেলেন জননী বিশিষ্টাদেবীর কাছে।

বিশিষ্টাদেবী শুনেছেন শঙ্কর এখন এক মহাসন্ন্যাসী হয়েছেন। তাঁর ওপর অনেক কাজের দায়িত্ব। তিনি ভাবলেন ছেলে কি কথা রাখবে? শেষ পর্যন্ত শঙ্করকে দেখে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। শঙ্করকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—আজ এই জীর্ণ শরীর সব কিছু চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে। এখন তুমি আমাকে সেই মহামন্ত্র শেখাও, যা উচ্চারণ করতে করতে আমি ভবসাগর পার হব।

এবারে শঙ্কর চোখ বন্ধ করে বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন। চারদিক মহাজ্যোতিতে ভরে গেল। বিষ্ণু নিজে এসে দাঁড়ালেন শঙ্করের সামনে। তাঁর সৌম্যমূর্তি দেখে শঙ্করের মা খুবই খুশি হলেন। শঙ্করজননী বিষ্ণুর সঙ্গে স্বর্গলোকে যাত্রা করবেন বলে ঠিক করলেন।

মায়ের মৃত্যু হল। জাগতিক খেলা শেষ হল। এবার দেহ সৎকার করতে হবে। তিনি আত্মীয় কুটুমদের কাছে প্রার্থনা করলেন। তাঁরা যেন আগুন দিয়ে সাহায্য করেন। কিন্তু কেউ সাহায্য করতে চাইলেন না। একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে দাহ সংস্কার করা উচিত নয়। সন্ন্যাসী পূর্ব জীবনের কোনো স্মৃতি রাখবেন না। এই কাজে সাহায্য করলে পাপলোকে পতিত হতে হবে।

শঙ্কর বুঝলেন এও তাঁর পরীক্ষা। তিনি নিজেই মায়ের দেহ বাইরে এনে কাঠ সংগ্রহ করে চিতা তৈরি করলেন। মায়ের ডান হাত ঘর্ষণ করে আগুন জ্বালালেন। চিতার অগ্নি প্রজ্বলিত হল। দাউদাউ আগুন শিখা আকাশের দিকে উঠে গেল।

সব কাজ শেষ হলে শঙ্কর ক্ষুব্ধ হয়ে আত্মীয় স্বজনদের অভিশাপ দিলেন যে, আত্মীয়-স্বজনদের গৃহ সেদিন থেকেই শ্মশানে পরিণত হবে। তারপর থেকে আজও পর্যন্ত মালাবারের ব্রাহ্মণরা নিজ নিজ গৃহের প্রাঙ্গনে দাহকাজ সম্পন্ন করেন।

শঙ্কর কেরলে এসেছেন শুনে কেরলের রাজা খুব খুশি হলেন। কেরলরাজ শঙ্করের সঙ্গে দেখা করার জন্য উপস্থিত হলেন। শিশুকালে রাজা শঙ্করকে তিনটি নাটক শুনিয়েছিলেন। শঙ্কর জানতে চাইলেন সেই নাটকগুলির প্রচার কেমন হচ্ছে? রাজা রাজশেখর মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, আমার অসাবধনতায় এই নাটক তিনটি পুড়ে গেছে।

রাজা যে এই জন্য ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত তা তিনি বুঝতে পারলেন। শঙ্কর বললেন—ছেলেবেলায় যে তিনটি নাটক শুনেছিলাম তার সমস্ত সংলাপ আমার মনে আছে। যদি আপনি একজন লিপিকার নিযুক্ত করেন তাহলে আমি তা বলতে পারব।

রাজা ও উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা সকলেই অবাক হলেন। রাজা একজন দক্ষ লিপিকার নিযুক্ত করলেন।

শঙ্কর রাজাকে বললেন—হে রাজন, আমি কালাডি গ্রামের ব্রাহ্মণদের অভিসম্পাত দিয়েছি। আপনি তাদের সঙ্গে সেইরকম ব্যবহার করবেন।

রাজা নতমস্তকে বললেন—মহাত্মা আপনার ইচ্ছা আমি পূর্ণ করব।

এবার শঙ্করের যাত্রাপথ মল্লিকার্জুন। তাঞ্জোর জেলার সুপ্রাচীন তীর্থ। শঙ্কর সেখানে আসছেন এই খবর ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে সন্ন্যাসী পণ্ডিতেরা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা আচার্যের শ্রীমুখে অদ্বৈত বিজ্ঞানের ভাষ্য শুনে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। অনেকে আবার তাঁর শিষ্য হবার জন্য আন্তরিক আবেদন করলেন।

শঙ্কর দেখলেন মহাদেব তাঁকে আর-একটি কঠিন পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি জাগ্রত দেবতার প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত বাক্যগুলি এক অদ্ভুত সুরলহরীর সৃষ্টি করল। কিছুক্ষণ বাদে চারপাশে উদ্ভাসিত হল অলৌকিক জ্যোতিঃপ্রভায়। দেবাদিদেব মহাদেব এসে দাঁড়ালেন শঙ্করের চোখের সামনে। তিনি ডান হাত তুলে তিনবার বললেন—অদ্বৈত সত্য, অদ্বৈত সত্য, অদ্বৈত সত্য।

উপস্থিত সকলে শঙ্করের নামে জয়ধ্বনি দিলেন। তাঁরা বিনা দ্বিধায় শঙ্করের শিষ্য হলেন।

এবার শঙ্কর এলেন সপ্তপুরীর অন্যতম উজ্জয়িনী। প্রাচীন কালে উজ্জয়িনী ছিল সমস্ত ভারতের কাপালিকদের প্রধান কেন্দ্র। বেতাল সিদ্ধ, বিক্রমাদিত্যের সঙ্গেও উজ্জয়িনীর নাম যুক্ত আছে।

শঙ্করের আগমন সংবাদে তন্ত্রসিদ্ধ ক্রকচ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল। কারণ শঙ্কর যদি উজ্জয়িনীতে এসে অদ্বৈত ধর্মের কথা প্রচার করেন তবে কাপালিকদের আধিপত্য খর্ব হবে। দীর্ঘদিন ধরে কাপালিকরা সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করে আসছে। নানা ভাবে অর্থ উপার্জন করে, লোভী জীবনযাপন করছে। তারা স্থির করল শঙ্করের আগমনকে রুখে দিতে হবে।

শঙ্করকে অপমান করার জন্য বিরাট কাপালিক বাহিনী নিয়ে ক্রকচ প্রস্তুত হলেন। রাজা সুধন্যা বুঝতে পারলেন এবার বিপদ উপস্থিত। তিনিই শঙ্করকে উজ্জয়িনীতে আসতে বলেছেন। রাজা তাঁর সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করলেন কাপালিক বাহিনীকে প্রতিহত করতে। দু-পক্ষের তুমুল লড়াই হল। শেষ পর্যন্ত কাপালিক বাহিনী পরাজিত হল। এরপর শঙ্করের প্রাণনাশের জন্য কাপালিকরাজ সংহার ভৈরবকে ডাকে। সংহার ভৈরব নিজ মূর্তিতে আবির্ভাব হয়ে বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে বললেন—অনাচারী তোর এত বড় স্পর্ধা যে তুই শঙ্করকে সংহার করতে চাস? তুই কি জানিস না, শঙ্কর আমার অংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তোর কৃতকর্মের ফল হল মৃত্যু।

এই কথা বলে সংহার ভৈরব কাপালিক রাজের মুণ্ড কেটে ফেললেন। এবার কাপালিকরা শঙ্করের কাছে এসে ভিক্ষা মার্জনা করল। শঙ্কর প্রত্যেককে প্রায়শ্চিত্ত করতে বললেন। উজ্জয়িনী থেকে দূষিত বায়ু দূর হল। শঙ্করের আধিপত্য স্থাপিত হল।

শঙ্কর এরপর যান কাঞ্চী। সপ্তপুরীর এক পুরী হিসাবে কাঞ্চী বিখ্যাত। একে অনেকে শিবকাঞ্চী বলে থাকেন। আবার কেউ কেউ বলেন বিষ্ণুকাঞ্চী। কাঞ্চীর রাজা ছিলেন শঙ্করের একান্ত অনুগত শিষ্য। শঙ্করের আদেশে ও উপদেশ অনুসারে তিনি অনেকগুলি দেবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

শঙ্করের পরের গন্তব্য চিদম্বর। চিদম্বরে এমন অনেক মন্দির আছে যার মাধ্যমে দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্যকলা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। ভবানীনগর একটি বিখ্যাত শক্তিপীঠ। দীর্ঘকাল ধরে এখানে শক্তি পূজার প্রচলন।

দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত দেবী হলেন মীনাক্ষীদেবী। তাঁর নামাঙ্কিত মাদুরা বা মধুরায় উপস্থিত হয়ে আচার্য শঙ্কর সুপর্ণ পদ্মিনী নদীতে স্নান করলেন। মীনাক্ষী এবং সুন্দরেশ্বরকে দশর্ন করে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর উদ্দেশে উপদেশ বাণী শোনালেন। তাঁর বাণী অনেককে বিমোহিত করল। অনেকে তাঁর শিষ্য হবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। এভাবেই তিনি মন্দির নগরী মাদুরার হৃদয় জয় করলেন।

শঙ্কর এবারে চলেছেন উত্তরবঙ্গ ভ্রমণে। এখানেও তান্ত্রিকদের প্রভাব প্রশ্নাতীত। শঙ্কর চিন্তা করতে লাগলেন কীভাবে এই মানুষদের স্বমতে নিয়ে আসা যায়। তখন বাংলাদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন মুরারী মিশ্র এবং ধর্মগুপ্ত। মুরারী মিশ্র একদিন আচার্য শঙ্করের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি একটি জটিল প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলেন। তিনি জানতে চাইলেন, মীমাংসা সিদ্ধান্ত এবং বেদান্ত সিদ্ধান্তের প্রয়োগ কেন একসঙ্গে হবে না। উত্তর মীমাংসা এবং পূর্ব মীমাংসা কেন একই শাস্ত্র হিসাবে গণ্য করা হবে না!

এই সব জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শঙ্কর একটির পর একটি যুক্তির অবতারণা করেন। সভায় উপস্থিত পণ্ডিতেরা শঙ্করের জ্ঞানবিদ্যার প্রাচুর্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তান্ত্রিক লোকাচারের অবলুপ্তি ঘটে গেল। বাংলাদেশ পরিভ্রমণের সময় একটি অলৌকিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে এক জ্যোতির্ময় পুরুষের আগমন ঘটল।

ওই জ্যোতিপুরুষ প্রশ্ন করলেন—বৎস শঙ্কর, আমার শিষ্য গোবিন্দ পাল, তার তত্ত্বে তুমি প্রতিষ্ঠিত আছ কিনা তা দেখতে এলাম। এই সৎ-চিৎ-আনন্দময় রাজ্যে কীভাবে অবস্থান করছ, তা জানতে ইচ্ছা করি।

শঙ্কর সেই যোগীপুরুষের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করেন। যোগীপুরুষ বললেন—ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ এবং মাণ্ডুক্য কারিকার যে ভাষ্য তুমি করেছ, তা অপূর্ব। তোমার কীর্তিতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। বলো তুমি আমার কাছ থেকে কী বর প্রার্থনা করো।

শঙ্কর স্মিত হেসে বললেন—হে পরম গুরু পৌরপদ, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমার চিত্ত সর্বদা চিন্ময় তত্ত্বে নিমগ্ন থাকে।

যোগীপুরুষ বললেন—তোমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

বাংলাদেশের অভিযান শেষ হলে তিনি কামরূপ পদার্পণ করতে হবে বলে যান।

শঙ্কর সেখানে এসেছেন শুনে প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা তাঁকে দর্শন করতে এলেন। কামাখ্যা মন্দিরে গিয়ে ধ্যান করতে লাগলেন আচার্য শঙ্কর। দীর্ঘক্ষণ কামাখ্যার পূজা করার পরে তিনি বৈদিক ধর্মের উপদেশ দিলেন। কেউই শঙ্করের সঙ্গে লড়াইয়ে জয়ী হতে পারলেন না।

কামরূপে থাকার সময়ে শঙ্কর মারাত্মক ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হন। তবে কোনো চিকিৎসকই তাঁকে রোগমুক্ত করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত শঙ্কর শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। এবারে এলেন রাজবৈদ্য। তিনিও রোগনিরাময়ে ব্যর্থ হলেন।

শিষ্যরা এবার সরাসরি শঙ্করের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানান। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই রোগমুক্তি ঘটাতে পারেন। শঙ্কর বললেন, আমি আর এই পৃথিবীতে থাকতে চাইছি না। এবার আমাকে লীলা প্রকট করতে

হবে।

এই সময়ে ব্রাহ্মণ বালকের বেশে দেবতাদের বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুজনে এলেন। তাঁরা বললেন সাধারণ চিকিৎসায় এই রোগ সারবে না। কারণ মন্ত্রশক্তির প্রয়োগে এই রোগের উৎপত্তি হয়েছে। মারণ-উচাটন মন্ত্রে শঙ্করকে জব্দ করা হয়েছে। পদ্মপাদ তখন গুরুদেবের প্রাণ ভিক্ষা করলেন। তিনি নৃসিংহদেবের শরণাপন্ন হলেন। নৃসিংহদেব জানালেন, শঙ্করের শরীরে কোনো রোগ নেই। তান্ত্রিক অবিচারের বিরুদ্ধে ওঁ মন্ত্র প্রয়োগ করতে হবে। তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু শঙ্কর এই কথা শুনে ওঁ মন্ত্র প্রয়োগ করতে পদ্মপাদকে নিষেধ করলেন। কারণ এই ভাবে যদি কেউ প্রত্যাবিচার করেন, তাহলে নরহত্যার পাপ তাঁকে স্পর্শ করবে।

পদ্মপাদ জানালেন, গুরুদেব যদি স্বেচ্ছায় দেহ ত্যাগ করেন তবে তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতেন। কিন্তু কোনো দুষ্ট কাপালিক বা তান্ত্রিকের অভিপ্রায়কে প্রশ্রয় দেবেন না।

আচার্য শঙ্কর এলেন পুরীতে। এই সময় বিধর্মীদের ভয়ে দারুময় বিগ্রহটিকে রত্নময়পেটিকায় পুরে চিল্কা হ্রদে লুকিয়ে রাখা হয়। মন্দিরের শালগ্রাম শিলাতে দেবতাদের পূজা করা হত। শঙ্করের কাছে মন্দিরের পুরোহিতরা এই কথা বিবৃত করলেন। শঙ্কর ধ্যানযোগে জায়গাটিকে চিহ্নিত করলেন। পেটিকাটি উদ্ধার করা হল। পূজারীগণ বিজয় উল্লাসে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতেরা তাঁর অদ্বৈত মতবাদ স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

এরপর শঙ্কর গেলেন পশ্চিম অঞ্চলে। তিনি প্রথমেই এলেন শ্রীবলিতে। শঙ্করের আগমনবার্তা শুনে গ্রামের এক ব্রাহ্মণ দম্পতি এলেন তাঁদের জড়বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্রকে নিয়ে। বালকটির পিতা-মাতা শঙ্করের পায়ে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন। শঙ্কর জানতে পারলেন পুত্রের বয়স ষোলো বছর পার হলেও তার অক্ষরজ্ঞান করা সম্ভব হয়নি। কোনোমতে তার উপনয়ন সংস্কার করানো হয়েছে।

বালকটি সবসময় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কোনো কথা শুনে বুঝতে পারে না। শঙ্কর বালকটির দিকে তাকিয়ে বললেন—হে শিশু তুমি কার পুত্র? তুমি কোথায় যাচ্ছ? তোমার নাম কী?

সে বলল—আমি মানুষ নই, দেবতা অথবা যক্ষ নই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র নই। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনচারী কিংবা ভিক্ষুক নই। আমি আত্মবোধরূপী।

এই বালকের শ্লোক শুনে শঙ্কর বিমুগ্ধ চিত্তে বললেন—এই বালক পূর্ব জন্মের প্রারব্ধের ফলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী। এ হল জাগতিক জ্ঞানশূন্য বালক। এই বালক দিয়ে পিতা-মাতার কোনো কাজ হবে না। বরং এই বালক যদি আমার হাতে সমর্পণ করা হয়, তাহলে একে আমি মহাপণ্ডিতে পরিণত করব। এ হবে আমার প্রধান শিষ্য।

কিন্তু তার পিতা-মাতা শঙ্করের প্রস্তাবে রাজি হলেন না। পরে সেই ব্রাহ্মণ দম্পতি শঙ্করের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। শঙ্কর তখন বালকটিকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দিলেন।

এরপর শঙ্কর যান মহারাষ্ট্রের পন্টরপুরে বিঠ্‌ঠলনাথে।

সেখান থেকে যান গোকর্ণ। গোয়া থেকে তিরিশ মাইল দূরে সমুদ্রতীরে এই গোকর্ণ তীর্থের প্রসিদ্ধ দেবতা হলেন মহাবালেশ্বর।

পশ্চিম ভারতের যে অঞ্চলটির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা জড়িয়ে আছে সেটি হল দ্বারকা। আরব সাগরের তীরে অবস্থান দ্বারকার। দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে শঙ্কর গোমতী তীর্থে অবগাহন করলেন।

ভারত পরিভ্রমণ শেষ হয়ে গেছে। ভারতের দিকে দিকে অদ্বৈত তত্ত্বের জয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে।

এরপর তিনি নেপালে কীভাবে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটানো যায় সে কথা চিন্তা করতে লাগলেন। শঙ্করের শিষ্যদের নির্দেশ মতো পশুপতিনাথের মন্দিরে পূজার আয়োজন করা হল। ভক্তমণ্ডলী পশুপতিনাথের মন্দিরে এসে সমবেত হলেন। 'পশুপতিনাথ কী জয়' ধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করল।

নেপালের পর শঙ্করের অবস্থান হবে তিব্বতে। প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় তিব্বত ছিল ভারতের অংশ। কথিত আছে শঙ্কর যখন তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেন তখন অন্যদিকে একটি কড়াইতে তেল ফুটতে

থাকত। শঙ্কর তিব্বতে গিয়ে সেখানকার তান্ত্রিকদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। দিগ্বিজয়ের সীমা নির্ধারণের জন্য তিনি সেখানে কড়াইটি রেখে এসেছিলেন। সেই থেকেই স্থানটি 'শঙ্কর কটাই' নামে পরিচিত।

মহর্ষি ব্যাসদেব শঙ্করকে যে বাড়তি ষোলো বছর আয়ু দিয়েছিলেন, তা শেষ হতে চলল। শঙ্কর তখন বত্রিশ বছরের এক যুবক। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় পৃথিবীতে এসেছিলেন হিন্দু ধর্মকে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার হাত থেকে উদ্ধার করতে। তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন। পূর্বে স্থাপন করেছেন গোবর্ধন মঠ, বঙ্গোপসাগরের তীরে জগন্নাথ ধাম পুরীতে এই মঠ স্থাপন করেন। তাঁর প্রথম শিষ্য পদ্মপাদকে এই মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত করেন।

পশ্চিমে স্থাপন করেছেন সারদা মঠ।

হিমালয়ের কোলে বদ্রীনারায়ণ থেকে কুড়ি মাইল দক্ষিণে স্থাপন করেছেন জ্যোতির্মঠ। বর্তমানে সেটি যোশীমঠ নামে পরিচিত। দক্ষিণে মহীশূরের অন্তর্গত কভুর জেলার তুঙ্গা নদীর বাঁদিকে স্থাপিত হয় শৃঙ্গেরি মঠ। এই মঠটি বৈদিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং অদ্বৈত বেদান্তের প্রাণবিন্দু স্থাপন করা হয়। শঙ্করাচার্যের পট্টশিষ্য সুরেশ্বরাচার্য এই মঠের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই মঠের অধীনে থাকা সন্ন্যাসীরা সরস্বতী ভারতী ও পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন।

শঙ্কর এইভাবে চারটি প্রধান মঠের অধীনে দশনামী সম্প্রদায়কে ভাগ করেছিলেন।

এই চারটি বড়ো মঠ ছাড়াও সারা ভারতবর্ষে শত শত উপমঠ প্রতিষ্ঠা করেন শঙ্কর।

শঙ্কর অন্যান্য যে মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার মধ্যে কাশীর সুমের মঠ এবং কাঞ্চীর কামকোঠি মঠ বিখ্যাত।

শঙ্কর তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়কে দশটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। এই বিভাগগুলি হল—

যে ব্যক্তি তত্ত্বমসি তীর্থে তত্ত্বের অর্থ জানার জন্য স্নান করেন, তাঁকে **তীর্থনামী** বলা হয়।

আশ্রমের কঠিন নিয়মকে জীবনে গ্রহণ করে আশা, মমতা, মোহ ইত্যাদি বন্ধন বিমুক্ত হয়ে যিনি আশ্রম পরিবেশে জীবনযাপন করেন, তিনি হলেন **আশ্রমনামী**।

জগতে সকল বন্ধন মুক্ত হয়ে যিনি শান্ত নির্জন বনকে আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাকে **বর্ণনামী** বলা হয়।

পার্থিব কল-কোলাহল এবং কলহ থেকে মুক্ত হয়ে যিনি অরণ্যবাসের আনন্দ উপভোগ করবেন, তিনি **অরণ্য** নামে পরিচিত হবেন।

যিনি উঁচু পাহাড়ের ওপর বাস করে গীতা অভ্যাসে তৎপর থাকবেন, তিনি হবেন **গিরিনামী** সম্প্রদায়।

পাহাড়ের মূলদেশে নিবাস করে যিনি সংসারের সার অসার সম্বন্ধে গভীর বোধে উদ্বুদ্ধ হবেন, তিনি হবেন **পর্বতনামী**।

গভীর সমুদ্রের তীরে বাস করে অধ্যাত্মসাগর থেকে প্রয়োজনীয় উপদেশ যিনি আহরণ করবেন, তিনি হলেন **সাগরনামী**।

যিনি বেদের স্বরগুলি সম্বন্ধে সচেতন হবেন, তিনি হবেন **সরস্বতীনামী**।

দুঃখের ভার, জগতের সকল ভার মুক্ত হয়ে যিনি ভার ধারণ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প, তিনি **ভারতীনামী** হবেন।

আর যিনি পূর্ণতত্ত্ব পদে পরিপূর্ণ, তিনি হবেন **পরীনামী** সম্প্রদায়।

এইভাবে শঙ্কর হিন্দুধর্মকে পুনঃজাগরিত করলেন। সত্য যুগে ব্রহ্মা, ত্রেতায় মহর্ষি বশিষ্ঠ, দ্বাপরে ব্যাসদেবের মতো কলিযুগে তিনি হলেন আচার্য শঙ্কর জগৎগুরু।

এরপর তিনি লীলা সংবরণের জন্য এলেন কাঞ্চীতে। সেখানকার সর্বজ্ঞ পীঠে আরোহণ করলেন। তারপরে এলেন দক্ষিণের কৈলাস বলে বর্ণিত কৃষ্ণাঞ্চলে। শঙ্কর বুঝতে পারলেন তিনি আর বেশিদিন ইহজীবনে থাকতে পারবেন না। এবার তিনি ত্রিচুরের মন্দিরে এলেন। সেখানে পূজাপাঠ সম্পাদন করলেন। এরপর

যোগারূঢ় অবস্থায় পরমব্রহ্মে লীন হলেন। এই মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গনে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল। এই স্থানটিতে আজও মানুষ আসেন শঙ্করের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

শঙ্করের দেহবসানের বিভিন্ন কাহিনি আছে।

এর মধ্যে মাধবাচার্যের রচনাটি খুবই মর্মকাতর।

শঙ্কর অনুভব করেছিলেন বত্রিশ বছর শেষ হতে আর দেরি নেই। এই খবর চারপাশে রটে গেলে ভক্তরা সাক্ষাৎ করতে এলেন।

শঙ্কর বললেন—হে আমার সন্তানগণ, দেখতে দেখতে আমার জীবন শেষ লগ্নে এসে উপস্থিত। যতদিন তোমরা বেঁচে থাকবে ততদিন সনাতন বৈদিক ধর্ম প্রচার করবে।

ভক্তরা শিবের অবতার শঙ্করকে চতুর্দোলায় চাপিয়ে স্বর্গলোকে নিয়ে যান।

সামনে অনন্ত অনির্দেশ পথ, সুবাসিত গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে। কৈলাসের পথে মহাযাত্রী আচার্য শঙ্কর। দেবগণ, ঋষি এবং সিদ্ধিযোগীরা তাঁকে অনুসরণ করছেন।

তিনি ঈশ্বরভক্তির সমস্ত উপলব্ধিকে একত্রিত করে এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করে গেছেন।

শঙ্করাচার্যের দর্শন

শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেন জীব এবং ব্রহ্ম একান্ত অভিন্ন। আবার রামানুজের মতো বিশিষ্ট সাধকেরা জীবনের সঙ্গে ব্রহ্মের সঙ্গে সম্বন্ধকে গুণের সঙ্গে গুণীর সম্বন্ধকে তুলনা করেছেন। একে বলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। বল্লভ শুদ্ধাদ্বৈত বেদান্ত প্রচার করেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ অংশীর সঙ্গে অংশের সম্বন্ধের সঙ্গে তুলনীয়। নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈত মতো প্রচার করেছেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ প্রচার করেছেন। এই প্রসঙ্গে আর—একটি কথা মনে রাখতে হবে, তা হল শঙ্কর ছিলেন জ্ঞানবাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তিলাভ করা সম্ভব। আবার রামানুজ, বল্লভ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও বলদেব ছিলেন ভক্তিবাদী। তাঁদের মতে ভক্তিই মুক্তির সাধন। শঙ্করের মতে ঈশ্বর সগুণ। রামানুজ, বল্লভ, নিম্বার্ক, মধ্ব এবং বলদেব ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলেছেন। শঙ্কর বিশ্বাস করতেন মায়া মিথ্যা এবং জগৎ মিথ্যা। ভক্তিবাদীরা বলতেন মায়া ঈশ্বরের শক্তি তাই জগৎ মিথ্যা নয়।

শঙ্করাচার্যের দর্শন ভাবনা প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করার আগে ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে প্রাথমিক আলোকপাত করা প্রয়োজন। নাহলে আমরা শঙ্করের দার্শনিক অভিজ্ঞানকে ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে পারব না।

ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য

ইংরাজিতে Philosophy এই শব্দটির সঙ্গে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। এই কথাটির মধ্যে দুটি গ্রিক শব্দ রয়েছে—ফিলোস (Philos) এবং সফিয়া (Sophia)। প্রথম শব্দটির বাংলা অর্থ হল প্রীতি বা Love এবং দ্বিতীয়টির অর্থ প্রজ্ঞা বা Wisdom। তাহলে আমরা Philosophy শব্দটির আক্ষরিক অর্থ করতে পারি প্রজ্ঞাপ্রীতি বা Love for wisdom।

প্রীতি শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে অসুবিধে হয় না। প্রীতিকে আমরা ভালোবাসার নামান্তর করতে পারি। ভালোবাসা শব্দটির মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোঝায়, প্রীতি কিন্তু সেই অর্থে অনেক সার্বজনীন চেতনা। প্রজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া উচিত। যেহেতু মানুষ জ্ঞানী জীব, তাই প্রজ্ঞা শব্দটির সঙ্গে তার পরিচিতি আছে। জ্ঞানের মধ্যেও নানাধরনের জ্ঞান আছে। সাধারণ জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা। সাধারণ জ্ঞান বলতে কী বোঝায়? দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য মানুষকে প্রতি মুহূর্তে কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। মানুষ যে জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে সেই বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে যায় তাই হল সাধারণ জ্ঞান। সাধারণ জ্ঞানের গুরুত্বকে আমরা কখনো অস্বীকার করতে পারি না। তবে সাধারণ জ্ঞানের একটি সীমাবদ্ধতা আছে। এই জ্ঞান আবার যথাযথ ও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না। তাই আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে সাধারণ জ্ঞানের ওপরে স্থান দিয়েছি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে বিজ্ঞানসম্মত মনোভাব থাকা

দরকার। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরেও কিছু শূন্যতা থেকে যায়, সেই শূন্যতা পূরণ করার জন্য প্রজ্ঞার দরকার।

যে কোনো বিজ্ঞান তার আলোচনার সুবিধার জন্য জগৎ এবং জীবনের কয়েকটি নির্দিষ্ট বিভাগকে বেছে নেয়। যেমন পদার্থবিদ্যার বিষয় হল পদার্থের গুণগত, প্রকৃতিগত, আয়তনগত হিসাব-নিকাশ করা। রসায়ন-শাস্ত্রের আলোচনার বিষয় হল রাসায়নিক পদার্থ। জীবনের উৎস, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং পরিসমাপ্তি নিয়ে আলোচনা করে জীববিদ্যা। মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মানুষের মনের গতিপ্রকৃতি। তাহলে জগৎ এবং জীবনকে সামগ্রিকভাবে আমরা কোনো বৈজ্ঞানিক অনুধাবনের মধ্যে জানব? এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রজ্ঞা বিষয়টি এসে যায়। জগৎ ও জীবনের সামগ্রিক সার্বভৌম সর্বার্থক জ্ঞানকেই প্রজ্ঞা বলা যায়। তাই প্রজ্ঞাপ্রীতিকে আমরা দর্শন বলতে পারি।

কিন্তু সামগ্রিক জ্ঞান—এই বিষয়টিরও ব্যাখ্যা করা দরকার। জগৎ এবং জীবনের সঙ্গেই কিছু বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আছে এমন কিছু চিরন্তন সত্য বা তত্ত্ব যা জানতে পারলে জগৎরহস্য এবং জীবনরহস্য আমাদের কাছে অনেকটা সহজ হয়ে যায়। সেই চরম ও পরম সত্য এবং তত্ত্ব সংক্রান্ত জ্ঞানকেই প্রজ্ঞা বা wisdom বলা হয়। এইভাবেও আমরা 'প্রজ্ঞা' শব্দটির ব্যাখ্যা করতে পারি।

এখানে আর-একটি কথা মনে রাখতে হবে তা হল দর্শন এবং ফিলসফি দুটিকে আমরা ভুলবশত সমার্থক শব্দ হিসাবে ধরি। কিন্তু তারা ঠিক সমার্থক শব্দ নয়। ফিলসফি শব্দটির সঙ্গে মানুষের বোধ, বুদ্ধি, চেতনা এবং প্রজ্ঞা জড়িয়ে আছে, মানুষের চিন্তার ভিতর যেসব মূল বিষয়গুলি আছে তাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হল ফিলসফির মুখ্য কাজ। প্রতীচ্য দেশে সেই অর্থে ফিলসফি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন কথা বলা যায় না। যদিও ভারতীয় দর্শনে বুদ্ধিনির্ভর বিচার-বিশ্লেষণের একটি আলাদা জায়গা আছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের পরিধি তার বাইরে বিস্তৃত। আর এই কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে ভারতীয় দর্শনের বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার।

ভারতীয় দর্শনকে অনেকে সাধনাকেন্দ্রিক জ্ঞান আহরণ বলে থাকেন। কিন্তু আসলে তা নয়। যদিও চার্বাক ছাড়া অন্য সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধনা আছে, তবে সাধনাই ভারতীয় দর্শন অভিক্ষার একমাত্র কাম্যবস্তু নয়।

'দর্শন' শব্দটির মূল হল দৃশ ধাতু। যার অর্থ জানা। অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিক মনে করেন তাঁদের আলোচ্য বিষয় হল তথ্যকেন্দ্রিক জ্ঞান। তত্ত্বের দর্শন বা তত্ত্বের রহস্য বিস্তার করা। এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতীয় দর্শনের মূল বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করব।

ফিলসফিতে জ্ঞান বলতে সত্যজ্ঞানকে বোঝায়। পাশ্চাত্য ফিলোসফাররা বিশ্বাস করেন যে, জ্ঞান কখনো মিথ্যা হতে পারে না। ভারতীয় দর্শন আবার জ্ঞানকে সত্য ও মিথ্যা এই দুইভাগে ভাগ করেছেন। সত্য জ্ঞান প্রমা এবং মিথ্যা জ্ঞানকে অপ্রমা বলা হয়। ভারতীয় দর্শনের আলোচ্য বিষয় হল প্রমা, অপ্রমা, প্রমাণ ও প্রমেয়।

ভারতীয় দর্শন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। চার্বাক ছাড়া অন্য ভারতীয় দার্শনিকেরা জীবনকে দুঃখ মুক্ত করার কথা বারবার ঘোষণা করেছেন। অনেকে ঔষধ সেবন করে দুঃখকে সাময়িকভাবে ভুলতে চান। আবার কার্ল মার্কসের মতো রাজনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন অর্থনৈতিক অজ্ঞানতা এবং দুর্বলতাই হল দুঃখের কারণ। তাঁরা অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে দুঃখের কারণ বলে মনে করেন। অজ্ঞান দূর হলে দুঃখের কারণ দূরীভূত হবে বলে তাঁরা মনে করেন। আবার অনেক ভারতীয় দার্শনিক বলেন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নয়, আনন্দলাভই হল জীবনের কাম্য। কিন্তু দুঃখকে না দূর করতে পারলে আমরা আনন্দকে লাভ করতে পারব না। দুঃখ দূর হবার পর আনন্দ লাভের বিষয়টি রচিত হতে পারে।

ভারতীয় দর্শনের দুটি দিক আছে। (১) তত্ত্বের আলোচনা এবং (২) তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য সাধনা। দ্বিতীয় দিকটির সঙ্গে নীতি এবং ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাই গবেষকরা মনে করে থাকেন ভারতীয় দর্শন—

ভাবনাকে ধর্মের থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। অনেকে আবার দর্শনের প্রথম দিকটি অর্থাৎ তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ করাতেই মনোনিবেশ করেন। তাঁরা দ্বিতীয় দিকটিকে উপেক্ষা করেন। ভারতীয় দর্শনের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এইভাবে আলোচনা করে গেছেন।

দর্শন সম্পর্কে ভারতীয় গবেষকরা আরও একটি বিষয় তুলে ধরেছেন। তাঁরা বলেছেন তত্ত্ব দিয়ে জগৎ ও জীবনের সমস্ত রহস্য ভেদ করা যায়। সেই তত্ত্বই হল দর্শন। আমরা ভাবি খণ্ড ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত ঘটনা ও বস্তুগুলিকে যদি একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে আনা যায় তাহলে আমরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে পারব। যেমন—মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব নামে একটি নিয়ম আছে। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই এই নিয়মের অধীন। বিজ্ঞানীরা বলেন কোনো একটি বিষয়কে একটি নিয়মের অধীনে এনে তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

কিন্তু ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য যদি হয় নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসা তবে জগৎ ও জীবনের সব রহস্য আমরা এইভাবে নিয়মতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়ে তুলে ধরতে পারব না। বিজ্ঞান কখনোই চরম ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে না। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা হল আপেক্ষিক ব্যাখ্যা। দর্শন অবশ্য এই চেষ্টা করে থাকে। দার্শনিকরা বারবার এই প্রশ্ন করেছেন—এমন কী তত্ত্ব আছে যা জানতে পারলে সবকিছু জানা হয়? দার্শনিকদের মতে এই তত্ত্বই হল চরম সত্য। এই সত্যের পথে তাই তাঁরা নিরন্তর এগিয়ে যান।

প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যের দর্শন ভাবনার মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য আছে, সেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা দরকার। পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিকরা সত্যের বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন। তাঁরা সত্যকে সেইভাবে অন্তরের অন্তঃস্থলে উপলব্ধি করতে চান না। তাঁদের কাজ হল সত্যের ঔপপত্তিক আলোচনা। তাই পাশ্চাত্য দেশের দর্শনকে আমরা একটি তাত্ত্বিক আলোচনাশাস্ত্র বলতে পারি, এই দার্শনিক অভীক্ষার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চিন্তাধারা সেইভাবে সংযুক্ত নয়।

কিন্তু সত্য সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সত্যকে উপলব্ধি করা ভারতীয় দর্শনের মূল আদর্শ। ভারতীয় দর্শন, একদিকে যেমন তার্কিক আলোচনার স্থান উন্মুক্ত করে, এর পাশাপাশি জীবনশৈলীতে দর্শনের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করে। ভারতীয় দার্শনিকরা মনে করেন দর্শনবিদ্যাকে শুধু মাত্র কালো কালির অক্ষরে বন্দি রাখা উচিত নয়, জীবনের সহস্র কর্মে দার্শনিক অভিজ্ঞানকে উপলব্ধি করতে হবে, তবেই দর্শন-চিন্তা সার্বভৌম এবং সার্বজনীন হয়ে উঠবে। ভারতীয় দর্শন সত্য-সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। **তাই ভারতীয় দর্শন সত্যচর্চা এবং সত্যচর্যার ওপর নির্ভরশীল।** কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার এই বিচার বিশ্লেষণের ব্যতিক্রম দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে আমরা চার্বাক এবং শ্রীহর্ষের কথা উল্লেখ করতে পারি। তাঁরা বিচারমূলক দর্শন আলোচনায় বিশ্বাস করতেন, সেখানে জীবনব্যাপী সাধনার দিকটি সেভাবে উন্মোচিত হয়নি। মধ্যযুগীয় দার্শনিকরাও কিন্তু সত্যচর্চার পাশাপাশি সত্যচর্যাকেও জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত, আমরা পাশ্চাত্যের বিখ্যাত দার্শনিক স্পিনোজার নাম করব।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে নানা দিক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে আছে তর্কবিজ্ঞান, মানবিজ্ঞান, সমাজদর্শন, মনোবিজ্ঞান, তত্ত্ববিজ্ঞান এবং জ্ঞানবিচার। পাশ্চাত্য দার্শনিকরা এর প্রতিটি বিষয়কে উপলব্ধি এবং উপলব্ধ জ্ঞান দ্বারা বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। তর্কবিজ্ঞান শুদ্ধবিজ্ঞান বা অনুমানের নিয়মাবলির দ্বারা সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেন। জ্ঞান-বিচারের মাধ্যমে জ্ঞানের সামান্যীকরণ ও বিশেষীকরণ হয়ে থাকে। নীতিবিজ্ঞান মানুষকে নৈতিক পথে চলার নানা দিক নির্দেশ করে। সৌন্দর্য বিজ্ঞানের কাজ হল সৌন্দর্যবিদ্যাকে ব্যাখ্যা এবং প্রতিষ্ঠা করা। মূল্যবিজ্ঞানের দ্বারা আমরা কোনো একটি মূল্যের অর্থগত মান নিরূপণ করতে পারি। সমাজদর্শনের মাধ্যমে সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ হয়, মনোবিজ্ঞানের দ্বারা বিভিন্ন মানসিক প্রক্ষোভের ব্যাখ্যা সম্ভব। একদা মনোবিজ্ঞানকে দর্শনের অন্যতম শাখা হিসাবে গণ্য করা হত। সম্প্রতি মনোবিজ্ঞান অবশ্য একটি পৃথক 'শাস্ত্র' হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

ভারতীয় দার্শনিকরা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে আলাদা আলাদা ভাবে চিন্তা করেন না। তাঁরা তত্ত্বের সংযুক্তিকরণে বিশ্বাসী। তাই ভারতীয় দর্শন তত্ত্ববিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞানকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে

বিচার করে। সেখানে তাত্ত্বিক বিষয়টিও যেমন আলোচিত হয়, তার্কিক উপস্থাপনাও চোখে পড়ে। ভারতবর্ষ এক-কে বিচিত্রের পটভূমিকায় বিচার করে আবার বিচিত্র ভাবনাকে একীভূত করার চেষ্টা করে। এই বিষয়টিকেই অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সামগ্রিক দৃষ্টি বা synthetic outlook নামে অভিহিত করেছেন। **পাশ্চাত্যদর্শন যেমন বিশেষীকরণের প্রতি নিবেদিত, ভারতীয় দর্শন কিন্তু সামগ্রিক বিচার-ব্যবস্থার প্রতি নির্ভরশীল।**

এই প্রসঙ্গে আর-একটি মৌলিক সমস্যার কথা বলা উচিত। ভারতীয় দর্শন বলতে আমরা কোন-জাতীয় দর্শনশাস্ত্রের কথা বলব? এর মধ্যে প্রাচীন, নবীন, হিন্দু, অহিন্দু, আস্তিক, নাস্তিক প্রভৃতি নানা মতবাদ আছে। অনেকে ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে হিন্দু দর্শনকে একীভূত করেন। এমন সাধারণীকরণ করা কখনোই উচিত নয়। তবে হিন্দু শব্দটির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে নানা তর্ক চলে। হিন্দু অর্থে যদি আমরা ভারতীয়ত্বকে বোঝাই তাহলে ভারত-দর্শনকে হিন্দুদর্শন বলা যেতে পারে। আবার হিন্দু অর্থে যদি শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বোঝায় তাহলে ভারতদর্শন বলতে কখনোই হিন্দুদর্শন বলা যাবে না। ভারতবর্ষে নানা ধরনের দার্শনিক মতবাদকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় দর্শনচিন্তায় নাস্তিক জড়বাদী, চার্বাক, নাস্তিক, বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ের কথাও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তাই ভারতদর্শনকে আমরা শুধুমাত্র ঈশ্বরবিশ্বাসী আস্তিক-দর্শন হিসাবে চিহ্নিত করব না।

যেহেতু ভারত চিরকাল সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা এবং উদারতার জন্য বিখ্যাত তাই ভারতীয় দর্শনেও সেই উদারতার প্রভাব পড়েছে। ভারতবর্ষে দার্শনিক আলোচনার মধ্যে একদিকে আছে মানসিক উদারতা এবং অন্যদিকে আছে দৃষ্টির স্বচ্ছতা। ভারতবর্ষের দার্শনিকগণ খোলা মনে বিভিন্ন দেশের দার্শনিকদের মতবাদ গ্রহণ করেছেন। বিচারবুদ্ধি-সহকারে তাঁদের অনুশীলন করেছেন। অনুধ্যান করেছেন। তারপর কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। বিরুদ্ধবাদী মত শ্রবণ এবং খণ্ডন না করে ভারতীয় দার্শনিকরা কখনোই স্বীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। তাই ভারতীয় দর্শনের বিচার ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ভারতীয় দর্শনের আর-একটি বৈশিষ্ট্য হল তার ব্যাপকতা। ভারতীয় দর্শনকে নানাভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, ন্যায় এবং বৈশেষিক। আমরা লক্ষ করব যে, যে কোনো একটি দার্শনিক সমীক্ষায় অন্য দর্শনের যে কোনো আকরগ্রন্থ বিপুলাকার হয়ে উঠেছে। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের অনেক সমস্যাই ইউরোপীয় দর্শনের পাতায় পাতায় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের বিচার-পদ্ধতিতে এমন কিছু তীব্রতা অনুভূত হয়, যাতে প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় দার্শনিকগণ কত বড়ো বুদ্ধিজীবী ছিলেন! ভারতীয় দর্শনের দিকপাল হলেন পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ। তিনি ইউরোপীয় দর্শনের যে কোনো সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান করতে পারতেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় দর্শনের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বরা পাশ্চাত্য দেশের দর্শন সম্পর্কে কতখানি অবহিত ছিলেন! তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে সারা পৃথিবীর দর্শনচিন্তা এক এবং অভিন্ন যদিও আলোচনার সুবিধার্থে আমরা তাদের মধ্যে নানা অনাবশ্যক বিভেদ-বিভাজন রেখা টেনে দিয়েছি। আমরা মনে করি প্রতীচ্য এবং প্রাচ্য দর্শনের মধ্যে বিস্তর ফারাক ও বিভেদ বিদ্যমান, আসলে কিন্তু তা নয়। প্রতীচ্য দেশের দার্শনিকরা একভাবে সত্যকে জানার চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে প্রাচ্যদেশের দার্শনিকরা অন্যভাবে সত্যপথে পৌঁছোতে চান। তাঁদের মধ্যে প্রাথমিক দিকে হয়তো কিছু বিভিন্নতা থাকে, তারপর যতই তাঁরা মূল বিষয়ের দিকে এগিয়ে যান, এইসব বিসদৃশ্য বিষয়গুলি অন্তর্হিত হয়ে যায়। তখন মনে হয় তাঁরা বুঝি একই পথের পথিক হয়ে সেই ইঙ্গিত পরিসমাপ্তির দিকেই এগিয়ে চলেছেন।

ভারতীয় দর্শনচিন্তার ক্রমবিকাশ

ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন যীশুখ্রিস্টের জন্মের দু-হাজার বছর আগে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে আর্যরা ভারতে আসেন। তখন থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির জয়যাত্রা শুরু হয়। আর্যরা তাঁদের

সঙ্গে বহন করে এনেছিলেন সু-উন্নত সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার বিভিন্ন উজ্জ্বল দিকচিহ্ন। এর পর পরবর্তী পর্যায়ে রচিত হয় ঋক্-সংহিতা। ঋক্-সংহিতার মাধ্যমেই ভারতের দর্শনচিন্তার উৎকর্ষ আমাদের চোখে পড়ে। তাই ভারতের দার্শনিক চিন্তার ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি আলোচনা করতে হলে ঋক্-সংহিতাকেই তার উৎসস্বরূপ বিবেচনা করতে হবে।

দীর্ঘ চার হাজার বছর ধরে ভারতীয় দর্শনচিন্তার ক্রমবিকাশ আমাদের চোখে পড়েছে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, প্রতীচ্য দর্শন-ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমরা সেই ধারাবাহিকতা দেখতে পাই না। এর কারণ কী? ভারত-ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের হাতে আসে না, এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এতই অস্পষ্ট যে আমরা দার্শনিক চিন্তার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করতে পারি না। তাই আমরা বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের রূপরেখাটি নির্ধারণে অসমর্থ হই। অনেক সময়ে কল্পনা এবং জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করতে হয়, এভাবে রচিত কোনো ইতিহাসকে আমরা প্রামাণ্য এবং তথ্যনিষ্ঠ বলে গ্রহণ করতে পারি না।

এর পাশাপাশি আর-একটি বিষয়ের কথা বলা উচিত। প্রতীচ্য দর্শনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে বিভিন্ন দার্শনিকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা হাতে পাই। পক্ষান্তরে ভারত দর্শনের রূপরেখা নির্ধারণ করতে গিয়ে আমরা বিশিষ্ট ভারতীয় দার্শনিকদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারি না। এর কারণ কী? এর কারণ হল ভারতীয় চিন্তায় ব্যক্তির জীবনের থেকে তার জীবনদর্শনকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই ভারতীয় দার্শনিকদের জীবন-ইতিহাস রচনা করা একটি দুরূহ কর্ম। আবার, ন্যায়দর্শনের স্রষ্টা মহর্ষি গৌতম এবং অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের জীবনকথা হিসাবে যেসব গ্রন্থ আমাদের হাতে আসে সেগুলি কতখানি প্রামাণ্য এবং কতখানি কাল্পনিক তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

ঐতিহাসিকরা মনে করেন যীশুখ্রিস্টের জন্মের ৪৮৭ বছর আগে মহাত্মা বুদ্ধদেব মহানির্বাণ লাভ করেন। এই সময়টিকে আমরা ভারতীয় দর্শন চিন্তার একটি সীমারেখা স্বরূপ ঘোষণা করতে পারি। এই সময় বৈদিক যুগের শেষ সূচিত হয় এবং নতুন দর্শন-সম্প্রদায়ের উদ্ভব চোখে পড়ে। বৈদিক চিন্তায় দার্শনিকতার বীজ সুপ্ত অবস্থায় ছিল, পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় দর্শন একটি বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। প্রথম পর্যায়ের সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরালে ছিলেন অন্তর্দ্রষ্টা ঋষিরা। তাঁরা জীবনব্যাপী সাধনার মাধ্যমে অধ্যাত্ম-সাহিত্যজগতের দশদিক আলোকিত করেছেন। তাঁদের সাধনার গুরুত্ব অপরিসীম! তবে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনধারা সম্পর্কে তথ্য এতই কম আমাদের হাতে আসে যে এই বিষয়ের একটি প্রামাণ্য দলিল তৈরি করা আমাদের সম্ভব নয়। দ্বিতীয় স্তরে ভারতীয় দার্শনিকদের সম্পর্কে বরং অনেক কথা জানা যায়। যে-সমস্ত ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে আমরা সদা সর্বদা আলোচনা করে থাকি সেই বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্বমীমাংসা এবং বেদান্ত সবই দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত।

তৃতীয় স্তরে রচিত ভগবত গীতাকেও আবার দর্শন সম্প্রদায়ের দ্বারা গৃহীত বলে মনে করা হয় না। যদিও বেদের মতো গীতাতেও কিছু কিছু দার্শনিক চিন্তা চোখে পড়ে। পরবর্তীকালে শঙ্কর তাঁর সম্প্রদায়ভিত্তিক ভাষ্য রচনা করে প্রশংসার পাত্র হয়েছেন। গীতার মধ্যে বৈদিক যুগ এবং দর্শন সম্প্রদায়ের যুগের এক কাঙ্ক্ষিত মিলন পরিলক্ষিত হয়। এই গীতাকে আমরা ওই দুটি যুগের সেতুবন্ধ স্বরূপ চিন্তা করতে পারি। আবার বেদান্ত দর্শনের যে তিনটি 'প্রস্থান' আছে সেখানে গীতাকে স্মৃতিপ্রস্থান হিসাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয়-দর্শন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে কয়েকটি বিরোধের কথা বলা উচিত। যেহেতু ভারত সংস্কৃতি একটি সহিষ্ণু সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে স্বীকৃত তাই এখানে বিরোধী চিন্তাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বরণ করা হয়েছে। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার প্রথম বিরোধ হল আস্তিক এবং নাস্তিক এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। আস্তিকদের মতবাদ নাস্তিকরা সঙ্গত কারণেই খণ্ডন করেছেন। আবার নাস্তিকদের মতবাদ আস্তিকেরা খোলামনে মানতে চাননি। বিভিন্ন আস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানা ধরনের মতপার্থক্য

চোখে পড়ে, বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি পরবর্তীকালে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। তাদের মধ্যেও নানা ধরনের অনভিপ্রেত সারস্বত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে গেছে। বেদান্ত সম্প্রদায়ের ভিতর যে 'বাদ' আছে সেখানেও এই ধরনের অনভিপ্রেত বৈরিতা চোখে পড়ে।

তবে অনেক পণ্ডিত মন্তব্য করেন, এই জাতীয় তর্কবিতর্ক আছে বলেই ভারতীয় দর্শন এতখানি পরিব্যাপ্ত এবং গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। যদি ভারতীয় দার্শনিকরা শুধুমাত্র একটি বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন এবং অন্য সব বিষয়গুলিকে পরিহার করতেন, তাহলে ভারত-দর্শন কি এত রহস্যময় হয়ে উঠতে পারত?

ভারতের দর্শন সম্প্রদায়

ভারতের দর্শন সম্প্রদায় প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে বেদের কথা বলা উচিত। বেদ কথাটির আভিধানিক অর্থ হল জ্ঞান। জ্ঞানকে আমরা কোনো কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পারি না। এমনকি জ্ঞানকে কোনো দেশের মধ্যেও আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। তাই ভারতীয়রা বেদকে চিরন্তন শাশ্বত জ্ঞানের প্রতিভূস্বরূপ বিচার করেন। এই জ্ঞান কোনো মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নয়। ঋষিদের কাছে এই জ্ঞান একদা প্রতিভাত হয়েছিল। ইচ্ছে করলে আমরাও এই জ্ঞানের অধিকারী হতে পারি। তবে তার জন্য আত্মজ্ঞান প্রয়োজন। আত্মজ্ঞান ছাড়া এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে না।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে বেদকে ভিত্তি করেই ভারতীয় দার্শনিকরা নানা ধরনের মতপার্থক্যের জন্ম দিয়েছেন। যাঁরা বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেন তাঁদের বলে আস্তিক। আর যাঁরা বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাস করেন না তাঁদের বলে নাস্তিক। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা, উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত এই ষড়দর্শনকে আস্তিক দর্শন বলা হয়। অনেকে আবার বৃহৎ অর্থে আস্তিক শব্দটির সঙ্গে 'ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী' এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস বোঝাতে আস্তিক কথাটি ব্যবহার করলে ষড়দর্শনকে আস্তিক বলা সম্ভব হবে না। কারণ সাংখ্য এবং পূর্ব-মীমাংসা কিন্তু ঈশ্বর মানেন না।

চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনকে নাস্তিক বলা হয়। পরলোকে বিশ্বাস বোঝাতে যদি আমরা আস্তিক শব্দটি ব্যবহার করি তাহলে ষড়দর্শন বৌদ্ধ এবং জৈন সবাইকেই আস্তিক বলতে হয়। দর্শনে আস্তিক শব্দটির অর্থ বেদ প্রামাণ্যে বিশ্বাস এবং নাস্তিক শব্দটির অর্থ বেদ প্রামাণ্যে অবিশ্বাস। এই অর্থ অনুসারে ষড়দর্শন আস্তিক আর চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন নাস্তিক। বৈয়াকরণ সম্প্রদায় এবং আয়ুর্বেদ সম্প্রদায়কেও আস্তিক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এছাড়া আরও কয়েকটি আস্তিক দর্শন আছে যেগুলি খুব বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি।

ষড়দর্শনকে আবার বেদ প্রামাণ্যতা অনুসারে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। দৈনন্দিন আনুষ্ঠানিকতা, পূজা-পার্বণ, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি হল কর্মকাণ্ডের বিষয়। দার্শনিক তত্ত্বসম্পর্কে আলোচনাকে জ্ঞানকাণ্ডের উপকাব্য হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। বেদের কর্মকাণ্ডকে ভিত্তি করেই যে দর্শনের সৃষ্টি তাকে পূর্ব-মীমাংসা বলে। আবার বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে ভিত্তি করে যে দর্শনের জয়যাত্রা তাকে উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত বলা হয়। এ দুই সম্প্রদায় কমবেশি বেদের ওপর নির্ভর করেন। সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন বেদ প্রামাণ্য নির্ভর, তবে পূর্ব-মীমাংসা এবং বেদান্ত বেশিমাত্রায় বেদের ওপর নির্ভরশীল।

সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনে নিরপেক্ষ যুক্তি দিয়ে বৈদিক সিদ্ধান্তগুলিকে সমর্থনের চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্ব-মীমাংসা এবং বেদান্তে যে যুক্তি আছে, সেগুলি বেদকে সমর্থন করার জন্যই প্রযুক্ত। বেদ নিরপেক্ষ যুক্তি এই দুটি দার্শনিক চিন্তায় স্থান পায় না। তাই আমরা বলতে পারি যে পূর্ব-মীমাংসা ও বেদান্ত সম্পূর্ণভাবে বেদনির্ভর। আর সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক বেদ নির্ভর হলেও স্বতন্ত্রসিদ্ধ হিসাবে খ্যাত।

ভারতীয় দর্শনে যুক্তির স্থান

ভারতীয় দর্শনে বেদের অনন্যসাধারণ প্রভাবের কথা আলোচিত হয়েছে। বৌদ্ধ এবং জৈনরা বেদদর্শনে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তাঁরা তাঁদের ধর্মপ্রবক্তাদের ওপর অপরিসীম আস্থা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। বৌদ্ধ

দর্শনে বুদ্ধদেবের বাণী এবং উপদেশকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। জৈন দর্শনে তীর্থঙ্করের নির্দেশকে অবশ্য-পালনীয় বলে ঘোষণা করা হয়। এই বিষয়গুলি আলোচনা করে অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় দর্শন অযৌক্তিক বিশ্বাস নির্ভর অর্থাৎ dogmatic। এখন আমরা দেখব সত্যি সত্যি ভারত-দর্শন কি বিশ্বাসনির্ভর নাকি এর মধ্যে যুক্তির প্রাধান্য আছে?

ভারতীয় দর্শনে যুক্তির প্রাধান্য নেই একথা সত্য নয়। একসময়ে ঋষিরা নানা ধরনের যুক্তি দিয়ে তাঁদের মত প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে পূর্ব-মীমাংসা এবং বেদান্ত দর্শনে এই জাতীয় যুক্তিতর্ককে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনে বেদ-নিরপেক্ষ যুক্তিকে স্বাগত জানানো হয়েছে। বৈদিক সিদ্ধান্তকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেছে পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা। তাই আমরা অবশ্যই বলব যে আমাদের ভারতীয় দর্শনে যুক্তি বা তর্কের একটি বিশেষ স্থান আছে। এই প্রসঙ্গে আমরা বিখ্যাত দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী বার্ট্রান্ড রাসেলের 'Mysticism and Logic' বইটির কথা উল্লেখ করব। ওই বইতে রাসেল মন্তব্য করেছেন যে, যখন কোনো যুক্তিকে আমরা উপলব্ধির দ্বারা অনুভব করি তখন তা সার্থক হয়। ভারতীয় দর্শনে এই জাতীয় উপলব্ধিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তবে জড়বাদী চার্বাক-দর্শনকেও আমরা আলোচনার বিষয়বস্তু করেছি। চার্বাক কিন্তু প্রত্যক্ষের ওপরেই নির্ভর করতেন। তাঁর সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন সত্তার যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চার্বাক দর্শন বিষয়ে আলোচনা করলেও আমাদের মনে রাখতে হবে তিনিও যুক্তিবাদকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

ভারতীয় দর্শনে বিচার নিষ্ঠায়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ভারতীয় দর্শন যেহেতু বিচার-কে যথেষ্ট সমীহ করে তাই পূর্ব-পক্ষ খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনে তিন ধরনের তত্ত্বালোচনা আছে—বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডা। বাদ-রীতিতে আমরা সিদ্ধান্ত বিবৃতি দিয়ে থাকি। এর পাশাপাশি স্বমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা থাকে। বিতণ্ডা ক্ষেত্রে বিরূদ্ধ মতকে খণ্ডন করা হয়। এক্ষেত্রে স্বমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। পাশ্চাত্য দর্শনে সক্রেটিস এই জাতীয় আলোচনার জনক। ভারতীয় দর্শনে তিনটি রীতিকেই যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে আলোচিত করা হয়েছে। তবে জল্প এবং বিতণ্ডাতে তর্কের প্রাধান্য বেশি। বৈতণ্ডিক শ্রীহর্ষ এবং নাগার্জুন তর্কের এক অদ্ভুত প্রতীতি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাই আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে ভারতীয় দর্শন বিচারবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বেদ বাক্য সম্পর্কে মনন নিদিধ্যাসনের নির্দেশ ভারতীয় দর্শন দিয়েছে। ভারতীয় দর্শন বলেছে শুধু বাক্য শুনলে হবে না, শোনার পর প্রতিটি বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। তাকে পরিপূর্ণভাবে মননের মধ্যে স্থান দিতে হবে। নাহলে আমরা কখনোই বাক্যের আসল অর্থ বুঝতে পারব না। বাক্য শোনার পরবর্তী পর্যায়ে একাগ্র সাধনা করে বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে হবে। তাকেই নিদিধ্যাসন বলা হয়। ভারতীয় দর্শন বিচারনিষ্ঠ নিয়ম-নীতির ওপর নির্ভর করে, একথা আমাদের অবশ্যই মানতে হবে।

এই প্রসঙ্গে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য যে কথা বলেছেন সেটিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি 'তর্কা প্রতিষ্ঠানাৎ .....' নামক সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আমরা শুধুমাত্র তর্কের দ্বারা কোনো সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি না। মনে করা যাক একজন ব্যক্তি নানাধরনের তার্কিক যুক্তি সাজিয়ে তার বক্তব্যকে সর্বজন সমক্ষে তুলে ধরলেন, তিনি ভাবলেন যে তাঁর বক্তব্যই অভ্রান্ত ও চরম সত্য। পরমুহূর্তেই একজন ব্যক্তি অধিকতর তর্কবোধের সাহায্যে তাঁর যুক্তিকে নস্যাৎ এবং খণ্ডন করলেন। এইভাবে তর্কের কখনো শেষ নিরূপিত হয় না। তাই শঙ্করাচার্যের অভিমত হল যদি অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির ওপর নির্ভর করে কোনো সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তাকে নস্যাৎ করা যায় না। সেইজন্য বিজ্ঞানীরা ব্যবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। বিজ্ঞান কখনো কোনো একটি তত্ত্বকে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখে না। বিজ্ঞান একটির পর একটি দুরূহ পরীক্ষার মাধ্যমে সেই তত্ত্বটির সত্যতা প্রকাশ করে।

এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতের বিখ্যাত দার্শনিকদের ওপর আলোকপাত করব। বৈদিক ঋষি, বুদ্ধদেব বা জৈন তীর্থংকরেরা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে বেশ কিছু তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। বেদকে আমরা বৈদিক

যুগের অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল বলতে পারি। বুদ্ধদেব যে উপলব্ধিকে আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন তার অন্তরালে আছে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তীর্থংকররাও তাঁদের সত্য উপলব্ধির কথা জৈন দর্শনের ভিত্তি স্বরূপ স্থাপন করেছেন। এই জন্য ভারতীয় দর্শন মনে করে যে, তর্কের থেকে উপলব্ধির মূল্য অনেক বেশি। তাই ভারতীয় দার্শনিকরা তপস্বীদের জীবনব্যাপী সাধনায় লব্ধ উপলব্ধিতে আস্থা রাখেন। অবশ্য যে কোনো মানুষই নিরবচ্ছিন্ন তপস্যার মাধ্যমে জ্ঞানের এই জগতে পদার্পণ করতে পারেন।

এখানে আর-একটি কথা মনে রাখতে হবে, তপস্বীরা যেসব কথা বলেছেন সেসব কথা বিচার করার ধৃষ্টতা আমরা দেখাই না। ভারতীয় দর্শন কিন্তু এবিষয়েও আমাদের সজাগ করেছে। দর্শন বলেছে বিনা তর্কে কোনো কিছুকে গ্রহণ করা উচিত নয়। যদি আমরা তপস্বীদের বাক্যকে বিনা বাধায় গ্রহণ করি, তাহলে জ্ঞানের প্রসারতা হবে কী করে? এই বিষয়গুলি আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, ভারতীয় দর্শন কখনো অন্ধবিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ভারতীয় দর্শনে বিচারহীনতার কোনো স্থান নেই। অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ভারতীয় দর্শনচিন্তার পরিব্যাপ্তিকে খর্ব করার জন্য অযৌক্তিকতার অভিযোগ আনেন, এই অভিযোগ অজ্ঞতাপ্রসূত এবং ষড়যন্ত্রমূলক বলেই মনে হয়।

আমরা আগেই বলেছি যে বেদ হল দেশ এবং কালোত্তীর্ণ জ্ঞানের ভাণ্ডার। এই জ্ঞান কিন্তু কোনো একক মানুষ দ্বারা সৃষ্ট নয়। তাই বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। চিরন্তন জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে যদি কোনো দর্শনশাস্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হয় তাহলে তার মধ্যে দোষত্রুটি থাকবে কেন? কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকরা এক্ষেত্রেও নানা ধরনের প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, বেদকে যদি আমরা নির্ভরযোগ্য আকর জ্ঞানভাণ্ডার হিসাবে শ্রদ্ধা করি, তাহলে বেদভিত্তিক ষড়দর্শন কেন একের সঙ্গে অন্যের বেদ সদৃশ্যতা নিরূপণ করে? কেন সাংখ্য যোগের সিদ্ধান্তের সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্ত সদা সর্বদা মেলে না? পূর্ব মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসার মধ্যে বক্তব্যের যে বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে তার কারণ কী? বৈদিক ঋষিদের ব্যক্তিগত উপলব্ধির সঙ্গে মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ অথবা জৈন তীর্থংকরদের উপলব্ধির মধ্যে এত পার্থক্য কেন?

এই অত্যন্ত বিতর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ব্যক্তিগত অনুধ্যানের কথাই বলতে হবে। এই পৃথিবীতে সব মানুষ একই রকম উপলব্ধি বা অনুভব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন না। জিনগত পার্থক্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের চিন্তাধারা ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। এই বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা জলের মতো একটি তরল পদার্থের কথা বলব। জলের নিজস্ব কোনো আকার নেই। যে পাত্রে জলকে রাখা হয় সেই পাত্রের আকার জল ধারণ করে। সত্যের অবস্থাও তাই। নিরাকার মতদ্রষ্টা ভেদে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। এদিক দিয়ে বিচার করলেও আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে ভারতীয় দর্শন বিচারবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এই দর্শনকে কখনোই আমরা কিছু মানুষের তাৎক্ষণিক আবেগের ফলশ্রুতি বলব না।

ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের ঐক্য অন্বেষণা

যে কোনো দেশের সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি অথবা বৌদ্ধিক চর্চা সেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থান এবং সামাজিক রীতিনীতির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভারতবর্ষের দার্শনিক অভিযাত্রা সম্পর্কে আলোকপাত করার সময়ে এই বিষয়টির দিকে সবিশেষ নজর দেওয়া উচিত। ভারত আজও কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনন্য এবং অতুলনীয়। ভারতের এই সৌন্দর্য অনেক বিদেশি শাসককে বারবার প্রলুব্ধ করেছে। ইতিহাসের পাতায় চোখ মেললে আমরা এই ঘটনার স্বপক্ষে বেশ কিছু সাক্ষ্য এবং প্রমাণ পাব। ভারতবর্ষের মানুষ সৌন্দর্য এবং প্রাচুর্যের মধ্যে দিনযাপন করার বিরলতম সুযোগ পেয়েছিলেন, তাই তাঁরা নানা ধরনের নান্দনিক বৌদ্ধিক চর্চায় মেতে ওঠেন। আর এইভাবেই ভারত-সংস্কৃতি একদা সারা বিশ্বের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল।

যে কোনো দেশের দার্শনিক চিন্তন এবং সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। ভারত সংস্কৃতির সবথেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধান

করা। উপনিষদের ঋষি এই বিষয়টি তাঁর ভাষ্যের মাধ্যমে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন—'যো একঃ অবর্ণং বর্ণানেকান নিহিতার্থো দধাতি, সো নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু'। অর্থাৎ এক এবং অবর্ণ যিনি বর্ণ বৈচিত্রের নিহিতার্থ বিধান করেন, তিনি আমাদের বুদ্ধিকে শুভপথে চালিত করান।

পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং পরমত শ্রবণের ক্ষমতা ভারতীয় সংস্কৃতিকে মহিমান্বিত করেছে। ভারতীয় দার্শনিক-সম্প্রদায় এই জাতীয় মনোভাবকে বারবার ব্যক্ত করেছেন। ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করে চরম সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। অনেক সময়ে তাঁদের মধ্যে তর্কবিতর্কের অবতারণা হয়েছে, তবু তাঁরা কখনো একে অন্যকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করেননি অথবা জোর করে অন্যের মতটি উৎপাটিত করার চেষ্টা করেননি। এতেই প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে কী ধরনের পারস্পরিক আনুগত্য এবং শ্রদ্ধাশীলতা বজায় ছিল!

ভারতীয় দার্শনিকরা মনে করে থাকেন যে, জীবনের প্রয়োজনেই দর্শন-চর্চা করা উচিত। তাঁরা কেউই চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি থেকে দার্শনিক চিন্তাতে নিজেদের নিয়োগ করেননি। অবশ্য কেউ কেউ কঠিন কঠোর সাধনায় মগ্ন ছিলেন। জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে দার্শনিক উপলব্ধির জগতে পৌঁছে যান। বেশির ভাগ দার্শনিক কিন্তু সমাজজীবনে থেকেও দর্শনচিন্তা করে গেছেন। তাই শুধুমাত্র কৌতূহল-নিবৃত্তি ভারতীয় দর্শন চর্চার উদ্দেশ্য নয়, কীভাবে আমরা দার্শনিক অভিজ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দরতর এবং মহত্তর করে তুলব, ভারতীয় দর্শন সেই পন্থা নির্ধারণের চেষ্টা করেছে। তাই কোন দার্শনিক গ্রন্থ কোন পুরুষার্থ সিদ্ধ করে তা গ্রন্থের প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের দেশে মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ বলা হয়। মোক্ষলাভের জন্যই ভারতীয় দার্শনিকেরা দর্শন-চর্চা করেছেন। আমরা আগেই বলেছি পাশ্চাত্য দেশের ফিলসফি বলতে প্রজ্ঞাপ্রীতিকে বোঝানো হয়ে থাকে। সেখানে ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষাই হল দর্শন-চর্চার মূল কারণ ও উদ্দেশ্য। আর আমাদের দেশে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাকেই দর্শন-চর্চার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশ্য জ্ঞানেই যে মুক্তি একথা চার্বাক ছাড়া অন্য দার্শনিকরা বারবার ঘোষণা করেছেন। তাই আমরা বলতে পারি যে শেষপর্যন্ত জ্ঞানলাভই হল ভারতীয় দার্শনিকদের জীবনব্রত। এই জ্ঞানের আলোতে জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, একথাও বারবার ভারতীয় দার্শনিকরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

অবশ্য ভারতীয় দর্শনের ঔপপত্তিক দিকটিকে আমরা কোনোভাবেই অবহেলা করতে পারব না। অনেকে বলে থাকেন যে ভারতীয় দর্শনের এই জাতীয় মনোভাব থেকেই নীতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে একীভূত করেছে। এমনকি পাশ্চাত্য দেশের অনেক দার্শনিক ও পণ্ডিত ভারতীয় দর্শনকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। যদি আমরা প্রণিধান সহকারে ভারতীয় দর্শনের বিষয়গুলিকে উপস্থাপিত এবং উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, তাহলে বুঝতে পারব পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের এই আক্রমণের অন্তরালে কোনো তার্কিক মনোভাব লুকিয়ে নেই। কারণ ভারতীয় দর্শনের প্রয়োগের দিকটি খুব উল্লেখযোগ্য এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ঔপপত্তিক দিক বা Theoretical aspectকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। ভারতীয় দর্শনে তত্ত্ববিজ্ঞান, জ্ঞানবিচার, তর্কবিজ্ঞান, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতির পৃথক পৃথক আলোচনা হয়ে থাকে। এই বিষয়গুলিকে নিয়েই গড়ে উঠেছে ঔপপত্তিক শাখা। তাই আমরা অনায়াসেই বলতে পারি যে, ভারতীয় দর্শন-বিশারদরা তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এর পাশাপাশি তাঁরা আর-একটি বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছিলেন, তা হল, কীভাবে এই ঔপপত্তিক জ্ঞানকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে একীভূত করতে পারি। বাস্তববাদী ছিলেন বলেই বোধহয় তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি দিকে কোনো একটি বিষয় বিশ্লেষিত ও আলোচিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার গ্রহণযোগ্যতা সর্বসাধারণের কাছে গৃহীত হয় না। সেই বিষয়টি মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিগত অনুধ্যানের বিষয়স্বরূপ বিরাজ করে। আর সমাজ থেকে বিছিন্ন থাকার ফলে সেই বিষয়টির জনপ্রিয়তা ক্রমশ কমতে থাকে।

ভারতীয় দর্শনের আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে ভারতীয় দর্শন জীবননিষ্ঠ। জীবনের সঙ্গে যে-সমস্ত বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই সেই বিষয় নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকরা আলোচনা করতে চান না। আমরা বিশ্বাস করি এই জগতে সুখের থেকে দুঃখের মাত্রা এবং পরিব্যাপ্তি অনেক বেশি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সময় কাটাতে হয়, মাঝে মধ্যে সুখের মুহূর্ত আসে। তাকে আমরা বর্ষার আকাশের বিদ্যুৎরেখার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। একটি শিশু জন্ম-মুহূর্ত থেকে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। তার এই কান্নার কারণ কী? দুঃখের অভিজ্ঞতাই হয়তো তাকে এভাবে কাঁদিয়ে তোলে। দীর্ঘদিন ধরে সেই শিশুটি অনেক সুখে মাতৃজঠরে অবস্থান করছিল। যে মুহূর্তে সে পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের ভয়, উৎকণ্ঠা এবং উত্তেজনা তাকে গ্রাস করে, তাই বোধহয় সে তীব্রভাবে তার মনের ভয় প্রকাশ করে!

ভারতীয় দার্শনিকরা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা করেছেন। আমরা জানি জন্ম হলে মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু মৃত্যুভয় নেই এমন কেউ এই পৃথিবীতে আছে কী? ধর্মরাজ বক যখন যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন এই জগতে সবথেকে আশ্চর্য কী? যুধিষ্ঠির জবাব দিয়েছিলেন—'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম, শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্'। অর্থাৎ রোজই জীব মারা যায়, অথচ যারা থাকে তারা ভাবে তাদের মৃত্যু নেই, এর থেকে আশ্চর্য আর কী আছে?

এই প্রসঙ্গে আমরা বুদ্ধদেবের জীবনের একটি বহু প্রচলিত কাহিনির কথা বলব। একবার পুত্রশোকে বিহ্বলা এক জননী বুদ্ধদেবের চরণতলে বসে কেঁদে বলেছিলেন, 'আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিন'। মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব বুঝতে পারেন কোনোভাবেই ওই মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার সম্ভব নয়। বুদ্ধদেব ওই শোকাতুরা মাকে অনেক করে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু স্নেহান্ধ জননী সেকথা বিশ্বাস করতে রাজি হলেন না। শেষপর্যন্ত বুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'মা, আপনি এমন এক ঘর থেকে কিছু সরষে নিয়ে আসুন যেখানে কখনো শোকের ছায়া পড়েনি। তাহলেই আমি আপনার পুত্রকে বাঁচিয়ে দেব।' মা ভাবলেন এ অতি সহজ কাজ! তিনি একটির পর একটি ঘরে গেলেন, কিন্তু শুনলেন যে প্রত্যেক ঘরেই কোনো-না কোনো সময় শোকাভূত মুহূর্ত এসেছে। চোখের জল মুছে আবার ছুটলেন সর্ষের সন্ধানে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূরণ হল না। তিনি বুঝতে পারলেন যে মহামতি বুদ্ধ তাঁকে চরম শিক্ষা দিয়েছেন!

গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন—'মা, শোক তো থাকবেই, তাকে নিয়ে এত ভেঙে পড়লে চলবে কেন? আসুন আমরা শোকজয়ের সাধনা শুরু করি।'

ভারতীয় দর্শন এই দুঃখজয়ের সাধনাতেই নিমগ্ন থাকতে চেয়েছে। জীবনের দুঃখ, দুর্গতি, রোগ, শোক, জরা দেখে ভারতীয় দার্শনিকরা বার বার ব্যথিত হয়েছেন। তাঁরা ভেবেছেন জগতে এত দুঃখ কেন? দুঃখের নিদান আবিষ্কার করতেই হবে। তাই ভারতীয় দার্শনিকরা দুঃখের অন্ধকার বিবর থেকে মানুষকে সুখের আলোকিত পথের উপত্যকায় পৌঁছে দেবার সন্ধান করেছেন। এইভাবেই তাঁরা মানুষের কাছে নতুন আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

অবশ্য ভারতীয় দার্শনিকদের এই প্রচেষ্টাকে প্রতীচ্য দেশের অনেক সমালোচক ভালো চোখে দেখেননি। তাঁরা বলেছেন ভারতীয় দার্শনিকরা নৈরাশ্যবাদী। তাঁরা বড়ো বেশি দুঃখের কথা বলেন।

বুদ্ধদেবকে আমরা ভারতীয় দার্শনিকদের প্রতিনিধি স্বরূপ বিচার করতে পারি। বুদ্ধদেব বলেছেন—'সর্বং দুঃখং'। কিন্তু এটি তাঁর শেষ কথা নয়। তিনি বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুমতলে সাধনায় সিদ্ধি স্বরূপ চারটি পবিত্র সত্যের জ্ঞানলাভ করেছিলেন। এই চারটি পবিত্র সত্য হচ্ছে—(১) দুঃখ আছে (২) দুঃখের কারণ আছে, (৩) দুঃখের নিবৃত্তি আছে এবং (৪) দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় আছে। বুদ্ধদেব আবার বলেছেন—'দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে।' এটিই তাঁর শেষ কথা। ভারতীয় দার্শনিকরা বুদ্ধের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এই কথাই বারবার বলতে চেয়েছেন।

চার্বাক ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকরা দুঃখের সন্ধানে সারা জীবন কাটিয়েছেন। ভারতীয় দর্শনের মতে দুঃখ-নিবৃত্তি হল মোক্ষ, তাই দুঃখের নিবৃত্তি হল ভারতীয় দর্শনচর্চার প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য। যদিও ভারতীয় দার্শনিকরা জীবনের নৈরাশ্যের কথা বারবার তুলে ধরেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা চরম আশা-ভরসার শেষ বাণী শুনিয়েছেন। দুঃখের নিবৃত্তি হবে এমন কথা জোর দিয়ে বলেছেন। তাই আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে, নৈরাশ্যবাদ ভারতীয় দর্শনের প্রাথমিক প্রস্তাবমাত্র, এই নৈরাশ্যের অন্ধকার থেকে কীভাবে আমরা মুক্তি পাব, ভারতীয় দার্শনিকরা তাঁদের জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা সে-কথা বারবার বলতে চেয়েছেন।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে ভারতীয় দর্শনে নৈরাশ্যবাদকে কে প্রথম প্রস্তাবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়স্বরূপ তুলে ধরতে চেয়েছেন? জীবন কি শুধু দুঃখের? আমাদের জীবনে কি এমন কোনো ঘটনা ঘটে না যা আমাদের আনন্দ দেয়?

যদি আমরা ঠান্ডা মাথায় এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করার চেষ্টা করি তাহলে বুঝতে পারব যে, আমাদের জীবনে দুঃখের ভাগটাই বেশি। তাই দুঃখের উৎস অন্বেষণ করতে হবে। কীভাবে আমরা দুঃখকে সুখে পরিণত করতে পারি, তা চিন্তা করতে হবে।

সত্যানুসন্ধান ভারতীয় দার্শনিকদের আর-একটি অবশ্য কর্তব্য! কিন্তু অনেক দার্শনিক বলে থাকেন, অপ্রিয় সত্য বলতে নেই। একথা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করতে হয়। ভারতীয় দর্শন এই সত্যের সন্ধানে মগ্ন থেকেছে, সেই সত্য শাশ্বত এবং চিরন্তন!

ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় দর্শন মনে করে মানুষ যেমন কর্ম করে তেমনই ফল পায়। শুভ কর্মের শুভ ফল এবং অশুভ কর্মের অশুভ ফল হয়। আমরা নিজেরাই আমাদের ভাগ্যবিধাতা। পুণ্য করলে পুরস্কার পাব আর পাপ করলে তিরস্কার পাব। ভারতীয় দার্শনিকদের এই হল বিশ্বাস। আর তাই বোধহয় আমরা সদা-সর্বদা সত্যপথে থাকার চেষ্টা করি। ভারতীয় দার্শনিকরা নিত্য-জীবনের তিক্ততা ভুলতে চান। আধুনিক কালে অতিরিক্ত আত্মহননের প্রবণতা চোখে পড়ছে। এর কারণ কী? পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারব যে এখন জীবনযাত্রা আগের থেকে অনেক শক্ত এবং প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে। জীবনে আসছে আরও বেশি নিরাশার অন্ধকার। তাই বোধহয় মানুষ আর পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানাতে পারছে না।

ভারতীয় সাধক প্রার্থনা করেন—অসতো মা সৎগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতঃ গময়। অর্থাৎ অসৎ থেকে আমায় সৎ-এ নিয়ে চল, অন্ধকার থেকে নাও আলোতে এবং মৃত্যু থেকে আমায় অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করে দাও। এই প্রার্থনার মধ্যে দিয়েই ভারতীয় দর্শন-চিন্তার মর্মবাণী ফুটে উঠেছে। ভারতীয় দার্শনিকরা চিরকালই অন্ধকার থেকে আলোর পথে উত্তরণের পন্থা অন্বেষণ করেছেন। তাই ভারতীয় দার্শনিকেরা আলো এবং অমৃতের সাধনা করেন, শুধু অন্ধকার ও মৃত্যুর জয়গান করেন না। তাই আমরা তাঁদের অবশ্যই আশাবাদী বলে ঘোষণা করব।

ভারতীয় দার্শনিকরা বিশ্বাস করেন যে, আমরা আধ্যাত্মিক পথেই হতাশা থেকে আশার দিকে পৌঁছোতে পারি। বিশিষ্ট মার্কিন দার্শনিক এবং বুদ্ধিজীবী উইলিয়ম জেমস মন্তব্য করেছেন, 'অধ্যাত্মবাদ বলতে এক শাশ্বত নৈতিক নিয়মের স্বীকৃতি এবং আশা পোষণকে বোঝায়। এই শাশ্বত নৈতিক নিয়মের দাবি আমাদের অন্তরের গভীরতম দাবিগুলির অন্যতম। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং দান্তের মতো সমস্ত কবি এই রকমের নিয়মের বিশ্বাসে জীবন পরিচালিত করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের এই বিশ্বাসের উৎপত্তিস্বরূপ অপ্রাকৃত উজ্জীবনী শক্তি এবং শান্তিদানের ক্ষমতাকেই চিহ্নিত করেছেন।

ভারতের অধিকাংশ দর্শন-সম্প্রদায় এক শাশ্বত নৈতিক ব্যবস্থার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। চার্বাক অবশ্য এক্ষেত্রে ভিন্ন পথের পথিক।

তবে ভারতের সব দার্শনিকই যে একই ভাবে বা একই ভঙ্গিতে এই নৈতিক নিয়মটি মেনে চলেছেন তা নয়। ঋকবেদের ঋষিরা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, মহাবিশ্ব, মহাশূন্য, নক্ষত্রলোক, দেবলোক সর্বত্র একটি

শৃঙ্খলারক্ষাকারী শক্তিকেই দেখেছেন। তাঁরা বলেছেন, এই মহাশক্তি হল 'ঋত' অর্থাৎ সত্য, চরম সত্য অনিবার্য এবং অলঙ্ঘনীয়। পৃথিবীর সর্বত্র এই চরম সত্য আছে বলেই পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট নিয়মনীতি বা শৃঙ্খলার দ্বারা আবদ্ধ। 'ঋত' শুধুমাত্র প্রকাশ্য আচরণেরই নিয়ামক নয়, আমাদের অপ্রকাশ্য অনুভাবগুলিও 'ঋত' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই 'ঋত'-কে আমরা কখনো অস্বীকার করতে পারি না। প্রসঙ্গত আমরা ভারতীয় পুরাণের যম ও যমীর কথা বলব। যম ও যমী ছিলেন ভাই বোন। তাঁরা গোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে ভেবেছিলেন যে, কেউ তাঁদের এই অন্যায়কর্ম দেখেনি। যেহেতু 'ঋত' স্থল-জল-অন্তরীক্ষ সর্বত্র বিরাজমান তাই তাঁরা পাপ কাজের জন্য শাস্তি পেয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে এই নিয়মটিকেই আমরা পূর্বমীমাংসা দর্শনের 'অপূর্ব' আকারে আত্মপ্রকাশ করেছি। 'অপূর্ব' বিষয়টিকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে স্বর্গকামী ব্যক্তি অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করবেন। তার মানে আজ যদি একজন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করেন তাহলে আগামীকালই তিনি কি যজ্ঞের সুফল পাবেন? তাঁকে তো মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে! এখন প্রশ্ন হল অতীতে অনুষ্ঠিত কাজের ফল কি সত্যি সত্যি ভবিষ্যতে পাওয়া যেতে পারে? পূর্বমীমাংসা মতের অনুগামী দার্শনিকরা বলেছেন সেখানেই 'অপূর্ব'র অবস্থান। কোনো যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলেই সেই যজ্ঞের দ্বারা অপূর্ব সৃষ্টি হয়। অপূর্ব পরবর্তীকালে ফল প্রদান করে। তাই অপূর্বকে আমরা অব্যক্ত এবং অনিবার্য বলতে পারি।

ন্যায় এবং বৈশেষিক দার্শনিকরা 'অদৃষ্ট' নামে আর-একটি বিষয়ের কথা বলেছেন। যে কোনো কাজ করলেই তার একটি প্রভাব থাকে। অনেক সময় সেই প্রভাব আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই না, তা বাতাসের মতো অদৃশ্য আকারে থাকে। এর নাম অদৃষ্ট। অর্থাৎ যাকে আমরা দেখতে পাই না। এই প্রভাব পরবর্তীকালে আমাদের জীবনের ওপর পড়ে এবং আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে।

ভারতীয় দর্শন-বিশারদরা 'কর্মবাদ'কেও যথেষ্ট সম্মান দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন—কৃতকর্মের ফল নষ্ট হয় না। আবার অকৃতকর্মের ফল লাভও হয় না। কার্যকারণ নীতির উপর এই কর্মবাদ প্রতিষ্ঠিত। কর্মবাদ অনুসারে আমাদের জীবনের সবকিছুই হল কর্মের ফলাফল। তাই আমরা শান্ত মনে দুঃখকে বরণ করব। আবার অতিরিক্ত আনন্দের সময়ে বেশি উল্লাসও প্রকাশ করব না। কর্মবাদের বিপক্ষে অনেক সমালোচনা শুনতে পাওয়া গেছে। তবে কর্মবাদের ভিত্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এর বৈজ্ঞানিক কারণগুলিকে আটকাতে পারব না। কার্যকারণ নীতিকে আমরা বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ বলতে পারি।

জৈন, বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও আস্তিক ষড়দর্শন সম্প্রদায় কর্মবাদকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে তাঁদের চোখে কর্মবাদের বিস্তৃতি এবং প্রতীতি ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করেছে।

কর্মবাদ দ্বারাই আমরা ব্যক্তিজীবনের সার্থকথার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারি। একই পরিবারে জাত দুজন ব্যক্তি কেন জীবনে দু-রকম ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন? তাঁরা কেন সাফল্য ও সম্ভোগের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা ধারণ করেন? পিতামাতার একজন সন্তান কৃতী ও প্রতিষ্ঠিত এবং অন্য সন্তান ব্যর্থ জীবনযাপন কেন করেন? সমাজে কেউ ধনী, কেউ নির্ধন, কেউ পণ্ডিত, কেউ মূর্খ—এই ভিন্নতার কারণ কী? ভারতীয় দর্শন এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের চেষ্টা করেছেন। অনেকে বলেছেন এই জন্মের বা পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলেই এই পার্থক্য দেখা যায়। আমরা পূর্বজন্মে যে কাজ করেছি এজন্মেও তার ফল লাভ হবে। অবশ্য এজন্য জন্মান্তরবাদকে আগে স্বীকার করা দরকার। কিন্তু পরিদৃশ্যমান পৃথিবীতে আমরা যখন দেখি যে একটি ধার্মিক ব্যক্তি নানাভাবে নিপীড়িত হচ্ছেন, তাঁর জীবন কাটছে দরিদ্রতার মধ্যে আর একজন অধার্মিক ব্যক্তি সুখে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে তখন এই তত্ত্ব সম্পর্কে মনে নানা সংশয়ের জন্ম হয়। আবার অনেকে বলে থাকেন অধার্মিক ব্যক্তি যখন সুখে থাকে তখন বুঝতে হবে যে সে গত জন্মের সুখের ফল এজন্মে লাভ করেছে। ধার্মিকের লাঞ্ছনা তার পূর্বজন্মকৃত দুষ্কর্মের ফল, পুনর্জন্মবাদ অবশ্য এইভাবে আমাদের কিছুটা ভাগ্য অন্বেষ্য করে তোলে।

শুধুমাত্র ব্যক্তি মানুষের জীবন ও ভাগ্যই নিয়ন্ত্রিত করে এমন নয়। জড়জগতের শৃঙ্খলা এবং বিন্যাসও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ পৃথিবী কর্মের নিয়ম মানতে বাধ্য। ধর্মের জয় এবং অধর্মের ক্ষয় হল বিশ্ববিধাতার নিয়ম।

কর্ম বলতে কী বোঝায়? কর্ম শব্দটিকে আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতে পারি। সেই রীতি অনুসারে কর্মকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে—অনারব্ধ এবং আরব্ধ বা প্রারব্ধ কর্ম।

যে কর্ম এখনো তার ফল দিতে শুরু করেনি তাকে অনারব্ধ কর্ম বলে। আবার যে কর্ম ফল দিতে শুরু করেছে তাকে আরব্ধ বা প্রারব্ধ কর্ম বলা হয়ে থাকে। অনারব্ধ কর্মকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে—প্রাক্তন বা সঞ্চিত এবং ম্রিয়মান বা সঞ্চিয়মান।

ন্যায় এবং বৈশেষিক দার্শনিকরা মনে করে থাকেন যে ঈশ্বর দ্বারাই কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ঈশ্বর কর্মের নিয়ম অনুসারে জগৎ সৃষ্টি করেন। অদৃষ্ট জড় এবং অচেতন। তাই চেতন কোনো কিছুর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অদৃষ্ট কোনো কাজ করতে পারে না। ঈশ্বর অদৃশ্যে থেকে অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি কর্ম অনুসারে জীবের সুখ-দুঃখ বিধান করেন। আবার কর্মের নিয়মনীতি ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে সাংখ্য, মীমাংসা, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে অন্য কথা বলা হয়েছে। এই মতাবলম্বীরা মনে করেন যে কর্মের নিয়ম ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন নয়, কর্ম একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং পৃথক সত্তা। এই সমস্ত দর্শনে জগতের উৎপত্তি ও বিন্যাস ঈশ্বর স্বীকার না করেই ব্যাখ্যা করা হয়। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা এই সমস্ত দার্শনিক চিন্তনকে অধিকতর বুদ্ধিবাদী এবং তাত্ত্বিক বলতে পারি।

নিষ্কাম কর্ম শুধু ফলভোগশূন্যই নয়, তা মুক্তির নিধানস্বরূপ বিরাজ করে। সকাম কর্ম মানুষকে নানাভাবে বেঁধে রাখে, আর নিষ্কাম কর্ম মানুষকে সমস্ত বন্ধন থেকে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি দেয়। মুক্ত আত্মা মানুষের নানা মঙ্গলকর্মে ব্যাপ্ত থাকতে পারেন, কিন্তু এইসব কর্ম কখনোই মানুষকে আবদ্ধ বা বদ্ধ করবে না। মুক্ত পুরুষ যখন এই অবস্থায় উপনীত হন তখন তাঁকে আমরা জীবন্মুক্তি অবস্থা বলতে পারি।

প্রসঙ্গত আমরা প্রখ্যাত দার্শনিক হ্যারল্ড হফডিঙ্গ-এর কথা বলব। হ্যারল্ড হফডিঙ্গ ধর্ম বলতে 'The belief in the conservation of values'-এর কথা বলেছেন। অর্থাৎ তিনি মূল্যবোধ সংরক্ষণে বিশ্বাস করেন। যার যেমন কর্ম, সেই অনুসারে সে মূল্য পেয়ে থাকে। এই বিষয়টিতে বৌদ্ধবাদ এবং জৈনবাদ সহমত পোষণ করেছে। বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম মতে প্রথম অবস্থায় ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়নি। অবশ্য কোনো কোনো জৈনবাদী বা বৌদ্ধবাদী দার্শনিক পক্ষান্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

কর্মবাদ এবং পুরুষকারের মধ্যে সামঞ্জস্য কি সম্ভব? ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র এ প্রসঙ্গে আলোচনার এ বিষয়টি বারবার উত্থাপিত হয়েছে। আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে, কর্মবাদ মানুষকে দৈবনির্ভর করে তোলে। আমাদের এজন্মের সবকিছু যদি গতজন্মের পাপপুণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে কেন আমরা ইহজীবনে এত পরিশ্রম করব? কর্মবাদের প্রতি অধিক আনুগত্য মানুষের স্বাধীন কর্মোদ্যোগের ইচ্ছাকে নষ্ট করে দেয়। তাই ভারতীয় বা অদৃষ্টবাদী কর্মবিমুখ হয়ে উঠছেন। কিন্তু ভালোভাবে বিচার করলে বুঝতে পারা যাবে এই অভিযোগের সবটা সঠিক নয়। এর অনেকটাই অজ্ঞতাপ্রসূত, আমাদের অদৃষ্টও তো আমাদের কর্ম দ্বারাই সৃষ্ট। যদি আমরা ভালো কাজ করি তাহলে আমাদের অদৃষ্ট বা ভাগ্য ভালো হবে। আর যদি আমরা খারাপ কাজ করি তাহলে আমাদের অদৃষ্ট বা ভাগ্য খারাপ হবে। এক্ষেত্রেও ভাগ্যের সঙ্গে কর্মকে সংযুক্ত করা হয়েছে। মানুষ নিজেই হয়ে উঠেছে নিজের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রক। তাই অদৃষ্টবাদী হলে আমরা কর্মবিমুখ কেন হব? আমরা কেন নানা ধরনের সুখ কর্মের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রেখে আমার অদৃষ্টকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করব না? দৈব আমাদের পূর্বজন্মের কর্মসঞ্জাত। আমরা নানা ধরনের সুখকর্মের দ্বারা দৈবের অশুভ প্রভাবকে খণ্ডন করতে পারি। জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা দৈবের এইসব অশুভ প্রভাবকে অবশ্যই দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব।

ভারতীয় দর্শনবিদরা মনে করেন যে, ভাগ্য হল একটি নৈতিক নাট্যমঞ্চ। ইংরেজ কবি ও নাট্যকার শেক্সপিয়ারও জগৎ-কে এমন একটি নাট্যমঞ্চ হিসাবেই তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন—The world is a stage. নাট্যমঞ্চে যেমন একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী অনেক শেখানো সংলাপ উচ্চারণ করেন, ঠিক সেইভাবে মানুষকেও তার কর্ম অনুসারে নানা চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। এই জীবনে আমরা যে বিদ্যা আহরণ করি, যে বিত্ত লাভ করি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাই, তার সবই হল আমাদের গতজন্মের কর্মফল। আবার এই জন্মের কর্মফল হিসেবেই আমরা পরজন্মের সুখ-দুঃখ সবকিছু লাভ করতে পারব। শাশ্বত কর্মের নিয়মেই পৃথিবী আবর্তিত এবং নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম কখনো চোখে পড়ে না। তাই আমরা মানুষের জীবনকে এক চলিষ্ণু নাট্যমালা বলতে পারি।

ভারতীয় দর্শন আর-একটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছে—তাহল জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা বা অজ্ঞানের জন্য বন্ধন এবং বন্ধন মুক্তি হল সত্যজ্ঞানের ফল। ভারতীয় দর্শনে বন্ধন বলতে নানা ধরনের দুঃখ-কষ্টের কথা বলা হয়েছে। মুক্তির অর্থ এই দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা। ভারতের দর্শন-সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, কামনা-বাসনার দ্বারা প্রণোদিত ও প্ররোচিত হয়ে মানুষকে জন্মগ্রহণ করতে হয়। মানুষ নানা ধরনের বৈষয়িক দিকে আকৃষ্ট হয়। অবশেষে সে বুঝতে পারে যে এইভাবে হয়তো তাৎক্ষণিক সুখ লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু চিরন্তন সুখ সে কখনো পাবে না। অর্থাৎ কামনা কখনোই কাম্যবস্তুর প্রভাবের দ্বারা প্রশমিত হয় না। আগুনে কাঠ দিলে কি আগুন নির্বাপিত হয়? আসলে ভোগ্যবস্তু উপভোগে দুঃখ বাড়ে, আনন্দ মেলে না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।'

ভারতীয় দর্শনও এই ভুলের কথা অর্থাৎ ভ্রান্তির কথা বারবার ঘোষণা করেছেন। জৈন, বৌদ্ধ, ন্যায়, সাংখ্য মতে এই জাতীয় ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মুক্তির পথ অন্বেষণ করতে হবে। আবার অনেক সম্প্রদায় মনে করে থাকেন যে, মৃত্যুর পরই আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি। মুক্ত অবস্থা যে বিগত দুঃখ অবস্থা এ বিষয়ে ভারতের সমস্ত দার্শনিক-সম্প্রদায় সহমত পোষণ করেন। কিন্তু এই অবস্থার কী করে অবসাদ হতে পারে এই বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। জৈন এবং বেদান্ত দর্শনে মুক্ত অবস্থাকে পরিপূর্ণ আনন্দের অবস্থাস্বরূপ বিবেচনা করা হয়েছে। সাংখ্য, ন্যায় এবং বৌদ্ধ দর্শনে মুক্তিকেই বলা হয়েছে দুঃখনাশের কারণ।

ভারতীয় দর্শন কি আমাদের কর্মবিমুখ করে তোলে? করে তোলে ঈশ্বরাভিমুখী? আমরা কি জগৎ এবং জীবনকে উপেক্ষা করার শিক্ষা পাই? ভারতীয় দার্শনিকদের কাছে কী এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর কি আলাদা কোনো মূল্য নেই?

আসুন আমরা প্রণিধান সহকারে এই প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করি। ভারতীয় দর্শন কিন্তু এই জাতীয় কথা কখনো বলেনি। ভারতীয় দর্শনের মতে ইহলোক এবং পরলোক একে অন্যের পরিপূরক। যদি আমরা এর কোনো একটিকে বৃত্ত হিসাবে ধরি তাহলে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমরা একদেশদর্শিতা বা অদূরদর্শিতার ফল ভোগ করব। ইহলোককে যদি আমরা সত্য বলে মনে করি তাহলে পরলোকের ব্যাখ্যা দিতে পারব না। পরলোককে সত্য বলে মনে করলে ইহলোকের সাযুজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। কর্মবাদের সঙ্গে পরলোকের অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। পরলোক না মানলে কর্মবাদের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কর্মবাদের যৌক্তিকতা এবং প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে অবগত হতে হলে কর্মবাদকে অবশ্যই মানতে হবে।

ভারতীয় দার্শনিকরা মনে করে থাকেন সত্য-জ্ঞানই হল মুক্তির কারণ। কিন্তু সেই সত্য-জ্ঞান অর্জন করা খুব একটা সহজ নয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বিভিন্ন জাগতিক বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়। এর ফলে মনে অকারণ চাঞ্চল্য আসে। আর চঞ্চল মন কখনো চরম সত্য লাভ করতে পারে না। তাই সদা-সর্বদা ইন্দ্রিয়কে সংযমে রাখতে হবে। সত্যজ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয়-সংযমকে সব থেকে বড় উপায় হিসাবে ভারতীয় দার্শনিকরা চিহ্নিত করেছেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মদেব দম বা সংযমকে আসল গুণ হিসাবে নির্দেশিত করেছেন।

আমাদের বাক্য এবং কর্মে অনেক সময় রাগ, দ্বেষ, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এমনটি করা কখনো উচিত নয়। কারণ আমি ধর্ম এবং অধর্ম সব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছি। আমি এখন সংযমী জীবনযাপন করব। এক্ষেত্রে সংযম বলতে শুধু বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে দূরে সরিয়ে রাখার কথাই বোঝাবে না, সংযম হল সৎ অভ্যাস অর্জন করা। আমাদের দেশে নৈতিক শিক্ষার নিষেধের পাশাপাশি বিধিরও উল্লেখ আছে। আমরা কোন কোন কাজ করব না তা-ও যেমন বলা হয়েছে, আবার কী-কী কাজ কেন করব সে-কথাও বলা হয়েছে।

আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ হল পঞ্চপ্রকার যম বা নিষেধ। হিংসা করতে নেই অর্থাৎ অহিংসা, মিথ্যা বলতে নেই অর্থাৎ সত্য বলা, চুরি করতে নেই অর্থাৎ অস্তেয়, ইন্দ্রিয়ে রত থাকতে নেই অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, ধনলালসা করতে নেই অর্থাৎ অপরিগ্রহ। এই সবই হল নিষেধাত্মক নির্দেশ। শৌচ বা দেহশুদ্ধি, সন্তোষ বা স্বল্পে তুষ্টি, তপস বা ব্রতপালন, স্বাধ্যায় বা ধর্মগ্রন্থ পাঠ এবং ঈশ্বর প্রণিধান বা ঈশ্বরের স্মরণ, মনন ও অনুরক্তি হল জীবনের অবশ্য-পালনীয় কর্মবিধি।

প্রতিটি দর্শনশাস্ত্রে এই জাতীয় বিধির কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হয়েছে। যদি আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস না হই অর্থাৎ ইন্দ্রিয় আমাদের দাস হয় তাহলে বুঝতে হবে আমরা কাঙ্ক্ষিত ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারছি। এই অবস্থায় উপনীত হতে না পারলে সত্যজ্ঞান সম্ভব নয়।

যোগ-দর্শনে ইন্দ্রিয় সংযম এবং মনসংযোগের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কথা উদাহরণ সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও বেদান্ত দর্শনে এই জাতীয় যোগ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীতার কথা স্বীকৃতও হয়েছে।

ইন্দ্রিয় সংযত হলেই আমরা সত্যজ্ঞানের পথে এগোতে পারব। সত্যজ্ঞান লাভের অধিকারী শাস্ত্র বা গুরুর কাছ থেকে সত্যজ্ঞান শ্রবণ করলেই তা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে না। ভারতীয় দার্শনিকরা বার বার বলেছেন যে মুক্তির জন্য সত্যজ্ঞানকে উপলব্ধি করতে হবে। সত্যজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি দীর্ঘ মনন ভিন্ন কখনোই সম্ভব নয়। সত্যজ্ঞানের পথে নানা বাধা আসবে, সেই বাধাগুলিকে উৎপাটিত করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা যে কথা শুনে এসেছি তার বিরুদ্ধ-কথা শোনা এবং গ্রহণ করা খুব একটা সহজ নয়। তাই ভারতীয় দার্শনিকেরা সত্যজ্ঞান সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য রচনার কাজ করেছেন।

চার্বাক ছাড়া অন্য ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদায় মুক্তিকেই চরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আমরা অন্বেষু দর্শন অভীক্ষার মাধ্যমে সেই মুক্তিলাভের চেষ্টা করি। মুক্তির দ্বারা জাগতিক দুঃখনাশকে বোঝানো হয়ে থাকে। তবে মুক্ত অবস্থা যে আনন্দের অবস্থা সে-কথা বৈদান্তিক ও জৈন দার্শনিক ছাড়া অন্য কেউ স্বীকার করেন না। অনেক দর্শন-সম্প্রদায় মনে করেন যে, জীবিত অবস্থাতেও আমরা মুক্তিলাভ করতে পারি। এর নাম জীবন্মুক্তি। আবার অনেক দার্শনিক পণ্ডিত একথা মানেন না। সাংখ্য, অদ্বৈত, বেদান্ত দর্শনে জীবন্মুক্তি বা জীবিত অবস্থায় মুক্তির স্বীকৃতি, কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনে বিধেয় মুক্তি বা মৃত্যুর পর মুক্তিকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। জীবন্মুক্ত অবস্থায় মানুষ জীবকল্যাণ কর্মে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারে, নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের জন্য তাকে কখনোই বদ্ধ জীবনযাপন করতে হয় না। আচার্য দর্শনে দর্শন শাস্ত্রের জীবন্মুক্ত পুরুষের দৃষ্টান্ত হিসাবে নানা মতকে তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি আচার্য শঙ্করকেও আমরা এক জীবন্মুক্ত মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করতে পারি। বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবন থেকে এই সনাতন ধর্মকে রক্ষা করে আচার্য শঙ্কর একাধিক মঠ স্থাপন করেছেন। এটি তাঁর ধর্মপন্থার অন্যতম ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠা। তাই আমরা আচার্য শঙ্করের ধর্মদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে এই বিষয়গুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

ভারতের বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়

এর আগে আমরা আলোচনা করেছি যে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে বিভিন্ন মতকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদায় দুটি ভাগে বিভক্ত—আস্তিক এবং নাস্তিক। আস্তিক অর্থাৎ যাঁরা বেদ প্রামাণ্যে বিশ্বাস করেন। এখানেও আবার দুটি ভাগ আছে—সম্পূর্ণ বেদ নির্ভর এবং বেদ নির্ভরতা সত্ত্বেও স্বতন্ত্র সিদ্ধ। প্রথম

ভাগে আছে বেদের কর্মকাণ্ড ভিত্তিক পূর্ব-মীমাংসা এবং বেদের জ্ঞানকাণ্ড নির্ভর উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত। দ্বিতীয় ভাগে আছে সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক। আর যাঁরা বেদের প্রামাণ্যে অবিশ্বাসী তাঁরা হলেন চার্বাকপন্থী। বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়। এই পর্বে আমরা সংক্ষেপে ভারতের বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

চার্বাক দর্শন : এই দর্শন হল জড়বাদী দার্শনিক। প্রত্যক্ষকেই তাঁরা একমাত্র প্রমাণস্বরূপ বিবেচনা করেন। চার্বাক বলেছেন—প্রত্যক্ষৈব প্রমাণবাদী। চার্বাকপন্থীদের মতে অনুমান এবং অন্যের বাক্যনির্ভর জ্ঞান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অসত্য বলে প্রমাণিত হয়। তাই প্রত্যক্ষ ছাড়া জ্ঞানের কোনো সংযোজন বা আত্তিকরণ সম্ভব নয়।

যেহেতু আমরা জড়জগৎকে পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর সর্বত্র প্রত্যক্ষ করি, তাই জড়জগতের সত্যতা বা অস্তিত্বকে আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারিনা। আমরা আরও জানি যে জড়জগৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারটি বস্তুর দ্বারা সৃষ্ট। এই চারটি বস্তুকে আমরা চতুর্ভূত বলে থাকি। এই চতুর্ভূতের অস্তিত্বকে আমরা সদাসর্বদা প্রত্যক্ষ করি। তাই চার্বাকপন্থীরা বলেন যে, অভৌতিক আত্মা বলে কিছু নেই। জীবন সম্পূর্ণভাবেই পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট।

চার্বাকপন্থীরা আত্মা এবং দেহের অভিন্নতা প্রমাণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন পৃথিবীতে দেহে চৈতন্য নামে একটি গুণের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। এই চৈতন্যও জড়ভূতের সৃষ্টি। এখানে সঙ্গত কারণে প্রশ্ন জাগে যে জীবদেহে চৈতন্যের আবির্ভাব কী করে হয়? চার্বাকপন্থীরা বলেন উপাদানে অনুপস্থিত গুণ অনেক সময় উপাদানসৃষ্ট বস্তুতে থেকে যায়। যেমন—গুড় থেকে মদ তৈরি হয়, তাতে একটা মাদকতা জন্মায়, কিন্তু গুড়ের সেই ক্ষমতা নেই। একইভাবে চতুর্ভূতের বিশেষ সংমিশ্রণে সজীব দেহে চৈতন্যের প্রসার এবং বিচ্ছুরণ চোখে পড়ে। দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য নাশ হয়ে যায়। মানুষের এই জীবনই একমাত্র জীবন। পরলোক বলে কোনো কিছু নেই। কারণ পরলোককে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। তাই জীবকে সৎ কাজ করলে স্বর্গলাভ হবে এবং অসৎ কাজ করলে নরকবাসী হতে হয়, এমন ধারণায় চার্বাকপন্থীরা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা আত্মার অবিনশ্বরতা অথবা জন্মান্তরবাদকে একেবারে নস্যাৎ বা খণ্ডন করেছেন।

চার্বাকপন্থীদের মতে চেতনা-দেহ-আত্মা নশ্বর। যেহেতু ঈশ্বর আমাদের চোখের সামনে পরিদৃশ্যমান নন, তাই ঈশ্বরের অস্তিত্বে চার্বাকপন্থীরা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেননি। তাই ঈশ্বরকে তুষ্ট করার মতো কোনো কাজ করার দরকার নেই। বেদ অবিশ্বাস্য। ধূর্ত পুরোহিত সম্প্রদায় স্বীয় স্বীয় জীবিকা অর্জনের সোপান হিসাবে বেদকে বারে বারে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকেন। চার্বাকপন্থীরা এই সব লোভী বোধহীন পুরোহিত সম্প্রদায়ের মুখোশ খুলে দিতে বদ্ধপরিকর।

চার্বাকপন্থীরা মনে করেন, এই জীবনে সুখ লাভই হল জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। তাঁদের অভিধানে পরলোক শব্দটি অনুপস্থিত। অতীতকে তাঁরা বিগত সময়ের সমষ্টি স্বরূপ বিচার করেন এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার গর্ভে নিহিত আছে বলে মনে করেন। তাই চার্বাকপন্থীরা যতটা সম্ভব ভোগ করার স্বপক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন দুঃখমিশ্রিত বলে জীবনের সুখ কখনো পরিত্যাগ করতে নেই। তুষের জন্য আমরা কি কখনো তণ্ডুল ত্যাগ করি? জীবনে অপরিমিত সুখ সাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে হবে। চার্বাক উপদেশ দিয়েছেন 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'। অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে, দরকার হলে ঋণ করে হলেও ঘি খাবে। চার্বাকের এই মতবাদকে অনেকে পাশ্চাত্য দর্শনের সুখবাদ বা Hedonism-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। চার্বাকপন্থীদের এই বক্তব্যকে আমরা একেবারে নস্যাৎ করতে পারি না। চার্বাক সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে একদা ভারতীয় বুদ্ধিজীবী মহলে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। অনেক বিশিষ্ট দার্শনিক তাঁর প্রতিষ্ঠিত মতবাদকে খণ্ডন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় যে আজও চার্বাকপন্থীরা কিন্তু ভারতের দর্শন-ইতিহাসে বেঁচে আছেন। আজও চার্বাকপন্থীদের মতবাদ

নিয়ে নানা স্থানে তর্ক-বিতর্কে ঝড় ওঠে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, চার্বাকপন্থীদের গ্রহণযোগ্যতা আজও একইরকম থেকে গেছে। এর পাশাপাশি আর-একটি বিষয়ও পরিষ্কার বোঝা যায়, তা হল, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সহনশীলতা এবং সহিষ্ণুতা। যে দর্শনশাস্ত্র চার্বাকপন্থীদের জন্য বাতায়ন উন্মুক্ত করেছে, তার বিশালতা আমাদের অবাক করে দেয় বই কি!

জৈন দর্শন : আমরা জানি চব্বিশজন তীর্থঙ্কর বা ধর্ম প্রবক্তার জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা উপলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমেই জৈনধর্ম ও দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এইসব তীর্থঙ্কররা ভারতের বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়েছেন। শৈশব অবস্থা থেকেই তাঁদের জীবনে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটতে থাকে। কৈশোরের স্বপ্নরাজ্যে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মধ্যে এক ধরনের বোধশক্তির উন্মীলন আমাদের চোখে পড়ে। পরবর্তীকালে তাঁরা মানুষকে সৎ, শোভন ও সুন্দর পথের পথিক করার জন্য নানা নিদান দিয়ে গেছেন। এই তীর্থঙ্করদের মধ্যে সর্বশেষ তীর্থঙ্কর হলেন বর্ধমান বা মহাবীর। তিনি ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। আর সর্বপ্রথম তীর্থঙ্কর হিসাবে যিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন তাঁকে ঐতিহাসিকরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন।

জৈনবাদীরা মনে করেন যে, প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। তাঁরা বলে থাকেন অনুমান এবং অন্যের বাক্যনির্ভর জ্ঞান কোনো কোনো সময় ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়, তবে প্রত্যক্ষও কখনো কখনো ভুল হতে পারে। কতকগুলো অনুমান ভ্রান্ত এই অভিজ্ঞতা থেকে চার্বাকেরা সমস্ত অনুমানকেই অনির্ভরযোগ্য বলে বাতিল করতে চান। চার্বাকপন্থীরা বলেন আত্মা এবং ঈশ্বর যেহেতু দৃশ্যমান নন তাই এদের অস্তিত্ব নেই, কিন্তু এক্ষেত্রেও তো চার্বাকপন্থীরা একটি অনুমানের ওপর নির্ভর করেন। তাই জৈন দার্শনিকরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি নন।

জৈনধর্ম প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান এবং শব্দকেও প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। তাঁরা বলেন বিশ্বস্ত মানুষের মুখনিঃসৃত বাক্যের মধ্যেও প্রমাণ লুকিয়ে আছে। অনুমান যখন ন্যায় ও নিয়মনীতি মেনে চলে তখন তা সত্যজ্ঞান দিতে পারে। আবার যদি কোনো বক্তা সুচিন্তিত বক্তব্যের মাধ্যমে দার্শনিক বিষয়গুলিকে আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন, তাহলে সেই বক্তার বক্তব্যকেও আমরা মন দিয়ে শ্রবণ করব। জৈন দার্শনিকরা বলেছেন, যে-সমস্ত আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি আমাদের সীমিত জ্ঞানের দ্বারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় অথবা যে বিষয়গুলি আমাদের বুদ্ধিগম্য নয় সে-বিষয়ে জানতে হলে সর্বজ্ঞ তীর্থঙ্করদের সাহায্য গ্রহণ করতেই হবে। তীর্থঙ্কররা ঐশী ক্ষমতার অধিকারী। মানবরূপে অবতীর্ণ হলেও তাঁদের মধ্যে অমানবীয় বেশ কিছু গুণ লুকিয়ে আছে। তাই তীর্থঙ্করদের উপদেশ আমাদের সঠিক পথের পথিক করে দেয়। সুক্ষ্ম এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করতে হলে তীর্থঙ্করদের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।

জৈনবাদীরা জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে তাঁদের ধারণা নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। প্রত্যক্ষ থেকে আমরা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ—এই চারটি ভূত বা বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। চার্বাকপন্থীরা একথাই বলে গেছেন। আর জৈনরা আকাশ ও কালের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন আকাশ না থাকলে এইসব বস্তু বা দ্রব্যের অবস্থান কোথায় হবে? কাল না থাকলে পরিবর্তন ঘটবে কেমন করে? পরিবর্তন এবং অপরিবর্তনের কারণস্বরূপ জৈনপন্থীরা ধর্ম এবং অধর্মের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন। তবে আমরা সাধারণত যে অর্থে ধর্ম এবং অধর্ম শব্দদুটি ব্যবহার করি, জৈন তাত্ত্বিকরা কিন্তু সেই অর্থ ব্যবহার করেননি। তাঁদের মতে ধর্ম পরিবর্তনের কারণ এবং অধর্ম অপরিবর্তনের কারণ। জৈনরা সমস্ত সজীব দেহে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দুটি বিষয়ের দ্বারা আমরা আত্মার অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে পারি। এই বিষয়টি বুঝিয়ে বলার জন্য তাঁরা বেশ কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যখন আমরা কোনো একটি বস্তু থেকে নিঃসৃত গন্ধ অনুভব করি অথবা সেই বস্তুটির রূপ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করি তখন সেই বস্তুটি আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। আর যখন আমরা দুঃখ প্রভৃতি অবস্থাকে অনুভব করি, তখন আত্মাকেই অনুভব করে থাকি। কোনো কোনো সময়ে অনুমানের দ্বারাও আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে

জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। আমরা গাড়ির মতো আমাদের দেহগত কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। তাই দেহকে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করার জন্য একটি অদৃশ্য শক্তি সদাসর্বদা বিদ্যমান। সেই শক্তিই হল আত্মা। জৈনবাদীরা বারবার বলেছেন কোনো জড় চৈতন্য ছাড়া কার্য সাধন করতে পারে না। এমনকি তাঁরা চার্বাকপন্থীদের যুক্তির বিরুদ্ধে নানা তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। তাঁরা বলেছেন, চার্বাকপন্থীরা এমন কোনো দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন না যেখানে জড় হতে মিলনের চৈতন্যের আবির্ভাব চিহ্নিত হয়েছে।

জৈনরা বলে থাকেন যে, যত সজীব দেহ আছে তত আত্মার অবস্থান। এমনকি ধূলিকণার মধ্যেও আত্মা বিদ্যমান বলে তাঁদের ধারণা। বর্তমান যুগের পদার্থবিজ্ঞান এই বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছে। পদার্থবিজ্ঞান মনে করে ধূলিকণার মধ্যে অদৃশ্য জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেগুলি এক-একটি অনন্য প্রাণসত্তা। জৈনপন্থীরা বিশ্বাস করেন উদ্ভিদ বা ধূলিকণাস্থিত জীব কেবলমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় বিশিষ্ট। স্পর্শ চৈতন্য ছাড়া এদের আর কোনো চৈতন্য নেই। আর নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে দুটি ইন্দ্রিয় আছে, কারো কারো ক্ষেত্রে তিনটি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চারটি ইন্দ্রিয় আছে। মানুষ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অধিকারী। তবে যে কোনো জীবনের আত্মা তার জ্ঞান এবং শক্তির দ্বারা সীমায়িত। তাই বোধহয় পৃথিবীর সমস্ত জীবকে নানা ধরনের দুঃখ, দৈন্য, জ্বালা, যন্ত্রণা অনুভব করতে হয়।

জৈনবাদীরা মনে করেন জীব অনন্ত শক্তি এবং অপরিমেয় আনন্দের অধিকারী হতে পারে। জীবপ্রবৃত্তির মধ্যেই জাতীয় গুণগুলি লুকিয়ে আছে। তবে এই অবস্থায় পৌঁছোতে গেলে জীবনব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। কোনো কোনো সময়ে আকাশের সূর্য যেমন মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তেমনি কর্মের দ্বারা জীবনের এই গুণগুলি ঢাকা পড়ে যায়। কামনাশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট বস্তু জীব বা আত্মার স্বাভাবিক গুণগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ঠিক যেভাবে ধূলিকণার আস্তরণ সূর্যের উজ্জ্বল আলোকের সামনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ আত্মার বন্ধন কর্মের জন্যেই হয়ে থাকে। জীবনকে যদি আমরা বন্ধনমুক্ত করতে পারি তাহলে আত্মা আবার তার গুণগুলিকে দশ দিগন্তে পরিব্যাপ্ত করতে পারবে।

তীর্থঙ্করদের জীবনকথা শ্রবণ করা অতীব পুণ্যের ফল। কারণ তাঁদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি আমাদের সামনে দিক-নির্দেশিকা হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আমরা বন্ধন-মুক্তির জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার চেষ্টা করি তাহলে সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক চরিত্র প্রয়োজন। সম্যক দর্শন বলতে কী বোঝায়? তীর্থঙ্করদের শিক্ষা এবং তাঁদের মুখনিঃসৃত বাণীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে। বুঝতে হবে তাঁরা কোন বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই শব্দগুলি উচ্চারণ করেছেন। সম্যক জ্ঞান বলতেও তাঁদের উপদেশের তাৎপর্য অনুধাবন করার বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে। সম্যক চরিত্র হল পঞ্চ মহাব্রত উদযাপন। এই পঞ্চ মহাব্রত হল অহিংসা, সত্য, অস্তেয় অর্থাৎ চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ বা সমস্ত কামনা-বাসনা ত্যাগ করা। যদি আমরা সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক চরিত্রের সংযুক্ত অনুশীলন করতে পারি তাহলে বাসনা কামনার অন্ধ কারাগার থেকে আমরা বাইরে বেরিয়ে আসার পথের সন্ধান করতে পারব। যখনই আত্মার সম্মুখস্থিত এই বাধাগুলি অপসারিত হবে তখন আত্মা পূর্বের মতো জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠবে। তখনই আমরা মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হব!

জৈনরা কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা তীর্থঙ্করদেরই জীবন্ত ঈশ্বর হিসাবে শ্রদ্ধা করেন। তাঁদের কাছে এই তীর্থঙ্কররাই হলেন পরম আদর্শের পুরুষ। তাঁদের জীবন এবং শিক্ষাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে মানুষ ইপ্সিত মুক্তির জগতে পৌঁছে যাবে বলেই জৈনদের স্থির বিশ্বাস।

জৈনধর্ম সকলের প্রতি প্রেম এবং অহিংসা বিতরণের কথা বারবার বলেছে। জৈনরা বলে থাকেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো জিনিষ বিচার করলে আমরা সেই জিনিষের অসংখ্য দিক দেখতে পাই। তাই আমরা কোনো একটি বস্তু সম্পর্কে যে কথা বলি না কেন, সেই কথাটিই সত্য। আমাদের জ্ঞান যে সীমিত এবং যে কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণাকেই বিষয়ের সবকটি দিককে পরিস্ফুটিত করে না। এই মৌলিক

সত্যটি জেনে রাখা দরকার। তাই তাঁরা যে কোনো কথাকে অতি সতর্কভাবে উচ্চারণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

জৈনদর্শন বাহ্য জগতের সত্যতা স্বীকার করে বলে তাকে বস্তুস্বাতন্ত্রবাদী বা Realistic বলে। আবার আত্যন্তিক সত্তায় বিশ্বাসী বলে বহুত্ববাদী বা Pluralistic বলে। যেহেতু জৈনদর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না তাই তাঁরা হলেন নিরীশ্বরবাদী।

বৌদ্ধ দর্শন : গৌতম বুদ্ধের জীবনব্যাপী সাধনা এবং তপশ্চর্যার দ্বারা যে দর্শন সৃষ্টি হয়েছে তাকে আমরা বৌদ্ধদর্শন বলে থাকি। গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল রাজপরিবারে। তখন তিনি ছিলেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ। তিনি রোগ, জরা এবং মৃত্যুর দৃশ্য দেখে সংসারের অপরিসীম দুঃখ সম্পর্কে অবগত হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে সর্বস্ব ত্যাগী এক সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে নির্লিপ্তির অভিব্যাক্তি তাঁর মনে এক শুদ্ধ চেতনার জন্ম দিয়েছিল। এই ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করার জন্য তিনি সাংসারিক জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে অনায়াসে পরিত্যাগ করেন। এমনকি অপরিমেয় রাজঐশ্বর্য, অতুলনীয়া সুন্দরী স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্রকে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবনের দুঃখ-কষ্টকে সানন্দে জীবনে বরণ করেন। বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুমতলে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য তিনি দীর্ঘকাল সাধনা করেন। শেষ পর্যন্ত এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সিদ্ধার্থ পেয়েছিলেন বুদ্ধত্ব। পরবর্তীকালে তিনি বুদ্ধদেব নামেই সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

বুদ্ধদেব অনুসৃত দর্শনকে বৌদ্ধদর্শন বলা হয়। তিনি 'চত্বারি আর্য সত্যানি' বা চারটি পবিত্র সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছেন—"এই পৃথিবীতে দুঃখ আছে, প্রতিটি দুঃখের অন্তরালে একটি কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে—এই চারটি বিষয়ের ওপর বৌদ্ধ দর্শন প্রতিষ্ঠিত।

এর মধ্যে প্রথম সত্যটি দুঃখের অস্তিত্ব সম্পর্কিত সত্য। এই সত্যটিকে সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক স্বীকার করেছেন। বুদ্ধদেব তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে দুঃখ কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর সর্বত্র দুঃখের পরিমণ্ডল বিরাজমান। দুঃখ সর্বব্যাপী। কারণ দুঃখ আমাদের সমস্ত সত্তা এবং অভিজ্ঞতাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আমরা যাকে আপাতদৃষ্টিতে সুখ বলে মনে করি, তা-ও দুঃখের একটি অংশ ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয় সত্য সম্পর্কে বুদ্ধদেব যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেটি তর্কশাস্ত্রের অন্তর্গত। অর্থাৎ এখানে কার্যকারণ সম্পর্ক স্বীকার করা হয়েছে। বুদ্ধদেব বলেছেন বাহ্য বা অন্তর্জগতের যে কোনো জিনিসই হল কোনো কারণের কার্য। এই পৃথিবীতে নিঃশর্ত অথবা স্বনির্ভর বলে কিছু নেই। ঘটনাপ্রবাহ শর্তাধীন এবং পরিবর্তনশীল। তাই কারণ ছাড়া কোনো কার্য হয় না। গৌতম বুদ্ধ ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন যে, আমাদের দুঃখ কারণহীন নয়। আমাদের জন্ম হয়েছে দুঃখের কারণে। জাগতিক বস্তুর প্রতি তৃষ্ণা আমাদের জন্মের কারণ। প্রতি মুহূর্তে আমরা কামনা-বাসনার দ্বারা আকর্ষিত এবং প্ররোচিত হয়ে থাকি। এই কামনা এসেছে অজ্ঞানতার জন্য। আমরা যদি কোনো বস্তুর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারতাম অর্থাৎ বুঝতে পারতাম যে বস্তুটি নশ্বর ও অনিত্য, তাহলে সেই বস্তুর প্রতি কখনো আকর্ষিত হতাম না। সেক্ষেত্রে আমরা জন্মগ্রহণ করতাম না এবং প্রতি মুহূর্তে দুঃখের সমুদ্রে অবগাহন করার মতো কষ্ট আমাদের স্বীকার করতে হত না।

গৌতম বুদ্ধের মতে দুঃখ যেহেতু শর্তাধীন, তাই যদি আমরা কোনোভাবে দুঃখের শর্ত বা কারণকে দূর করতে পারি তাহলে দুঃখ বলে আর কোনো অনুভূতি থাকবে না। এই বিষয়টিকে তাঁর তৃতীয় সত্যস্বরূপ ঘোষণা করা হয়েছে।

দুঃখের কারণ অপসারণের মাধ্যমে আমরা দুঃখ-নিবৃত্তির পথে যেতে পারি। এটিই হল তাঁর চতুর্থ সত্য। এই পথ অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বার্তা, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি হল আটটি অঙ্গ। এই অষ্টাঙ্গ আমাদের সকল কামনা-বাসনার জগৎ থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যায়। আর মানবদেহে জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবো না। আমরা পৌঁছে যাব নির্বাণ পর্যায়ে। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন বাস্তববাদী দর্শন-সাধক। তিনি জানতেন সাধারণ

মানুষের কাছে দুঃখজয়ের বিষয়গুলিকে ভালোভাবে তুলে ধরা উচিত। তাই তিনি নিজে তথাকথিত দার্শনিক সমস্যা সমাধানের খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। তিনি দুঃখদীর্ণ মানুষের জীবন থেকে দুঃখের উৎস নির্মল করার কাজেই ছিলেন আত্মনিবেদিত। তবে তিনি দার্শনিক অভিজ্ঞান থেকে একেবারে দূরে সরে থাকতে পারনেনি। তাই বৌদ্ধ দর্শন থেকে কয়েকটি বিষয় আমরা আলোচনার জন্য গ্রহণ করে থাকি।

গৌতম বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন এই পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই যা শর্তহীন, অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই হল শর্তাধীন। শর্তের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শর্তনির্ভর বিষয়ের পরিবর্তন চোখে পড়ে। এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই নিত্য নয়। জীবনপ্রবাহ স্রোতস্বিনী ধারার মতো। মোহনার সন্ধানে তার নিরন্তর ছুটে যাওয়া, আত্মা, ঈশ্বর বা অন্য কোনো অপরিবর্তনীয় সত্তা এই বিশ্বে পরিদৃশ্যমান হয় না। গৌতম বুদ্ধ আরও বিশ্বাস করতেন যে, বর্তমান জীবনে আমরা যে কর্ম করি তার ধারাবাহিকতা পরবর্তী জীবনে থেকে যায়। তিনি এই বিষয়টি বলতে গিয়ে মোমবাতির তুলনা করেছেন। একটি মোমবাতি থেকে অপর একটি মোমবাতি জ্বালানো যায়। প্রথম মোমবাতিটি নিভে গেলেও দ্বিতীয় মোমবাতিটি জ্বলতে থাকে। এই ভাবে মোমবাতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু এর দ্বারা আমরা মোমবাতির নিত্যতা প্রমাণ করতে পারি কী? বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন আত্মার ধারাবাহিকতা আছে কিন্তু নিত্যতা নেই।

গৌতম বুদ্ধের মতবাদের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে চারটি সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। যথাক্রমে মাধ্যমিক বা শূন্যবাদী সম্প্রদায়, যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায়, সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় এবং বৈভাষিক সম্প্রদায়। আমরা এই চারটি সম্প্রদায়ের ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

মাধ্যমিক বা শূন্যবাদী সম্প্রদায় মনে করেন যে, জগৎ শূন্যস্বরূপ বিরাজমান। তাঁদের বিশ্বাস, বাহ্য এবং আন্তর সবকিছুই মিথ্যা। এই মতবাদকে অনেকে শূন্যবাদ বলে থাকেন। পাশ্চাত্য দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা ডেভিড হিউম এই মতবাদকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করেছেন।

যাঁরা বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁরা বলেন বাহ্য বস্তুর আত্যন্তিক সত্তা নেই। যা কিছু আমরা বাহ্যবস্তু বলে স্বীকার করি তার মধ্যে বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে। বিজ্ঞানে সত্যতাকে কখনো অস্বীকার করা যায় না। কারণ বিজ্ঞানকে অস্বীকার করতে হলে আর-একটি বিজ্ঞানের দ্বারাই তা করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা বিজ্ঞানকে মেনে নেব। এই মতবাদকে সংক্ষেপে বিজ্ঞানবাদ বলা হয়। পাশ্চাত্য দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা বার্কলে এই মতবাদ প্রচার করেছেন।

সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা মনে করেন যে, বাহ্যবস্তু এবং আন্তর অবস্থা দুটিই সত্য। বাহ্যবস্তুকে যদি আমরা বিজ্ঞানের দ্বারাই অনুভব করে থাকি তাহলে যে কোনো জায়গাতে যে কোনো বস্তু গোচরীভূত হওয়া উচিত। কিন্তু সর্বত্র সব বস্তু দেখা যায় না। বস্তু না থাকলে বস্তুর বিজ্ঞান থাকে কী? পাশ্চাত্য দর্শনে জন লক এই মতবাদ প্রচার করেছেন।

বৈভাষিক সম্প্রদায়ের মানুষ বিশ্বাস করেন যে, একটি বস্তুর বাহ্য এবং আন্তর অবস্থা আছে। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষের দ্বারা বস্তুর অস্তিত্ব অনুভূত হয়। যদি আমরা বিজ্ঞানের দ্বারা কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ করতে না পারি তাহলে বিজ্ঞান থেকে বস্তুর অনুমান স্বীকৃত হবে কী করে? যে বস্তুকে আমরা কখনো প্রত্যক্ষ করিনি, তাকে অনুমান করা সম্ভব নয়। এই মতবাদকেই বাহ্য প্রত্যক্ষবাদ বলা হয়। পাশ্চাত্য দর্শনে যাঁরা বস্তু স্বাতন্ত্রবাদী তাঁরা এই মতের সমর্থক।

বৌদ্ধধর্ম পরবর্তীকালে মহাযান এবং হীনযান নামে দুটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। কার জন্য আমরা সাধনা করব? নিজের আত্মিক উন্নতির জন্য নাকি বিশ্বের সকল মানুষের জন্য? এই বিষয়টির ওপর ভিত্তি করেই ওই বিভাজন। যাঁরা মহাযানপন্থী তাঁরা মনে করেন সকলের মুক্তির জন্যই একজন সাধক জীবনব্যাপী সাধনা করবেন। তিনি স্বার্থপরের মতো নিজের মুক্তির জন্য সাধনা করবেন না। হীনযানেরা বলেন নিজের মুক্তির জন্যই সাধনা করা উচিত। সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং থাইল্যান্ড অর্থাৎ শ্যামদেশে হীনযানবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তিব্বত, চিন ও জাপানে মহাযানীদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

ন্যায় দর্শন : মহর্ষি গৌতম এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। এই দর্শনমতে চারটি প্রমাণ আছে। যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। প্রত্যক্ষ কাকে বলব? ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সন্নিকর্ষের ফলে যে জ্ঞান জন্মায় তা-ই হল প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে—আন্তর এবং বাহ্য।

আন্তর প্রত্যক্ষ বলতে কী বোঝায়? আমরা অন্তরিন্দ্রিয় বা মন দ্বারা যা উপলব্ধি করি তা-ই হল আন্তর প্রত্যক্ষ এবং বহিরিন্দ্রিয় বা চক্ষু-কর্ণ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মায় তা-ই হল বাহ্য প্রত্যক্ষজনিত জ্ঞান।

অনুমান কাকে বলব? কোনো লিঙ্গের সঙ্গে অনুমেয় বস্তুর সম্বন্ধের ক্ষেত্রে লিঙ্গের মাধ্যমে সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করাকেই অনুমান বলে। ধূমের সঙ্গে অগ্নির সম্বন্ধ আছে। যেখানে ধূম সেখানে অগ্নির উপস্থিতি অবশ্যই থাকবে। কিন্তু কোথাও ধূম দেখে আমরা যদি সেখানে অগ্নি আছে বলে মনে করি, তাহলে অগ্নি সম্পর্কিত জ্ঞানকে অনুমিতি বলা হবে। একটি অনুমানে তিনটি অবয়ব এবং তিনটি পদ থাকে। তিনটি পদ হল পক্ষ, সাধ্য এবং লিঙ্গ বা সাধন। যার সম্পর্কে কিছু অনুমান করা হয় তা হল পক্ষ। যা অনুমিত হয় তা হল সাধ্য। যে জিনিসের মাধ্যমে এই অনুমান হয় তা হল লিঙ্গ বা সাধন।

আমরা পাহাড়ের গায়ে ধোঁয়া দেখে ভাবছি সেখানে আগুন জ্বলছে, এক্ষেত্রে পাহাড় হল পক্ষ, ধোঁয়া হল লিঙ্গ এবং অগ্নি হল সাধ্য।

সংজ্ঞা-সংজ্ঞী সম্বন্ধ জ্ঞানকে উপমিতি বলা হয়। কোনো বস্তুর সংজ্ঞার্থ বা বর্ণনা শুনে সেই বস্তু সম্পর্কে যে জ্ঞান হল সেইটি হল উপমিতি। বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা যখন অপ্রত্যক্ষ বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি তখন তাকে বলে শব্দ। আমরা বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে উঠি, এই জ্ঞান হল শব্দজ্ঞান।

শুদ্ধজ্ঞানের বা প্রমার বিষয়কে প্রমেয় বলা হয়। নৈয়ায়িকরা দ্বাদশ প্রমেয়র কথা স্বীকার করেছেন—(১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ বা ইন্দ্রিয়ের বিষয়, (৫) বুদ্ধি, (৬) মনস্থ (৭) প্রবৃতি, (৮) দোষ বা মানসিক ত্রুটি যেমন—রাগ, দ্বেষ, মোহ, (৯) প্রেত্যাভাব বা পুনর্জন্ম, (১০) ফল বা মানসিক ত্রুটিজাত সুখ-দুঃখের অনুভূতি, (১১) দুঃখ এবং (১২) মুক্তি।

বাৎসায়ন ছিলেন ন্যায় সূত্রের বিশিষ্ট ভাষ্যকার। তিনি বলেছেন, এই দ্বাদশ প্রমেয়ই সব নয়, তবে মুক্তির জন্য এই দ্বাদশ প্রমেয়র জ্ঞান থাকা উচিত।

ন্যায়দর্শনের মূল উদ্দেশ্য কী? এই বিষয়ের ওপরেও আলোকপাত করা উচিত, ন্যায়দর্শন সদাসর্বদা আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় এবং তার বিষয়বন্ধন থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। ন্যায় দার্শনিকেরা মনে করেন আত্মা দেহ ও মন থেকে আলাদা। দেহ জড় পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট। মনের ভিতর আছে অবিভাজ্য অণুপরিমাণে নিত্য পদার্থ। মন হয় এমন একটি ইন্দ্রিয় যার দ্বারা আনন্দ, বিষাদ, উল্লাস, সুখ-দুঃখ সবকিছু অনুভব করতে হয়। মনকে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই না। কিন্তু মন যে আছে তা প্রতি মুহূর্তে আমরা বুঝতে পারি। তাই মনকে অন্তর ইন্দ্রিয় বলা হয়।

আত্মা পদার্থ হলেও মন এবং দেহ থেকে ভিন্ন, কারণ চৈতন্য হল আত্মার প্রধান রূপ। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আত্মার সঙ্গে যখন কোনো বিষয় সংযুক্ত হয় তখনই আত্মার মধ্যে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। মুক্তিকালে আত্মার কিন্তু কোনো চৈতন্য থাকে না। মন অণুপরিমাণ, কিন্তু আত্মা হল ভোক্তা। কিছু মিথ্যা জ্ঞান আমাদের মধ্যে থাকে এবং আত্মা সেই বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। এর ফলে আত্মাকে জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। অনেকে বলেন যখন আমরা মুক্ত অবস্থায় পৌঁছে যাই তখন অপরিসীম আনন্দ লাভ করি। তবে নৈয়ায়িকরা একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন দুঃখ ছাড়া সুখের কোনো অস্তিত্ব নেই। অন্ধকার আছে বলেই আমরা আলোকে আলাদাভাবে চিনতে পারি এবং ভালোবাসি। তাই দুঃখ এবং সুখ একে অন্যের পরিপূরক। মুক্ত অবস্থা দুঃখ মুক্ত অথচ সুখযুক্ত নয়।

যাঁরা ন্যায়বাদী দার্শনিক তাঁরা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে ঈশ্বর হলেন স্থল-জল-অন্তরীক্ষের স্রষ্টা এবং রক্ষাকর্তা। আবার ঈশ্বরের দ্বারাই এগুলি

একদিন বিনষ্ট হয় বলেই ঈশ্বর মহাসংহারক রূপে বিদ্যমান। ঈশ্বর পরমাণুর সাহায্যে বিশ্বজগৎকে সৃষ্টি করেছেন। এই জগতের সৃষ্টি কেন হয়েছে? যাতে জীব পূর্ব জীবনের কর্মফল ভোগ করে সেইজন্য। জীব যাতে তার কর্মফল অনুসারে কাজ করে সেদিকে ঈশ্বর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তিনি পুণ্যকে পুরস্কৃত করেন এবং পাপীকে তিরস্কৃত করেন।

এইভাবে ন্যায়বাদী দার্শনিকেরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে দুঃখের সাগর পার হবার কথা বারবার ঘোষণা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আগে অথবা পরে সব জীবই সম্যক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। এ বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

বৈশেষিক দর্শন : বৈশেষিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কণাদ মুনি। ন্যায় দর্শনের সঙ্গে বৈশেষিক দর্শনের অনেক সাদৃশ্যতা পরিলক্ষিত হয়। তাই ভাষ্যকাররা এই দুটি দর্শনকে সমানতন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ন্যায় দর্শনের মতো মুক্তিলাভই হল বৈশেষিক দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। বৈশেষিক দর্শন প্রতিটি প্রমেয়কে সাত ভাগে ভাগ করেছে—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব।

আমরা জানি এই পৃথিবীতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, আকাশ, দেশ, কাল, আত্মা ও মন—এই নয়টি দ্রব্য আছে। প্রথম পাঁচটিকে বলে ভূত আর গন্ধ, স্বাদ, বর্ণ, স্পর্শ হল এদের গুণ। প্রথম চারটি অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ চার প্রকার পরমাণুর দ্বারা সৃষ্ট। পরমাণুকে আমরা আর ভাগ করতে পারি না। পরমাণু অজড়, অমর, নিত্য। যে কোনো জড়বস্তুকে ভাঙতে ভাঙতে শেষ পর্যন্ত আমরা পরমাণুতে পৌঁছে যাব। আকাশ, দেশ এবং কাল অদৃশ্য। এদের প্রত্যেকের মধ্যে নিজস্ব নিত্যতা বিদ্যমান। মন নিত্য। কিন্তু মন অণুপরিমাণ। মনকে আমরা বলি অন্তরিন্দ্রিয়। আত্মা হল চৈতন্যের আধার। আমি সুখী এই ধরনের আন্তর প্রত্যক্ষে জীবাত্মার অস্তিত্ব জানা যায়। পরমাত্মা বা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে আমরা জগতের কারণ হিসাবে তুলে ধরতে পারি। ঈশ্বর হলেন জগতের নিমিত্ত কারণ। পরমাণু জগতের উপাদান কারণ।

পরমাণুর দ্বারাই ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। পরমাণুর সংযোগ থেকে যেমন জগতের সৃষ্টি হয়, পরমাণুর বিয়োগ থেকে জগৎ একদিন ধ্বংসও হবে। তবে পরমাণু নিজের ইচ্ছায় নিজে সংযুক্ত বা বিযুক্ত হতে পারবে না। এরজন্য তাকে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি এবং আদেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। ঈশ্বর কর্মের রীতি অনুসারে কখনো এদের যুক্ত করেন আবার কখনো বিযুক্ত করেন। জীব যাতে কর্ম বা অদৃষ্ট অনুসারে যথাযথ ফল পায় সেদিকে লক্ষ রেখে ঈশ্বর এই ধ্বংস এবং সৃষ্টির খেলা খেলে চলেছেন। এই বিষয়টিকে অনেকে বৈশেষিক পরমাণুবাদ বলেন।

পাশ্চাত্য দর্শন ও পরমাণুবাদের কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পরমাণুবাদকে বিশ্লেষণ করেছেন, প্রাচ্য দেশের দার্শনিকেরা তা করেননি। পাশ্চাত্য দেশের পরমাণুবাদ যান্ত্রিক এবং জড়বাদী। যান্ত্রিক মতে পরমাণু সংযোগের অন্তরালে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নেই। অথচ বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে যে, কর্ম অনুসারে বা অদৃষ্ট অনুসারে জীবদেহকে ফলপ্রদানই হল পরমাণুবাদের উদ্দেশ্য। বৈশেষিক দর্শনে যে পরমাণুবাদের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে তা কিন্তু যান্ত্রিক নয়, তা হল উদ্দেশ্যমূলক। যাঁরা জড়বাদী দার্শনিক তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব কখনো স্বীকার করেন না। তাঁরা বিশ্বাস করেন ঘটনা পরম্পরায় অনিবার্য রূপের দ্বারাই বিশ্বজগতের সৃষ্টি। অথচ বৈশেষিক দর্শনে জগতের নিমিত্ত কারণ হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া হয়েছে। তাই বৈশেষিক পরমাণুবাদকে আমরা কখনোই জড়বাদী পরমাণুবাদ বলব না।

বৈশেষিকরা বিশ্বাস করেন গুণ দ্রব্যে থাকে। কিন্তু গুণের কোনো গুণ বা কর্ম থাকে না। গুণ কখনো কোনো দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না। গুণের কোনো কর্ম বা গতি নেই। বৈশেষিক দর্শনে আমরা মোট চব্বিশটি গুণের কথা আলোচনা করেছি—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রব্যত্ব, স্নেহ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, সংস্কার, ধর্ম এবং অধর্ম।

কর্মের অর্থ কী? কর্ম একটি চলিষ্ণু সত্তা। গুণের মতো কর্মও দ্রব্যে থাকে। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, অকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন—এই পাঁচ প্রকার কর্ম আমরা দেখতে পাই। সাধারণ ধর্মকে মনুষত্ব বলা হয় এবং এটি এক সামান্য অবস্থা। এই সামান্য অবস্থা একজন ব্যক্তি জন্মের সময়ে আহরণ করে। সামান্য নিত্য ব্যক্তি অনিত্য। ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু এবং জীবন আছে কিন্তু মনুষত্বের জন্ম-মৃত্যু নেই।

বিশেষ সামান্যের বিপরীত স্বভাবের অবস্থান, দেশ, কাল, আকাশ, মন এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ পরমাণুর মতো নিরংশ। এই নিত্য দ্রব্যের ঐকান্তিক বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ বলা হয়।

অংশের বিভিন্নতার জন্য এদের মধ্যে পার্থক্য অনুভূত হয়ে থাকে। সুতরাং পারস্পরিক ভেদ নির্ণয়ের জন্য এদের ঐকান্তিক বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতে আমরা বাধ্য।

যে নিত্য সম্বন্ধের ভিত্তিতে অংশী অংশে থাকে, গুণ বা কর্ম দ্রব্যে থাকে এবং সামান্য থাকে বিশেষে তাকে বলে সমবায়।

অভাব বলতে বস্তুর নাস্তিত্ব বোঝায়। অভাবের চার ভাগ—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। প্রথম তিনটি সংসর্গাভাবের অন্তর্গত। প্রাগভাব—কোনোকিছু উৎপন্ন হওয়ার আগে বস্তুর উপাদানে বস্তুর যে অভাব থাকে সেটি হল প্রাগভাব। মূর্তি তৈরি হওয়ার আগে মাটিতে মূর্তির অভাবকে আমরা প্রাগভাব বলব। আর কোনোকিছু ধ্বংস হলে ধ্বংসাবশেষ বস্তুর যে অভাব তার নাম ধ্বংসাভাব। কোনো বস্তুতে অন্য কিছু চিরকালের অনুপস্থিতিকে অত্যন্তাভাব বলে। যেমন বায়ুতে রূপের অভাব। রূপ কখনো বায়ুতে থাকে না। এই তিন প্রকার অভাব কোনো কিছুতে অন্য কিছুর অভাব বোঝায় তাই এদেরকে সংসর্গাভাব বলে। একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য আর-একটি বস্তুর যে অভাব তাকে অন্যোন্যাভাব বলে। যখন দুটি জিনিস আলাদা তখন একটির অভাব অন্যটিতে সর্বজনস্বীকৃত।

বৈশেষিক দর্শন ন্যায়মত অনুসরণ করে ঈশ্বর, জীবের বন্ধন ও মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছে। আমরা আবার বলছি মত সাদৃশ্যের জন্য বৈশেষিক এবং ন্যায় দর্শনকে সমানতন্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সাংখ্য দর্শন : সাংখ্য দর্শন সর্বপ্রাচীন দর্শন হিসাবে স্বীকৃত। কপিল মুনি এই দর্শনের স্রষ্টা। এই দর্শন অনুসারে বলা হয় পুরুষ এবং প্রকৃতি পরস্পর নিরপেক্ষ দুটি তত্ত্ব। তাই সাংখ্য দর্শনকে দ্বৈতবাদী দর্শন হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। পুরুষ চৈতন্য-স্বভাব সংযুক্ত। এই চৈতন্য গুণ কিন্তু পুরুষের গুণ নয়, এটি হল পুরুষের স্বরূপ। পুরুষ বলতে কী বোঝায়? দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন থেকে ভিন্ন যে আত্মা তা-ই হল পুরুষের প্রকৃতি। এই আত্মা বা পুরুষের দ্বারাই জগতের সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হয়। আবার এই পুরুষ নিজে অপরিবর্তিত এবং অপরিবর্তনীয় থাকে। আমরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে এর উদাহরণ দিতে পারি। আমরা জানি, সচেতন প্রাণীরা তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের জন্য অচেতন পদার্থ থেকে নানাবস্তু তৈরি করে। এই বস্তুগুলি কিন্তু কখনোই নিজেদের ভোগে লাগে না। ঠিক সেইভাবে পুরুষ নানা ঘটনার সাক্ষী থাকে, অথচ নিজে সেই ঘটনায় অংশগ্রহণ করে না।

সাংখ্য বিশারদরা বলে থাকেন দেহ থেকে আত্মা বা পুরুষ ভিন্ন, বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে সকলের একসঙ্গে জন্ম বা মৃত্যু বা একই জ্ঞান হত। তা হয় না বলেই পৃথিবীতে বহু পুরুষ বিদ্যমান বলে মনে করা হয়।

প্রকৃতি হল জগতের একটি উপাদান, কারণ প্রকৃতি নিত্য এবং জড়। পুরুষকে নানা কাজে সাহায্য করা এবং পুরুষের ভোগে লাগা ছাড়া প্রকৃতির আর কোনো কাজ নেই। প্রকৃতির মধ্যে তিনটি গুণ বা অবস্থা আছে,—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। এই তিনটি গুণ বা অবস্থা সাম্যাবস্থায় থাকে। আমরা গুণের অস্তিত্ব কীভাবে অনুমান করি? জাগতিক বস্তুর মধ্যে যে সুখ এবং দুঃখ নিহিত আছে, তা দেখেই গুণ নির্ণিত হয়। জাগতিক বস্তু নিস্পৃহতা উৎপাদন করে থাকে, সেটিও তার গুণের পরিচায়ক। একই দ্রব্য বিভিন্ন মানুষের কাছে

উল্লাসের কারণ, বিষাদের প্রতীক অথবা নির্লিপ্তির দ্যোতক হতে পারে। সাংখ্য মতে কার্য কারণে সম্ভাবনারূপে অবস্থান করে। অর্থাৎ সাংখ্যকাররা মনে করেন কারণ হল কার্যের অব্যাপৃত রূপ।

এই মতবাদকে সৎকার্যবাদ বলা হয়, জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে সুখ, দুঃখ এবং নিস্পৃহতা এই তিনটি গুণ বিদ্যমান। কারণ প্রকৃতিতেও এই তিন ধরণের গুণ আছে। সত্ত্ব হল প্রকাশক গুণ, রজঃ কর্মদ্যোতক এবং তমঃ আবরক গুণ।

কখন প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয়? প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যখন সংযোগ আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় তখন এমন ঘটনা ঘটে। তখন প্রকৃতি নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চায়। প্রকৃতির সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। প্রকৃতি থেকে বিরাট বিশ্বের বীজস্বরূপ এক মহতের আবির্ভাব ঘটে। এই মহৎকে উত্তেজিত করে আত্মচৈতন্য। তখন মহৎ চেতন-সম্পন্ন হয়ে ওঠে। চৈতন্য থাকায় তাকে বুদ্ধি বলে। বুদ্ধি থেকে অহংকারের জন্ম, অভিমান হল অহংকারের বৈশিষ্ট্য। অনেক সময়ে আত্মা নিজেকে অহংকারের সঙ্গে একীভূত করে দেয়। তাই আমরা আত্মার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি না।

অহংকারের থেকেই তৈরি হয় পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞান ও কর্মের উভয়েন্দ্রিয়। তমোগুণ যেখানে বেশি থাকে সেখানে অহংকার পঞ্চতন্মাত্রে পরিণত হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের সম্ভাবনায় তৈরি হয় মহৎ মহাভূত। প্রকৃতি এবং পুরুষকে নিয়ে এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে সাংখ্য দার্শনিকরা স্বীকার করেছেন। এদের মধ্যে পুরুষ ভিন্ন আর সবই হল প্রকৃতি কিংবা প্রকৃতিজাত তত্ত্ব। প্রকৃতি হল সমস্ত বস্তুর আদি এবং অকৃত্রিম কারণ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চমহাভূত কার্য; কিন্তু তারা কারণ নয়।

এই দর্শন স্বীকার করে আত্মা স্বরূপত অসঙ্গ এবং মুক্ত। আত্মা মৃত্যুহীন। অবিদ্যা বা অজ্ঞানের দ্বারা আমরা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছি যে আমরা মনে করি আত্মা দেহ এবং ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন নয়। আত্মা এবং অনাত্মার মধ্যে দুঃখ, দুর্গতি এবং লাঞ্ছনার কারণ লুকিয়ে থাকে। আমাদের মধ্যে সেই বোধ নেই যে, দেহ ও আত্মা এক নয়। তাই মানুষ এত দুঃখ অনুভব করে। যদি একবার আমাদের জীবনে এই বোধ জাগ্রত হয় তাহলে সমস্ত সুখ-দুঃখ, বিষাদ-উল্লাস, সার্থকতা-ব্যর্থতা বিন্দুমাত্র আমাদের প্রভাবিত করতে পারবে না। আত্মা তখন সবকিছুর নিস্পৃহ দ্রষ্টা হিসাবে অবস্থান করবে। এই অবস্থাকেই আমরা মুক্তি বা কৈবল্য বলে থাকি।

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ এই মুক্তির সন্ধানে নিরন্তর ছুটে চলেছে। কিন্তু সে জানে না কখন সেই মুক্তির কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি আসবে। এই জগতে বেঁচে থেকেও আমরা যদি ওই পর্যায়ে পৌঁছোতে পারি, তখন তাকে বলে জীবন্মুক্তি। আবার মৃত্যুর পর যখন আমরা এই অবস্থার অধিকারী হব তখন তাকে বলা হবে বিদেহ মুক্তি। এই মুক্তি তত্ত্বজ্ঞান থেকে আহরণ করা সম্ভব। তবে এই তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতে হলে কঠিন-কঠোর সাধনা করতে হবে। যোগ—দর্শনে এই জাতীয় সাধনার আনুপুর্বিক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে। যোগনির্দিষ্ট সাধনপথে যদি আমরা সাধনার দিকে এগিয়ে যাই তবে একদিন আমাদের মনের মধ্যে এই ধারণা জন্মাবে যে, পুরুষ ও প্রকৃতি হল ভিন্ন।

সাংখ্য দর্শনের মূল সুর হল ঈশ্বরবিশ্বাস-বিরোধী। সাংখ্যমতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা অযৌক্তিক। সাংখ্যকাররা মনে করেন জগৎ সৃষ্টির নিয়ামক হিসাবে ঈশ্বরকে স্বীকৃতি দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রকৃতির দ্বারাই এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বর জগতের কারণ হতে পারেনা। সাংখ্য দর্শনে কোনো কোনো ভাষ্যকার অবশ্য জগৎ সৃষ্টির সাক্ষী বা দ্রষ্টা হিসাবে পরম পুরুষের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। তবে তাঁরা বারবার বলেছেন ঈশ্বর কখনো স্রষ্টা হতে পারেন না, তিনি একটি ঘটনার দ্রষ্টা মাত্র।

যোগ দর্শন : ন্যায়-বৈশেষিকের মতো সাংখ্য-যোগও সমানতন্ত্র। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এবং প্রমাণাবলি যোগ দর্শন স্বীকার করেছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই দুটি দার্শনিক অভিজ্ঞানের মধ্যে

তফাৎ আছে। সাংখ্য দর্শনে সাধারণত ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না, কিন্তু যোগ দর্শন ঈশ্বরকে স্বীকার করে। তাই যোগ দর্শনকে ঐশ্বরিক সাংখ্য বলা হয়। যেহেতু ঋষি পতঞ্জলির দ্বারা এই দর্শন ভাবনা উদ্ভাবিত হয়েছিল তাই একে পাতঞ্জল দর্শনও বলে।

সাংখ্য দর্শনে বারবার বলা হয়েছে যে আমরা বিবেকজ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করতে পারি। যোগ দর্শন বলছে কীভাবে আমরা কোন সাধন পদ্ধতিকে অবলম্বন করে এই বিবেকজ্ঞান লাভ করতে পারব! যোগ অর্থ কী? যোগ অর্থে মানসিক চাঞ্চল্যের নিবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। এই যোগ অবস্থায় পৌঁছোতে পারলে আমরা বিবেকজ্ঞানের অধিকারী হতে পারব!

যোগ দর্শন পাঁচটি অবস্থার কথা বলেছে। প্রথমত **ক্ষিপ্ত** অবস্থা। এই সময়ে মন এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে পাগলের মতো ছুটে যায়। কোনো একটি বিষয়ের ওপর স্থির হয়ে বসতে পারে না। পরবর্তী অবস্থাকে বলে **মূঢ়** অবস্থা। নিদ্রাতে আমরা এই অবস্থার পরিচয় পাই। তৃতীয় অবস্থাটি হল **বিক্ষিপ্ত** অবস্থা। তখন মন খানিকটা শান্ত হয়। এই তিনটি অবস্থাতে আমরা কোনোভাবেই যোগলাভ করতে পারব না। চতুর্থ এবং পঞ্চম অবস্থা হল **একাগ্র** ও **নিরুদ্ধ।** কোনো একটি বিষয়েতে মনকে সম্পূর্ণভাবে অভিনিবিষ্ট করাকে বলে একাগ্র অবস্থা। নিরুদ্ধ অবস্থায় মন সম্পূর্ণ স্বস্থ হয়, তখন তার কোনো কাজ থাকে না। এই দুটি স্তরে পৌঁছোতে পারলে তবে আমরা যোগলাভ করতে পারব।

যোগ বা সমাধির দুটি ভাগ—সমপ্রজ্ঞাত এবং অসমপ্রজ্ঞাত। প্রথম প্রকার সমাধিতে মন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে। আর সেই বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়। দ্বিতীয় সমাধিতে সমস্ত মানসিক চাঞ্চল্যের অবসান ঘটে। এই অবস্থায় সাধক আত্মসমাহিত হয়ে যান।

যোগের এই অবস্থায় পৌঁছোতে হলে আটটি সোপান পার হতে হয়। এদের বলে যোগাঙ্গ। যম বা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, নিয়ম বা সন্তোষ প্রকৃতির সৎগুণ অর্জন, আসন বা বসার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান, প্রাণায়াম বা শ্বাস নিয়ন্ত্রণ, প্রত্যাহার বা বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়ের প্রতি-নিবৃত্তি, ধারণা বা মনোনিবেশ, ধ্যান বা একাগ্র মনন এবং সমাধি বা চিত্তের বিকার নিরোধ। এই অষ্টবিধ যোগপদ্ধতি আমাদের পালন করতে হয়।

যোগ দর্শনে বলা হয়েছে যোগী চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য ঈশ্বর-প্রণিধানকে অনুভব করবেন। যোগ সিদ্ধান্ত অনুসারে ঈশ্বরকে একটি সর্বজ্ঞ সত্তা হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। তিনি সর্বশক্তিমান নিত্য, যোগ দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ-স্বরূপ কয়েকটি ব্যাখ্যা বলা হয়েছে। প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে বলা হয় পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ থেকেই মহাবিশ্বের সৃষ্টি। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ-স্বভাবসম্পন্ন একজন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুষের পক্ষে এই সংযোগ সাধন সম্ভব। সেই পুরুষ কে? তিনি হলেন ঈশ্বর।

যাঁর এই পরিমাণ বা মাত্রা-ভেদ আছে তাঁরই সর্বনিম্ন এবং সর্বাধিক পরিমাণ মাত্রা থাকা সম্ভব। জ্ঞানের পরিমাণকে আমরা স্বীকার করি। জ্ঞান চরম মাত্রা! এই মাত্রাকেই আমরা ঈশ্বর বলব।

মীমাংসা দর্শন : বেদের দুটি ভাগ আছে—কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে বলা হয়েছে কীভাবে বিভিন্ন ধার্মিক নিয়মনীতি পালন করতে হয়। আর জ্ঞানকাণ্ডে বেদের অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে। যে দর্শন বৈদিক কর্মকাণ্ড বা যাগযজ্ঞকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করে এবং কর্মকাণ্ড ভিত্তিক জগৎ ও জীবন-বোধের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে তাকে আমরা মীমাংসা দর্শন বলে থাকি। জৈমিনি এই মীমাংসা দর্শনের উদ্গাতা।

বেদ প্রামাণ্য হল যাগযজ্ঞের ভিত্তিতে। মীমাংসকেরা বলে থাকেন বেদ হল অপৌরুষেয়, তাই একজন সাধারণ মানুষ দ্বারা লিখিত গ্রন্থে যেসব ভুলভ্রান্তি চোখে পড়ে, বেদে তা প্রাপ্ত নয়। বেদ হল নিত্য এবং স্ব-নির্ভর। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা নিজস্ব জীবনের সাধনলব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বেদ সৃষ্টি করেছেন। মীমাংসকেরা বলে থাকেন জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ, পর্যাপ্ত উপকরণ থাকলে জ্ঞান অর্জন হতে পারে। যেমন শাব্দিক ইতিহাস পড়ার সময়ে আমরা শব্দ-প্রমাণের ওপর নির্ভর করে অতীত জীবন সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারি। উৎপন্ন জ্ঞানকে সত্য বলে স্বীকার করি এবং যুক্তি না দিয়ে এই দাবির সত্যতা মেনে নিই। সংশয়ের

অবকাশ থাকলে কোনো জ্ঞানই অর্জিত হতে পারেনা। তাই বিশ্বাসকে জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলা হয়েছে। সংশয় থাকলে কিন্তু বিশ্বাস থাকবে না। অন্যান্য জ্ঞানের মতো বেদভিত্তিক জ্ঞানই হল স্বতঃপ্রমাণ। বেদ সম্পর্কে কোনো সংশয় থাকলে আমরা মীমাংসা দর্শনের দ্বারা সেই সংশয় নিরসন করতে পারব।

বেদ নির্দিষ্ট কর্মকে ধর্ম এবং নিষিদ্ধ কর্মকে অধর্ম বলা হয়। আমাদের উচিত, ফল লাভের বাসনা নিয়ে কর্তব্য না করা। কর্তব্য হিসাবেই আমরা কর্তব্য সম্পাদন করব।

আত্মসংযম এবং সম্যক জ্ঞান থাকলে তবেই আমরা যে কোনো কর্মকে সমাধা করতে পারব। প্রাচীনকালের মীমাংসকরা মনে করতেন, মানুষ যদি একবার মুক্ত অবস্থায় পৌঁছোতে পারে তাহলে সে স্বর্গসুখ লাভ করবে। পরবর্তীকালে অবশ্য মীমাংসকেরা মুক্তি বলতে জন্মরোধ এবং দুঃখনাশকে চিহ্নিত করেছেন।

আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে মীমাংসকেরা কয়েকটি নতুন তত্ত্ব আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন —আত্মা মৃত্যুতেই ধ্বংস হয় না, তাহলে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের দ্বারা আমরা কীভাবে স্বর্গলাভ করব? জৈন মতাবলম্বীদের সঙ্গে এই ব্যাপারে মীমাংসকদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মীমাংসকেরা মনে করেন আত্মা এবং দেহ ভিন্ন। মীমাংসকেরা চৈতন্যকে আত্মার আত্মগত গুণ বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে চৈতন্য হল আত্মার আগন্তুক গুণ। কখন চৈতন্য আত্মাতে আবির্ভূত হয়? আত্মা যখন দেহযুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়গুলি যখন বিষয়ের সংস্পর্শে আসে তখনই এমন ঘটনা ঘটে যায়।

দেহযুক্ত আত্মার বিবিধ প্রকার জ্ঞান সম্ভব। জ্ঞান কতরকম ভাবে সংগৃহীত হতে পারে সে-সম্পর্কে মীমাংসকেরা কোনো জবাব দেননি। অবশ্য এক্ষেত্রে আমরা মীমাংসার দর্শনের দুটো বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করতে পারি। একটি প্রাভাকর দ্বারা প্রবর্তিত। একে বলে প্রাভাকর সম্প্রদায়। অন্যটি কুমারিল ভট্ট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এর নাম ভাট্ট সম্প্রদায়।

প্রাভাকরের মতে পাঁচটি প্রমাণ আছে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এবং অর্থাপত্তি। প্রথম চারটি প্রমাণকে আমরা ন্যায়দর্শনে স্বীকৃতি দিয়েছি। উপমান ছাড়া অন্যান্য প্রমাণের ব্যাখ্যাও ন্যায়দর্শনের মতো। উপমান প্রসঙ্গে মীমাংসা একটু অন্য মত পোষণ করে।

আপাত-বিরোধের ক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান যে প্রমাণ-নির্ভর করে পাওয়া যায় তাকে অর্থাপত্তি বলা হয়। ভাট্ট মীমাংসকের ওপরে আলোচিত পঞ্চপ্রমাণ ভিন্ন ষষ্ঠপ্রমাণ স্বীকার করেন। তার নাম অনুপলব্ধি। দিনেরবেলায় আকাশ দেখে আমরা যদি বলি যে আকাশে তারা নেই তাহলে সেই জ্ঞানকে সম্পূর্ণ বলা হবে না। এটি হল অনুপলব্ধির বিষয়।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের ওপর নির্ভর করে মীমাংসকেরা জড় জগতের সত্যতাকে স্বীকার করেছেন। এই দর্শনকে বস্তুস্বাতন্ত্রবাদী দর্শন বলা হয়। মীমাংসকেরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তবে তাঁরা জগৎ-সংসারের স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মানেন না। তাঁরা সৃষ্টি ও প্রলয়চক্রে বিশ্বাসী নন। তাঁরা বিশ্বাস করেন জগৎ চিরকাল একই রকম ভাবে থাকবে। জগতের শুরু অথবা শেষ নেই। কর্মের নিয়ম বিশ্বকে পরিচালনা করে। এই নিয়ম-সাধন স্বাভাবিক। নৈতিক কোনো কিছুর দ্বারা এই নিয়মকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা যায় না।

বেদান্ত দর্শন : ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈদান্তিকদের প্রচার এবং প্রসার সবথেকে বেশি। অনেক ভারতীয় সাধক বিদেশে গিয়ে বেদান্ত দর্শন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ভাষণ এবং ভাষ্যদান করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলব। বিদেশের অনেকে ভেবে থাকেন যে ভারতীয় দর্শন মানেই বেদান্ত দর্শন। বেদান্ত দর্শন উপনিষদ ভিত্তিক। উপনিষদ বৈদিক যুগের সর্বশেষ সাহিত্য সৃষ্টি এবং উপনিষদের পাতায় পাতায় বৈদিক বুদ্ধিজীবীদের শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলি সংকলিত হয়েছে। উপনিষদকে তাই বেদান্ত বলা হয়ে থাকে। উপনিষদ অনেক এবং বিভিন্ন উপনিষদে অনেক সময় বিরূদ্ধ—কথা পাওয়া যায়। বাদরায়ন ব্যাস তাই উপনিষদের সর্বসম্মত মূল বক্তব্য একত্র করে ব্রহ্মসূত্র আকারে প্রকাশ করেছেন। তবে এই সূত্রগুলি এত সংক্ষিপ্ত যে অনেক সময়ে এদের অন্তর্নিহিত অর্থ ঠিকমতো উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

সেইজন্য বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে এই সূত্রগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই বেদান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ভাবধারা দেখা গেছে। এঁদের মধ্যে শঙ্করাচার্য, অদ্বৈতবাদ এবং রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই হল প্রধান। আমরা সকলেই জানি ভারতের আধ্যাত্মিক অভিযাত্রার ইতিহাসে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। আমরা বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে যে মতের প্রচার এবং প্রসার দেখে থাকি তা শঙ্করাচার্য দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে। তাই বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে শঙ্করাচার্যের দর্শনের কথা জানা উচিত।

বেদান্ত দর্শনের তিনটি ভাগ আছে—শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়। ব্রহ্মসূত্র স্মৃতি-প্রস্থান, ভগবৎগীতা স্মৃতিপ্রস্থান এবং ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য ন্যায়প্রস্থান। বৈদান্তিক সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্র এবং ভগবৎগীতার উপর নির্ভর করে।

বেদ এবং উপনিষদের মাধ্যমে আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনায় বৈদান্তিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছিল। ঋকবেদে পুরুষ সূত্রের কথা বলা হয়েছে। এখানে বিশ্বাতিরিক্ত এমন এক বিরাট পুরুষের কথা চিন্তা করা হয়েছে যিনি সমস্ত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের উর্ধ্বে অবস্থান করেন। এই বিশ্বের সকল সজীব ও নির্জীব বস্তু মানুষ ও ঈশ্বর ওই মহাপুরুষেরই অংশবিশেষ। নাসদীয় সূক্তে সমস্ত বিশেষণের অতীত, বিশ্বভূবন বিধৃত এক অনির্বচনীয় সত্তার কথা বারবার বলা হয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে এই সত্তা সৎ, তিনি কখনো আত্মা, কখনো বা ব্রহ্ম। আত্মা থেকেই সকল বস্তুর জন্ম। এই সত্তাতেই তাদের স্থিতি এবং এই সত্তাতেই শেষপর্যন্ত তারা উদয় হয়। জগতের সবকিছুতে একই সত্তার প্রকাশ, উপনিষদ বারবার এ কথা ঘোষণা করেছে। উপনিষদ বলেছে —'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ সবকিছুই ব্রহ্ম, 'অয়ম আত্মা ব্রহ্ম' অর্থাৎ এই আত্মা ব্রহ্ম, 'নেহনানাস্তি কিঞ্চন' অর্থাৎ এখানে নানা বলে কিছু নেই। উপনিষদ ব্রহ্মকে সত্যজ্ঞান বলেছে। উপনিষদের মতে 'সত্যম জ্ঞানম্ অনন্তম ব্রহ্ম'।

শঙ্করাচার্য ছিলেন এক মহান যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবী মানুষ। তিনি উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, অদ্বৈতবাদই হল বেদের মূল বক্তব্য। শঙ্করের মত নিয়ে পরে অনেক আলোচনা হয়েছে। অর্ধশ্লোকে শঙ্করের বক্তব্য প্রকাশ করে বলা হয়—'ব্রহ্মসত্যং, জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ' অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নয়।

ব্রহ্ম একমাত্র সত্য এবং ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নেই বললে আমরা কোনো ধারণা পোষণ করব। শঙ্কর বিশ্বাস করতেন ব্রহ্মের সজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত কোনো ভেদই উপলব্ধ নয়। একই জাতির দুটি ব্যক্তির মধ্যে যে ভেদ তাহল স্বজাতীয় ভেদ। ব্রহ্ম যেহেতু কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত নয় তাই সেক্ষেত্রে স্বজাতীয় ভেদের প্রশ্ন ওঠে না। দুটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভেদকে বলে বিজাতীয় ভেদ। ব্রহ্ম নিজে জাতি নয় এবং ব্রহ্মের অনুরূপ অন্য কোনো জাতিও নেই বলে ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ হল অসম্ভব। নিত্যতা, শুদ্ধতা প্রভৃতি ব্রহ্মের কোনো গুণ নয়। এরা ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্ম আসলে নির্গুণ। ব্রহ্মসূত্রে এ কথার অর্থ হল ব্রহ্মের মধ্যে কোনো কিছুর মিশ্রণ নেই। ব্রহ্ম বুদ্ধ এই কথার অর্থ ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ। আর মুক্তি হল ব্রহ্মের প্রকৃতি।

ব্রহ্ম যদি সত্য হন তাহলে জগত এল কী করে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের একটি বাণী গ্রহণ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে—'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনং তু মহেশ্বরম' অর্থাৎ প্রকৃতিকে মায়া এবং মহেশ্বর বা প্রকৃতির স্রষ্টাকে মায়াবী বলে জানবে। শঙ্করাচার্য বলেছেন, জগৎ সৃষ্টির অন্তরালে আছে এই মায়াশক্তি।

মায়া কথাটির অর্থ কী? এজন্য শঙ্কর ভ্রমজ্ঞানের উপমা ব্যবহার করেছেন। অন্ধকারে আমরা একটি দড়িকে সাপ বলে মনে করি। একে বলে ভ্রমজ্ঞান। দুই-এর ক্ষেত্রে কোনো না কোনো অধিষ্ঠান বা সত্যবস্তু থাকে। এক্ষেত্রে রজ্জু হল অধিষ্ঠান। এই অধিষ্ঠানের ওপর অন্য কিছুর আবির্ভাব অর্থাৎ সর্পকে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। অজ্ঞানতার জন্য এমন ঘটনা ঘটে থাকে।

অজ্ঞানতা অধিষ্ঠানকে আবৃত করে না, নতুন কিছু সৃষ্টিও করে। যেমন—অজ্ঞান রজ্জুকে ঢেকে দিয়ে সর্পের প্রকাশ ঘটায়, জগতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও আমাদের এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে। এক এবং অদ্বিতীয়

ব্রহ্ম আমাদের অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হন। তখন আমরা জগৎকে দেখতে পাই। তাই মায়া এবং অজ্ঞান সমার্থক।

জগতের ক্ষেত্রে ব্রহ্মের মায়াশক্তি জগৎ সৃষ্টি করে, অজ্ঞানতার জন্য আমরা সেই জগৎকে দেখতে পাই। ব্রহ্মকে এবং শক্তিকে যদি আমরা ভিন্ন বলে মনে করি তাহলে অদ্বৈতবাদ আর থাকে না। তাই শঙ্কর বলেছেন অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তি যেমন অভিন্ন, ব্রহ্ম এবং তার মায়াশক্তিও তেমনি অভিন্ন।

ব্রহ্ম কি তবে সৃষ্টি ক্ষমতার অধিকারী? নাহলে তিনি নির্গুণ হবেন কী করে! শঙ্কর এক্ষেত্রেও যথাযথ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যাদুকরের যাদুর ফাঁকি যে বোঝে না, সে যাদুশক্তিকে সত্যি বলেই জানে আর যাদুকরের ফাঁকি যে বোঝে সে যাদুশক্তিকে শক্তি বলে মনে করে না। আমরা যারা ব্রহ্মের স্বরূপকে দেখতে পারি না তারা তাঁকে স্রষ্টা বলে মনে করি। আর যিনি ব্রহ্মের স্বরূপ জানেন তিনি বোঝেন যে ব্রহ্ম স্রষ্টা নন, সৃষ্টি মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিকে বলে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে বলে পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রথমটি অজ্ঞানজনিত দৃষ্টি এবং দ্বিতীয়টি হল জ্ঞানের দৃষ্টি। আবার শঙ্করাচার্য প্রাতিভাষিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন। এই দৃষ্টি ব্যক্তিকেন্দ্রিক অজ্ঞানতাজনিত। ব্যবহারিক দৃষ্টির সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার। শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলতে ঠিক কী বলতে চেয়েছেন?

শঙ্করাচার্য বিশ্বাস করেন যে, ব্রহ্ম আসলে নির্গুণ তবে অজ্ঞানতার জন্য ব্যবহারের দৃষ্টিতে আমরা তাকে সগুণ বলে মনে করি।

শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলেছেন, জগৎ পারমার্থিক দৃষ্টিতে থাকে না। তাই জগৎ পারমার্থিক সত্য নয়। প্রাতিভাষিক দৃষ্টিতে প্রাপ্ত বস্তু অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের চেয়ে জগতের অস্তিত্ব অনেক দীর্ঘস্থায়ী। ব্রহ্মের স্বরূপ না জানা পর্যন্ত আমরা ভাবি জগৎ একটি সত্য সত্তা। একে বলে ব্যবহারিক সত্য। তাই জগৎ মিথ্যা এই কথার অর্থ জগৎ পারমার্থিক সত্য নয়। আবার প্রাতিভাষিকও নয়। শঙ্কর-দর্শনে যা কখনোই প্রতিভাত হয় না তাই হল অসৎ। জগৎ প্রতিভাত হয়, তাই জগৎ অসৎ হতে পারে না।

শঙ্কর বিশ্বাস করতেন অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূর করতে পারলে আমরা পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করতে পারব। তখন 'জগৎ মিথ্যাত্ব' এই বিষয়টি আমাদের কাছে উপলব্ধ হবে। এর জন্য বেশ কিছু প্রস্তুতি দরকার। এই প্রস্তুতি কীভাবে আমরা অর্জন করব? আমাদের মধ্যে সেই বোধ জাগ্রত করতে হবে যে বোধ দ্বারা আমরা বুঝতে পারব যে নিত্য এবং অনিত্য বস্তু ভিন্ন। ইহলোক এবং পরলোকের সমস্ত কর্মফল এবং ভোগের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করতে হবে। বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয়ের সংযম দেখাতে হবে। মুক্তি লাভের জন্য আমাদের মনে প্রবল ইচ্ছার জন্ম হবে। এই অবস্থায় একজন যাবেন ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কাছে। গুরু তার কানে কানে বলবেন 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম। সত্যসন্ধী এই বাক্যের মনন ও নিদিধ্যাসন করবেন। পরবর্তীকালে তিনি উপলব্ধি করবেন 'সোহহম' অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম, তখন তিনি অনির্বচনীয় আনন্দের জগতে পৌঁছে যাবেন।

জীবিত অবস্থায় মুক্তিকে জীবন্মুক্তি এবং মৃত্যুর পর মুক্তিকে বিদেহ মুক্তি বলে। শঙ্কর বলেছেন—যিনি ব্রহ্মের আসল স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন তিনি ব্রহ্ম হয়ে গেছেন। শঙ্কর-এর মতে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে একই স্বরূপ লুকিয়ে আছে।

রামানুজাচার্য উপনিষদ এবং ব্রহ্মসূত্রের ভিন্ন ভাষ্য রচনা করেছেন। তিনি ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য হিসাবে তুলে ধরেছেন। এই ব্রহ্ম নিখিল দোষমুক্ত এবং সমস্ত কল্যাণগুণের আকর বাসুদেব নামে আখ্যাত। এই ব্রহ্মের মধ্যে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নেই। কিন্তু স্বগত ভেদ আছে। যেমনভাবে উর্ণনাভ নিজের দেহ থেকেই জাল সৃষ্টি করে ঠিক সেইভাবে ব্রহ্ম তার অচিৎ অংশ থেকে জড়পদার্থ সৃষ্টি করে। তাই জগৎকে

আমরা মিথ্যা বলব না। আত্মার অণুপরিমাণ এবং ব্রহ্মের চিৎ অংশের প্রকাশ। প্রত্যেক আত্মা তার কর্ম অনুসারে এক-একটি দেহের অধিকারী হয়।

যেহেতু আমাদের মধ্যে অজ্ঞানতা আছে তাই কর্মসঞ্জাত বন্ধনের সৃষ্টি। অজ্ঞানতা হেতু আত্মার দেহের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন কর্মে ব্যাপৃত হয়। তাই তাকে বিভিন্ন জন্ম পরিগ্রহ করতে হয়। কর্মফল নষ্ট করতে হলে বেদনির্দিষ্ট কর্ম করা উচিত। তখন আমাদের মনে এমন এক ধারণা আসবে যখন আমরা ব্রহ্মের সর্বশক্তিমান সত্তা সম্পর্কে অবহিত হব। ব্রহ্মের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে যদি তার উপাসনা করা যায় তাহলে তিনি তুষ্ট হয়ে কৃপা করেন। এই কৃপালাভ করার সঙ্গে সঙ্গে জীব তার সমস্ত জাগতিক দুঃখের জগৎ থেকে মুক্ত হতে পারবে। তখন আত্মার আর পুনর্জন্ম হবে না।

রামানুজ যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে। রামানুজের মতে এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম একমাত্র সত্য হলেও এই ব্রহ্ম চিৎ এবং অচিৎ গুণবিশিষ্ট। তাই তাঁর অদ্বৈত তত্ত্ব বিশিষ্ট, অ-বিশিষ্ট নয়।

পাঠবিধি অনুসারেও উপনিষদকে সবার পরে স্থান দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের মানুষ জীবনকে চারটি আশ্রম বা পর্বে বিভক্ত করেছিলেন—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। এই পর্ব-বিভাজন বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারব সে যুগের মানুষ কতখানি বাস্তববোধসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা জানতেন পৃথিবীতে মানুষের জীবনের সময়সীমা বড়ো সংক্ষিপ্ত! যাতে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ইতিবাচক এবং সৃজনাত্মক কাজে লাগানো যায় তাই এই পর্ব-বিভাজন। আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্বের আলাদা আলাদা মূল্য আছে। একটি পর্ব পরবর্তী পর্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জীবনের প্রারম্ভকাল হল ব্রহ্মচর্য। এই পর্যায়ে একজন ছাত্র অধ্যয়নকে তপস্যাস্বরূপ জ্ঞান করবে। গুরুগৃহে থেকে সমস্ত কামনা-বাসনাকে প্রশমিত করে কঠিন কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে অধ্যয়নে মগ্ন থাকবে। পরবর্তীপর্বে সে সুখী সংসার-জীবন পালন করবে। এই পর্বটিকে গার্হস্থ্য বলা হয়ে থাকে। পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করলে সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে বসবাস করবে। একেই বলে বানপ্রস্থ। অবশেষে সে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য নিজেকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রস্তুত করবে। তবে এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, তা হল সকলেই কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করার অধিকার পান না। যাঁর মধ্যে তীব্র ঐকান্তিকতা এবং ধারাবাহিক নিষ্ঠা আছে তিনিই সন্ন্যাস লাভের অধিকার অর্জন করতে পারবেন।

জীবনের কোন পর্যায়ে মানুষ কোন ধরনের বৈদিক সাহিত্য পাঠ করবে সেই বিষয়েও সমাজবিদরা নির্দিষ্ট নিয়মনীতি রচনা করেছিলেন। তাঁরা বলেছেন ব্রহ্মচর্য পর্যায়ে আমরা সংহিতা পাঠ করব।

অভিভালক্ষণাদ্বৈতের মতে একপ্রকার অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। তবে এই অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ন্যায়ের অনেক তত্ত্বের সংগতি লক্ষণীয়। সাংখ্য দর্শনে পুরুষ এবং প্রকৃতি বিষয়ে যে কথা বলা হয়েছে সেই 'ধী' তত্ত্বটিও এখানে উচ্চারিত হয়েছে। শঙ্কর ঘোষণা করেছেন এক ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। আবার বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেছেন, সাঙ্খ্যের প্রকৃতি যেমন বৈচিত্রের কারণ বা ভিত্তি স্বরূপ বিবেচিত হয়, ঠিক তেমনই পুরুষ ও প্রকৃতির ভিত্তি অদ্বৈত তত্ত্ব বা ব্রহ্মের প্রধান। নৈয়ায়িকদের বহুতত্ত্বের ভিত্তিও একই রকম। তিনি বিশ্বাস করেন বহুত্ব মিথ্যা নয়, এক এবং বহু সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিজ্ঞান ভিক্ষু শঙ্করের মতই জ্ঞানবাদী ছিলেন। তিনিও মনে করতেন বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারাই আমরা চরম মোক্ষের পথে যেতে পারি।

এখানে আর-একটি কথা মনে রাখতে হবে, তা হল, উপনিষদ বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি হলেও উপনিষদকে আমরা কখনো বেদান্ত দর্শনের একমাত্র ভিত্তিস্বরূপ স্বীকার করব না। উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং বিভিন্ন ভাষ্য-সহ ব্রহ্মসূত্র—এই তিনটিই হল বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি। এদের যথাক্রমে শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান এবং ন্যায়প্রস্থান বলা হয়। তিনটি একত্রে প্রস্থানত্রয় নামে চিহ্নিত। বেদান্ত দর্শনের মূল ভিত্তি এই তিনটি বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রুতিপ্রস্থানের মুখ্য হল উপনিষদ, স্মৃতিপ্রস্থানে ভগবদগীতা এবং ন্যায়প্রস্থানে বিভিন্ন উপনিষদের মূল শিক্ষা প্রতিভাত হয়েছে। এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে, বেদান্ত

দর্শনের মূল হল উপনিষদিক পাঠ, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

শঙ্করাচার্যের দর্শনচিন্তা

শঙ্করাচার্য ভারতীয় দর্শনের যে শাখাটি নিয়ে সারাজীবন ধরে অন্বেষণ করেছেন সেটি হল অদ্বৈতবাদ। শঙ্করাচার্যের জীবনব্যাপী সাধনার মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশের মানুষের কাছে ভারতীয় দর্শনের এই শাখাটি সবথেকে বেশি গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। শঙ্করাচার্যের পথ অনুসরণ করে পরে আরও অনেক ভারত-সন্ন্যাসী বিদেশে গিয়ে এই শাখাটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেছেন। আর এইভাবে শঙ্করাচার্য ও অদ্বৈতবাদ পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। যদিও প্রাক-শঙ্কর যুগে অদ্বৈতবাদের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু অদ্বৈতবাদের বিশ্বব্যাপী প্রচারের জন্য আমরা শঙ্করাচার্যকেই উল্লেখ করব। শঙ্করাচার্যের দর্শন-ভাবনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে বেদান্ত দর্শন বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার। না হলে আমরা ভগবান শঙ্করাচার্যের দর্শন-ভাবনার প্রতীতি এবং স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারব না।

বেদান্ত বলতে বেদের অন্ত বা শেষকে বোঝায়। একসময়ে উপনিষদ এবং বেদান্ত সমার্থক বলে পরিগণিত হত। পরবর্তীকালে উপনিষদ থেকে উদ্ভূত সবকটি চিন্তাকেই বেদান্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে কেন আমরা উপনিষদকে বেদের সমাপ্তি বা অন্ত বলে চিহ্নিত করেছি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে তিনটি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা দরকার। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে যে তার্কিক চিন্তন লুকিয়ে আছে তার ওপর নির্ভর করেই বেদান্তকেই বেদের অন্ত বা শেষ বলা হয়।

প্রথমে আমরা বৈদিক যুগের সাহিত্যের কালানুক্রমিক বিচার করব। ভারতবর্ষের প্রত্নবিজ্ঞানী এবং ইতিহাসবিদরা নানা সাক্ষ্যপ্রমাণ সহযোগে বৈদিক যুগের কালানুক্রমিক সূচি তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন। এই কালানুক্রমিক বিচার অনুসারে বৈদিক সাহিত্য তিন শ্রেণিতে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ। সংহিতা বলতে বৈদিক মন্ত্রের সমাহারকে বোঝানো হয়ে থাকে। সংহিতা চার প্রকার—ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। বিশিষ্ট কবিরা সংহিতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে। সংহিতা হল বৈদিক যুগের প্রথম সাহিত্য।

পরবর্তী পর্যায়ে আছে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের পাতায় পাতায় দৈনন্দিন জীবনযাপনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য বিভিন্ন যাগযজ্ঞের প্রক্রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পুরোহিতরা ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুক্ত। কারণ-ক্রমে ব্রাহ্মণ বৈদিক সাহিত্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে।

বৈদিক যুগের সর্বশেষ সাহিত্য হল উপনিষদ। উপনিষদের পাতায় চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাব সেখানে মানব-মনীষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছড়ানো আছে। বৈদিক যুগের মহাত্মা ঋষিরা জীবনব্যাপী সাধনার মাধ্যমে উপনিষদ রচনা করেন। তাই দার্শনিকদের আমরা উপনিষদের উদ্‌গাতা, প্রতিষ্ঠাতা এবং পালনকারী বলতে পারি। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে এই তিন ধরনের সাহিত্যই হল শ্রুতি-সাহিত্য। অর্থাৎ আগে এদের লিখিত কোনো রূপ ছিল না। বংশ পরম্পরায় এরা গুরু থেকে শিষ্যের মাধ্যমে শ্রুতিযোগে সমাহিত হয়েছে। এই তিন ধরনের সাহিত্যকেই ব্যাপকতার অর্থে বেদ বলা হয়। যেহেতু উপনিষদ বৈদিক যুগের একেবারে শেষের পর্যায়ের রচনা তাই একে বলে বেদান্ত।

আবার, বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধ্যে নিষ্প্রপঞ্চ ধারণার একটি পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধারণাটি প্রকাশিত হয়েছে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং গার্গীর কথোপকথনের মাধ্যমে। গার্গী এই বিশ্বের ভিত্তি এবং এই বিশ্বের অধিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে চেয়ে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যে অধিষ্ঠানের কথা বলেন সেখানে তিনি কিন্তু কোনো ইতিবাচক বর্ণনা দেননি। তিনি সেই বিরাট শক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন যে, সেটি স্থূল নন, সূক্ষ্ম নন, দীর্ঘ নন, হ্রস্ব নন। তবে তিনি শূন্য নন। কারণ শূন্য কোনো জগতের অধিষ্ঠান হতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্য বারে বারে এই কথার ওপর জোর দিয়েছেন। নাসদীয় সূক্তে যে অনির্বচনীয় সত্তার কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য বর্ণিত এই সত্তার মিল চোখে পড়ে।

উপনিষদে চরম সত্তাকে কখনো বা আত্মা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা ঐতরেয় বা বৃহদারণ্যক উপনিষদের কথা বলব। কখনো তিনি হলেন ব্রহ্মন যেমন—মুণ্ডক, ছান্দোগ্য উপনিষদ। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদের কোনো কোনো সূক্তে তাঁকে সৎ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে ভারতীয় উপনিষদ স্বীকার করেছে যে জীবাত্মা এবং সর্বভূতাত্মা বা ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। তাঁদের মধ্যে কোনো বিভিন্নতা নেই। আত্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শন বারবার ঘোষণা করেছে আত্মা ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান হল অপরাবিদ্যা। সেই কারণে উপনিষদিক ঋষিরা আমাদের কাছে একটি সুস্পষ্ট বার্তা পাঠিয়ে বলেছেন—'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ আত্মাকে জানতে হবে। যদি কোনোভাবে আমরা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি তাহলেই প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারি।

উপনিষদের পাতায় পাতায় আবার আত্মার পাঁচটি কোষের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। আত্মা হল অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়। একে একে আমরা এই পাঁচটি বিষয়ের কথা বলব। আমাদের আলোচনা শুরু হবে অন্নময় আত্মা থেকে।

আত্মাকে আমরা দেহের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করি। পরবর্তীকালে আমাদের মনে হয় প্রাণই হল আত্মা। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন মনই হল আত্মার প্রতিভূ। চিন্তাশীল মানুষ বিজ্ঞানকে আত্মা বলেন। অনেকে বলেন আত্মা চিরআনন্দময় জগতে বাস করেন বলে তিনি আনন্দময়। আনন্দময় কোষের দ্বারা সর্বদা আবৃত থেকে আত্মা নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করে। উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন যখন আমরা আত্মাকে আনন্দময় বলে উপলব্ধি করতে পারব তখন জগৎসংসার সম্পর্কে আর কোনো ভয় আমাদের থাকবে না। এই আনন্দ হল আত্মার আসল স্বরূপ। তবে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে যথেষ্ট জ্ঞান এবং সদিচ্ছা থাকা দরকার।

আত্মা যেহেতু আনন্দের অংশবিশেষ তাই এই পৃথিবীর সব কিছুই আনন্দময়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ী দেবীকে এই বিষয়ে নানা উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।' অর্থাৎ জীবন যে এত প্রিয় তার কারণও আত্মার আনন্দ। জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে ইতিবাচক কাজে নিয়োগ করতে হয়। আত্মায় আনন্দ আছে বলেই আমরা এই জগতে কেউ স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করতে চাই না। মৃত্যু সদাসর্বদা আমাদের কাছে ভয়ের প্রতীতি স্বরূপ বিরাজ করে। আনন্দময় আত্মাকে উপলব্ধি করতে হলে আত্মোপলব্ধি দরকার। আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বস্তুর প্রতি অকারণে আকৃষ্ট হই বলে চরম আনন্দের জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পাই না। এই প্রসঙ্গে কস্তুরী মৃগর কথা বলা যেতে পারে। কস্তুরী মৃগ জানে না যে তার নাভিদেশই হল গন্ধের উৎস। সে বিভিন্ন অরণ্যে গিয়ে সেই গন্ধের উৎস খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে যায়। আমরাও আত্মার আনন্দকে ভুলে সুখের নেশায় বিষয়ের আনন্দের দিকে ছুটে যাই। এর ফলে দুঃখ আসে এবং নানা বন্ধনের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। যখন আমরা বিষয়বাসনা ত্যাগ করে আত্মস্থ হতে পারব তখন মুক্তির মহামন্ত্র আমরা শ্রবণ করতে পারব।

উপনিষদে সৃষ্টির সত্যতা এবং অসত্যতা—এই দুটি বিষয়কেই স্বীকার করা হয়েছে। নিষ্প্রবঞ্চ মতে সৃষ্টি মিথ্যা আবার সপ্রবঞ্চ মতে সৃষ্টি হল সত্য।

ব্রহ্মসূক্তে বিভিন্ন ভাষ্য প্রচলিত আছে এবং এক-একটি ভাষ্যকে অনুসরণ করে এক-একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে শঙ্করাচার্যের শারীরিক ভাষ্য এবং রামানুজের শ্রীভাষ্য সবথেকে প্রসিদ্ধ সূক্ত। শঙ্করাচার্য নিষ্প্রপঞ্চবাদের অনুসরণকারী। আবার রামানুজ অপ্রপঞ্চ মতবাদের প্রবক্তা। শঙ্করের মতবাদকে বলা হয় অদ্বৈতবাদ।

এই প্রসঙ্গে গীতার একটি ধ্যানের কথা বলা যেতে পারে। এই ধ্যানে বলা হয়েছে—

'সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ,
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা
দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ'।

এই সংস্কৃত শ্লোকটির বাংলা করলে অর্থ হয় উপনিষদসমূহকে আমরা গাভীর সঙ্গে তুলনা করতে পারি। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেইসব গাভীর দোগ্ধা স্বরূপ বিরাজমান। অর্জুন হলেন বৎস। মহাদুগ্ধ হল অমৃতময়ী গীতা এবং সুধীজন এই দুগ্ধ পান করছেন।

এই শ্লোকটির মধ্যে দিয়ে উপনিষদের গুরুত্বের কথা বোঝানো হয়েছে। তাই বেদান্তের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে সংহিতা এবং উপনিষদের বিষয়গুলিকে আত্মস্থ করা দরকার। আমরা জানি পূর্ব-মীমাংসা হল ব্রাহ্মণভিত্তিক। কিন্তু উত্তর-মীমাংসা বেদের মন্ত্রভাগ বা সংহিতা। তাই এটি পড়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। উপনিষদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধ্যানধারণা না থাকলে বেদান্ত অর্থহীন। সেই কারণে আগে আমরা সংহিতা এবং উপনিষদের মূল কথার ওপর আলোকপাত করব।

সংহিতায় প্রথমদিকে অগ্নি, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থায় মানুষকে অসহায় হয়ে প্রাকৃতিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল থাকতে হত। তখনো পর্যন্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি হয়নি। অরণ্যচারী মানুষ তাই প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে তুষ্ট করার জন্য নানা ধরনের পূজার প্রবর্তন করে। এই ভাবেই এক-একজন করে দেবতার আবির্ভাব হয়। সংহিতার প্রথম দিকে দেখা গেছে মানুষ পরম শ্রদ্ধাভরে দেবতাদের উদ্দেশে ঘৃতাহুতি নিবেদন করছে। তখন একটি অদ্ভুত প্রথা ছিল, যখন মানুষ যে দেবতার স্তব করতেন তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা হত। কিন্তু সব দেবতাই যে এক সৎ বা সত্তার বিভিন্ন অংশ এই বোধ বৈদিক ঋষিদের মধ্যে ছিল। ঋক সংহিতায় বলা হয়েছে—'একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি...'। অর্থাৎ এক থেকে বহু দেবতার উৎপত্তি।

অনেকে বলে থাকেন সংহিতায় ঈশ্বর বা দেবচিন্তার মধ্যে একটি লক্ষণীয় বিবর্তন চোখে পড়ে। প্রথম দিকে সংহিতার পাতায় পাতায় বহু দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু ধীরে ধীরে সেকালের মুনি, ঋষিরা একের মধ্যে বহুর বিষয়টি উপস্থাপনা করেছেন। সর্বশেষ পর্যায়ে এক এবং অদ্বিতীয় সত্তার স্বীকৃতি পেয়েছে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বৌদ্ধিক আলোচনা করলে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে মানুষের চিন্তন এবং মনন যত উন্নত হয়েছে, মানুষ যতই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উপর নির্ভর করতে শিখেছে, তার দেবতা সংক্রান্ত চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে।

ঋক সংহিতায় যে সমস্ত দেবতাকে এক সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা নয়, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে একটি মাত্র সত্তায় বিধৃত এবং আবৃত সে কথাও জোরের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরুষ সূক্তে বিশ্বভুবন ব্যাপী এবং বিশ্ব অতিরিক্ত এক বিরাট পুরুষের কল্পনা করা হয়ে থাকে। বলা হয়েছে সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ পুরুষ সর্বত্র বেষ্টন করে আছেন। তারপর দশ আঙুল পরিমাণে বিশ্ব অতিক্রম করেও আছেন। ইহলোক, পরলোক, গ্রহ, নক্ষত্র, স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর, সজীব, নির্জীব সবকিছুই হল এই বিশাল পুরুষের অংশমাত্র। অংশী রূপে তিনি কিছু পরিমাণে সবকিছু অতিক্রম করেও আছেন।

আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞান এমন এক বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের শেষ কোথায় তা নিয়ে আজও জোতির্পদার্থ বিজ্ঞানীরা কোনো সর্বজন স্বীকৃত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেননি। বিশ্ব একাধারে অসীম এবং সসীম—এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ ক্রমপ্রসারণশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণা করেছেন। তাই আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে আমাদের বৈদিক সাহিত্যের পাতায় পাতায় যেসব আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে তার অন্তরালে আধুনিক বিজ্ঞানের ধ্যানধারণা বিদ্যমান। এতেই প্রমাণিত হয় সে-যুগের মুনি ঋষিরা কত উঁচু মননের অধিকারী ছিলেন।

আর-একটি মন্ত্রে এক অপুরুষ অনির্বচনীয় সত্তার কল্পনা পাওয়া যায়। এই মন্ত্রটিকে নাসদীয় সূক্ত বলে। এই সত্তা সৎ নন, আবার তাকে অসৎ বলেও অভিহিত করা সম্ভব নয়। তিনি আকাশ অথবা স্বর্গ নন। এই সত্তাকে আমরা কোনো সূক্ত দ্বারা বর্ণনা করতে পারি না। তিনি সকল বর্ণনার অতীত। পরবর্তীকালে সগুণ ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্মের যে ধারণা আমাদের আধ্যাত্মিক চিন্তনকে আবৃত করেছিল তা পুরুষ সূক্ত এবং নাসদীয় সূক্তের মধ্যে পাওয়া যায়। পুরুষ সূক্তে যে বিশাল পুরুষ সত্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি স্থূল-

জল-অন্তরীক্ষ মহাবিশ্বের অভ্যন্তরে ও বাইরে বিদ্যমান। পরবর্তীকালে তিনি সগুণ ব্রহ্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন, আর নাসদীয় সূক্তে যে অনির্বচনীয় সত্তার কথা বলা হয়েছে যার রূপ, রস, লাবণ্য কোনোকিছুই আমরা বর্ণনা করতে পারি না, তিনিই হলেন নির্গুণ ব্রহ্ম।

উপনিষদে এই দু-ধরনের চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথমটিকে বলে সপ্রপঞ্চ ধারণা এবং দ্বিতীয়টি হল নিষ্প্রপঞ্চ ধারণা। ছন্দোগ্য উপনিষদে শাণ্ডিল্য বিদ্যা অধ্যায়ে সপ্রপঞ্চ ধারণার সুস্পষ্ট প্রকার পরিলক্ষিত হয়। এখানে ব্রহ্মকে তজ্জলিন বলে অভিহিত করা হয়েছে। তৎ শব্দের অর্থ তিনি, জ শব্দের অর্থ জগতের জন্ম দেন, লি শব্দের অর্থ তাঁতে জগৎ লয় হয় এবং অন শব্দের অর্থ হল তিনিই জগৎ ধারণ করে আছেন।

এই উপনিষদটি পড়লে আমরা বুঝতে পারব কেন ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা, রক্ষক এবং সংহারক হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। জীবাত্মার সঙ্গে এই ব্রহ্ম যে অভিন্ন সে-কথাও কল্পনা করা হয়েছে। একে সপ্রপঞ্চ ধারণা বলা যেতে পারে। এই ধারণার সঙ্গে পুরুষ সূক্তে বর্ণিত ওই পুরুষের সদৃশতা পরিলক্ষিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় মুনি ঋষিরা ধীরে ধীরে কীভাবে চিন্তনের এক-একটি স্তরকে অতিক্রম করে পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁদের বৌদ্ধিক বিকাশ যে কত আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত ছিল তারও পরিচয় লুকিয়ে আছে এই জাতীয় ধ্যানধারণার বিবর্তনের মধ্যে।

সংহিতার পাতায় পাতায় যেসব সূক্ত এবং স্তোত্রগুলি আছে সেগুলি পাঠ করা ছাত্রদের অবশ্য কর্তব্য। এই স্তোত্রগুলি তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে আলোকিত করে তোলে। গার্হস্থ্য জীবনে ব্রাহ্মণ পাঠ করা উচিত। ব্রাহ্মণ নির্দিষ্ট যাগযজ্ঞ, নিয়মনীতি-সহ পালন করলে গার্হস্থ্য জীবনের কোনো সমস্যা থাকে না। যখন মানুষ জাগতিক সমস্ত বাসনা-কামনা পরিত্যাগ করে অরণ্য-অভ্যন্তরে গিয়ে বানপ্রস্থে দিন কাটান তখন তাঁকে উপনিষদ পাঠ করতে হবে। এইসময় তিনি দার্শনিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন। উপনিষেদিক চেতনা তাঁর মধ্যে পরিণত হবে। তাই জীবন-সন্ধ্যায় উপনিষদ পাঠের কথা বলেছেন ভারতীয় ঋষি এবং শাস্ত্রকাররা। যেহেতু বৈদিক সাহিত্যগুলির মধ্যে উপনিষদ সর্বশেষে পাঠ করা হয় তাই একে বেদান্ত বলা হয়।

বৈদিক চিন্তার পরিপূর্ণ বিকাশ এবং পরিণতি উপনিষদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। উপনিষদের মধ্যে যে মহত্তম চেতনা লুকিয়ে আছে তা বিশ্বের অন্য কোনো আধ্যাত্মিক সাহিত্যে প্রাপ্তব্য নয়। উপনিষদ যখন রচিত হয়েছিল তখন পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে উপনিষদ এক বিস্ময়কর রচনা। তাই বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ার বলেছেন—সমগ্র জগতে উপনিষদ পাঠের মতো উপকারী এবং উন্নয়নকারী অন্য কোনো পাঠই নেই। উপনিষদ একজন মানুষকে জীবনে শান্তি দেয় এবং মৃত্যুতেও শান্তি দেয়।

যেহেতু বৈদিক চিন্তার চরম প্রকার উপনিষদের মধ্যে পাওয়া যায় তাই উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়।

অনেকে আবার বেদ বলতে জ্ঞান এবং বেদান্ত বলতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অংশকে উদ্দিষ্ট করেছেন। যেহেতু উপনিষদ হল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান তাই উপনিষদ হল বেদান্ত।

আভিধানিক অর্থে উপনিষদ বলতে বোঝায় যা মানুষকে ঈশ্বরের সন্নিকটস্থ করে অথবা যা মানুষকে গুরুর কাছে নিয়ে যায়। উপাসনা বা গুরুর কাছে অবস্থান করাই হয় শিষ্যের জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে নিয়মিতভাবে উপনিষদ পাঠ করতে হবে। উপসৎ এই ক্রিয়াটি উপনিষদের মধ্যে বারবার প্রযুক্ত হয়েছে। উপনিষদকে বেদের রহস্য বা গূঢ় বিবেচনা করা হয়েছে। তাই উপনিষদের আর-এক নাম বেদ-উপনিষদ বা বেদ-রহস্য। যেহেতু বেদের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক রহস্য লুকিয়ে আছে তাই সর্বজন সমক্ষে বেদপাঠ করা হয় না। প্রাচীন ভারতে শুধুমাত্র শিষ্যের কাছেই বেদ রহস্য পাঠ করা হত। যে সমস্ত দার্শনিক সমস্যা উপনিষদে আলোচিত হয়েছে তাদের উত্তর কিন্তু একইভাবে সমস্ত উপনিষদে দেওয়া হয়নি। তাই বিভিন্ন উপনিষদের মধ্যে একটি সংযুক্তিকরণের প্রয়োজন ছিল। বাদরায়ণ ব্রহ্ম সুত্র বা বেদান্ত সূত্র এবং শারীরিক সুত্র বা শারীরক মীমাংসা নামে সেই সংগ্রহগুলি রচিত হয়। বাদরায়ণের গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য

ছিল উপনিষদের মূল বক্তব্যগুলিকে প্রকাশ করা। এই গ্রন্থের চারটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়টিকে বলে সমন্বয় অধ্যায়। এখানে বিভিন্ন শিক্ষার মধ্যে কী করে সমন্বয় সাধিত হতে পারে সেকথা আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপনিষদ শিক্ষার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত মতবাদ এবং যুক্তিতর্কসিদ্ধ ধারণা অবিরোধ প্রদর্শিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হয়েছে মুক্তি সাধন পথ এবং সেই সাধন পথে উন্নীত হওয়ার বিভিন্ন পন্থা। চতুর্থ অধ্যায়ে সাধনলব্ধ ফল নিয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বাদরায়নের সূত্রগুলি খুবই ছোটো, সেখানে বিস্তৃত বিশ্লেষণের জায়গা নেই। তাই এই সব সূত্রের ভিতর যে অর্থ লুকিয়ে আছে সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ব্যক্তি ব্রহ্ম সূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করেন। এই পর্বে আমরা শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পেয়েছি। তাঁদের সৃজনশীল সাহিত্যসম্ভারের ওপর নির্ভর করে নানা বেদান্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত ভাষ্যের পরিবর্তন, পরিবর্জন এবং বিবর্তনও চোখে পড়ে। এইভাবে বিপুল আকৃতির বেদান্ত সাহিত্যের জন্ম হয়েছে।

বেদান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কিন্তু নানা ধরনের মতপার্থক্য চোখে পড়ে। এই মতপার্থক্যের মূল কারণ নিহিত আছে জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। এক-একজন বিশিষ্ট সাধক এ বিষয়ে এক-এক ধরনের মতবাদ প্রচার করেছেন। তাঁদের একজনের মতবাদের সঙ্গে অন্যজনের মতবাদের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন অধ্যাচার্য বলেছিলেন জীব এবং ব্রহ্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই মতবাদকে দ্বৈতবাদ বলা হয়। শঙ্কর আবার জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অভিন্নতা অনুসরণ করে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামানুজের মতো এক বিশিষ্ট বৈষ্ণবাচার্যের মতে জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ গুণের সঙ্গে গুণীর সম্বন্ধের সমতুল্য। একে বলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। বল্লভ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ অংশীর সঙ্গে অংশের সম্পর্কের মতো। নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদ প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন ব্রহ্ম স্বাধীন এবং জীব ব্রহ্মের ওপর নির্ভরশীল বলে জীব পরাধীন। জীব পরাধীন বলে স্বাধীন ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন অর্থাৎ দ্বৈত। আবার জীব ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নয় বলে সে অভিন্ন বা অদ্বৈত। মধ্বাচার্য বস্তুর সঙ্গে বস্তুর, বস্তুর সঙ্গে জীবাত্মার এবং জীবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং জগতের সঙ্গে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের নিত্য ভেদাভেদকে স্বীকার করেছেন। এই মতের নাম দ্বৈতবাদ। বলদেব বিদ্যাভূষণ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ প্রচার করেছেন। এই মত গ্রহণ করেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্বন্ধ, অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্পর্কে তিনটি প্রকাশমাত্র। আমরা জানি ঈশ্বরের মধ্যে তিনরকম শক্তি আছে— জীবশক্তি, মায়াশক্তি এবং স্বরূপশক্তি। জীবশক্তি জীব রূপে প্রকাশিত হয়েছে। মায়াশক্তি হল জগতের উপাদানের কারণ। স্বরূপ শক্তি জগতের নিমিত্ত কারণ। শক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধকেই আমরা ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলে থাকি। যেহেতু আমরা ভেদ এবং অভেদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারি না তাই এই সম্বন্ধকে অচিন্ত্য বা অচিন্তনীয় বলা হয়।

এঁদের মধ্যে শঙ্করের কথা আলাদাভাবে আলোচনা করা উচিত। কারণ তিনি বেদান্ত দর্শনকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন। তিনি জ্ঞানবাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তিলাভ করা সম্ভব। আবার তদানীন্তন অন্য মহাপুরুষরা ছিলেন ভক্তিবাদী। এই তালিকাতে রামানুজ, বল্লভ, নিম্বার্ক, মধ্ব এবং বলদেব আছেন। তাঁদের বিশ্বাস ও ভক্তির মাধ্যমে আমরা যে কোনো কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পারি। শঙ্কর বলেছেন ঈশ্বর সগুণ, ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নির্গুণ এবং পরমার্থতঃ সগুণ বা ঈশ্বর। রামানুজ, বল্লভ, নিম্বার্ক, মধ্ব এবং বলদেব সকলেই ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলে থাকেন। শঙ্করের মতে মায়া মিথ্যা এবং জগৎ মিথ্যা। ভক্তিবাদীরা বলে থাকেন মায়া হল ঈশ্বরের শক্তি। তাই এই জগৎ কখনো একেবারে মিথ্যা বা শূন্য হতে পারে না।

অধ্যাত্মবাদীরা মনে করে থাকেন যে, ঔপপত্তিক দিক থেকে এক এবং অদ্বিতীয় নির্গুণ ব্রহ্মের আত্যন্তিক সত্তা বিরাজমান। তাঁরা জগৎকে মিথ্যা প্রপঞ্চ স্বরূপ স্বীকার করেন। তাঁরা জানেন জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে এক ঐক্য বিদ্যমান। তাঁদের বিশ্বাস মুক্তিতে জীবের ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি লাভ হয়। এই ভাবে আমরা

ব্যবহারিক দিক থেকে পরিপূর্ণ বৈরাগ্য লাভ করতে পারি, জ্ঞানই আমাদের কর্ম-সন্ন্যাসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, এই বিষয়গুলি অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা নানাভাষ্যে নানাভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন।

এই জাতীয় মতবাদের উৎস সন্ধানে গবেষক ও পণ্ডিতরা জীবনব্যাপী সাধনায় মগ্ন ছিলেন। তাঁদের সাধনালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করলে জানা যায়, গৌরপাদকারীকায় এক মতবাদ প্রথম উল্লিখিত হয়েছিল। মাণ্ডুক্য উপনিষদের মূল বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করাই ছিল এই কারিকার মুখ্য কাজ। এই কারিকার বিভিন্ন সূত্র এবং শ্লোকে অদ্বৈতবাদের মূল কথা উপস্থাপিত হয়েছে। অনেক গবেষক এই কারিকাকে শঙ্কর মতের ভিত্তি হিসাবে স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা সুপ্রসিদ্ধ আচার্য ভর্তৃহরির কথা বলব। তিনি 'বাক্যপদীয়' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাতে অদ্বৈতবাদের কথা আলোচিত হয়েছে। আচার্য শঙ্করাচার্য যে-সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে বেদান্তসূত্র প্রধান। বেদান্ত সূত্রের মধ্যে যে ভাষ্য প্রযুক্ত হয়েছে তার মধ্যে আছে তার্কিক উপস্থাপনা এবং যুক্তির নিশ্ছিদ্র উল্লেখ। শঙ্কর এই ভাষ্যে একদিকে সাংখ্যদের প্রকৃতি পরিণামবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অপরদিকে তিনি ভর্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতি বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যকাররা যে ব্রহ্মপরিণামের কথা বলেছেন তারও বিরূদ্ধাচরণ করেছেন। শঙ্কর বিবর্তবাদ বা মায়াবাদের প্রচারক। মহাত্মা শঙ্করের মতে জগৎ প্রকৃতি বা ব্রহ্মের পরিণাম নয়, জগৎ হল ব্রহ্মের বিবর্ত বা ভ্রান্ত প্রকাশ।

অনেকে বলে থাকেন শঙ্কর যে নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলেছেন তার সঙ্গে বৌদ্ধ মাধ্যমিক সম্প্রদায় বা শূন্যবাদীদের শূন্যের মিল আছে। কিন্তু শঙ্কর এই ব্যাপারে আগে থেকেই অবগত ছিলেন। তাই তিনি এই জাতীয় প্রতিবাদ খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, শূন্যবাদীদের মতো অভাবাত্মক দর্শন প্রচার করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তিনি ভাবাত্মক দর্শনের প্রবক্তা। তাই তিনি শূন্যবাদকে পূর্ণবাদে রূপান্তরিত করেছেন।

শঙ্করাচার্য আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তা হল বৈদান্ত সূত্রের ভাষ্য ভিন্ন প্রধান প্রধান উপনিষদ এবং ভগবৎ গীতার ভাষ্য রচনা করা। শঙ্কর তাঁর বেদান্তসূত্র ভাষ্যে অদ্বৈতবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত যে কোনো বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বৃহদারণ্যক এবং ছন্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যকে গ্রহণ করেছেন। তাই যদি আমরা শঙ্কর প্রবর্তিত এবং শঙ্কর অনুসৃত দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে চাই তাহলে এই দুটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য উপনিষদের ভাষ্য জেনে রাখা দরকার। এছাড়া উপদেশ সাহস্রীতেও শঙ্কর মতবাদের এক চমৎকার উপস্থাপনা চোখে পড়ে।

শঙ্করের সমর্থকেরা পরবর্তীকালে তাঁর দার্শনিক অভিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নানাধরনের ভাষ্য রচনা করেছেন। এর ফলে তাঁদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই মতভেদের ফলে একাধিক অদ্বৈত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এঁদের মধ্যে বিবরণ এবং ভামতী সম্প্রদায় সবথেকে প্রসিদ্ধ। বিবরণ সম্প্রদায়টি শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য, পদ্মপাদের শঙ্কর-সূত্র ভাষ্যের পঞ্চপাদিকা টীকার ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ভামতী সম্প্রদায় স্থাপন করেন বাচস্পতি মিশ্র। তিনি পঞ্চপাদিকার একটি টীকা লিখেছিলেন— প্রকাশাত্মক বিবরণ। এই টীকার নাম গ্রহণ করা হয়েছে বিবরণ সম্প্রদায়ের নাম থেকে। অখণ্ডানন্দ রচনা করেন তত্ত্বদীপন নামে একটি টীকা। বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ গ্রন্থে বিদ্যারণ্য মুনি বিবরণের বক্তব্য সংকলন করেছেন। শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের ওপর বাচস্পতি মিশ্রের টীকার নাম ভামতী। এই নাম থেকেই ভামতী সম্প্রদায়ের নামটি এসেছে। অমলানন্দ ভামতী ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যা আছে কল্পতরু গ্রন্থে। কল্পতরুর ওপর পরিমল নামে টীকা রচনাকার অপ্পয় দীক্ষিত। এই ভাবে শঙ্কর বেশ কিছু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা স্বীয় স্বীয় বৌদ্ধিক সত্তা অনুসারে শঙ্কর প্রবর্তিত এবং প্রতিষ্ঠিত দর্শন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন।

অদ্বৈত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থের কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলেই আমরা বুঝতে পারব যে একদা শঙ্কর-ভাষ্য ভারতের বুদ্ধিজীবী মহলকে কীভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। সুরেশ্বর লিখেছেন নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি। তাঁর শিষ্য সর্বজ্ঞাত্মন লিখেছেন সংক্ষেপ শারীরক। এই দুটি হল অদ্বৈত বেদান্তের দুটি আকর গ্রন্থ। সংক্ষেপ শারীরক গ্রন্থে বিবরণ ও ভামতী থেকে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার যে মায়াবাদ সম্পর্কে শঙ্কর দীর্ঘকাল ধরে সাধনা করে গেছেন সেই মায়াবাদের বৃহৎ বিবরণ আছে বিমুক্তানন্দ বিরচিত

ইষ্টসিদ্ধিতে। পরবর্তীকালে আনন্দবোধের ন্যায়মকরন্দ এবং বিদ্যারণ্য পঞ্চদর্শী লেখেন এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় অদ্বৈত গ্রন্থ।

অপ্পয় দীক্ষিত লিখেছেন সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ নামে একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে কীভাবে পরবর্তীকালে শঙ্কর সম্প্রদায়রা নানাধরনের মতপার্থক্যের জন্ম দিয়েছিলেন। ধর্মরাজ অধ্বীরন্দ্র বেদান্ত পরিভাষা গ্রন্থে অদ্বৈতপ্রমাণ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সদানন্দ লিখেছেন বেদান্তসার, এই গ্রন্থটির মাধ্যমে তিনি অদ্বৈত দর্শনের সহজ সরল এবং সুন্দর পরিচয় তুলে ধরেছেন। নৈষধীয়চরিতের কবি শ্রীহর্ষ খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য নামে একটি পরমতখণ্ডন খণ্ডের রচয়িতা। এই গ্রন্থে অদ্বৈত বেদান্তের মতগুলিকে খণ্ড করার চেষ্টা করা হয়েছে। মধুসূদন সরস্বতী লিখেছেন অদ্বৈতসিদ্ধি। এর ওপর টীকা লিখেছেন ব্রহ্মানন্দ লঘুচন্দ্রিকা টীকা। এই দুটি গ্রন্থকেও আমরা অদ্বৈতবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত গ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছি।

এইভাবেই যুগে যুগান্তরে কালে কালান্তরে ভারতীয় অদ্বৈতবাদীরা স্বীয় স্বীয় ধ্যানধারণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে একাধিক আকরগ্রন্থ রচনা করে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের সংযুক্ত প্রয়াসে ভারত এবং বর্হির্বিশ্বে শঙ্কর মতবাদ যথেষ্ট জনপ্রিয় এবং গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

অদ্বৈত মতে প্রমা, প্রমাণ ও প্রমেয় : সাংখ্য মতে জ্ঞানের জন্য বুদ্ধির বৃত্তি এবং তাতে পুরুষ-চৈতন্যের প্রতিফলন আবশ্যক। অদ্বৈত মতে জ্ঞানের জন্য সাক্ষী-চৈতন্য-ভাস্বর অন্তঃকরণবৃত্তি দরকার। অদ্বৈত মতে অন্তঃকরণ ভৌতিক বা পঞ্চভূতের সৃষ্টি। তবে অন্তঃকরণে পঞ্চভূতের মধ্যে তেজস-ই প্রধান। সেইজন্য অন্তঃকরণকে তৈজস বলা হয়। সুষুপ্তি ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত অবস্থাতেই অন্তঃকরণ সদা-সক্রিয়। ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত হয়ে অন্তঃকরণ বিষয়াকার ধারণ করে। সাংখ্য মতের মতোই অদ্বৈতমতে বিষয়াকারে আবৃত অন্তঃকরণের নাম বৃত্তি। এই বৃত্তি সাক্ষী-চৈতন্যের দ্বারা ভাস্বর হয়।

সাংখ্য-যোগ দর্শনে যা পুরুষচৈতন্য অদ্বৈতমতে তা সাক্ষী-চৈতন্য। পুরুষের মতোই সাক্ষী নিষ্ক্রিয়। সাক্ষী নিষ্ক্রিয় হলেও অন্তঃকরণ-বৃত্তির প্রকাশ সাক্ষীর জন্যই হয়। প্রদীপ যেমন বস্তুর প্রকাশের জন্য দরকার। নিষ্ক্রিয় সাক্ষী এবং সক্রিয় অন্তঃকরণের সংযোগেই জ্ঞান, অনুভূতি, ক্রিয়া প্রভৃতি লোক-ব্যবহার হয়ে থাকে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জীব বলতে আমরা সাক্ষী ও অন্তঃকরণের সংযুক্ত রূপই বুঝি। জীবের মোক্ষ না হওয়া পর্যন্ত এই সংযুক্তরূপই কোনো না কোনো আকারে থাকে। সর্বশেষে এই সংযোগ যখন নষ্ট হয়, তখন অন্তঃকরণ উপাদান কারণ অজ্ঞানে লীন হয় এবং সাক্ষী সাক্ষীত্ব হারিয়ে ব্রহ্মেই লীন হয়ে যায়। সাক্ষী এবং জীব অভিন্ন নয়, অবশ্য তারা ভিন্নও নয়।

জীবের মধ্যে অন্তঃকরণ বা বিষয়ে অংশ থাকায় জীব আত্মচৈতন্যের বিষয় হতে পারে, কিন্তু সাক্ষী একান্তভাবে অবিষয় বলে কখনোই কোনো জ্ঞানের বিষয় হয় না। সাক্ষী অবশ্য সেজন্য অজ্ঞাত থাকে না। সাক্ষী স্বরূপত স্বয়ং প্রকাশ অর্থাৎ প্রকাশরূপতাই সাক্ষীর স্বরূপ। সুতরাং সাক্ষীর অপ্রকাশিত থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অদ্বৈতমতে জ্ঞানের জন্য অন্তঃকরণবৃত্তি এবং সাক্ষী-চৈতন্য দুই-ই দরকার। এঁদের মতে অন্তঃকরণবৃত্তি অনিত্য। কিন্তু সাক্ষী-চৈতন্যের চৈতন্য নিত্য। বৃত্তির পরিবর্তন হয়, কিন্তু সাক্ষী অপরিবর্তিত থাকে। বৃত্তির মতো সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আন্তর অবস্থাও অন্তঃকরণের পরিণাম।

অন্তঃকরণ-বৃত্তি দিয়েই এদের জানা যায়। বৃত্তি যেমন সাক্ষী-চৈতন্য-ভাস্বর, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আন্তর অবস্থাও তেমনি সাক্ষী-চৈতন্যের প্রকাশ।

অদ্বৈতমতে জ্ঞান দ্বিবিধ—অপরোক্ষ ও পরোক্ষ। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং অপরোক্ষ জ্ঞান সমার্থক নয়। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ছাড়াও অপরোক্ষ জ্ঞান হতে পারে। নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূর্ণ হলেই অপরোক্ষ জ্ঞান হয়।

প্রথমত বস্তু অপরোক্ষ জ্ঞানের যোগ্য হওয়া চাই। ঘট অপরোক্ষ জ্ঞানের যোগ্য কিন্তু 'ধর্ম' যোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত বস্তু জ্ঞানকালে উপস্থিত থাকা চাই। যে ঘট এখানে নেই, তার অপরোক্ষ জ্ঞান হতে পারে না।

তৃতীয়ত জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে বৃত্তি সংযোগ হওয়া চাই। বাহ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত হয়ে বিষয়াকারে আকারিত হয়, কিন্তু সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আন্তর অবস্থার ক্ষেত্রে অন্তঃকরণ বহির্গত হয় না, স্বস্থানে থেকেই বৃত্তিরূপ গ্রহণ করে। অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বিবিধ—সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক। পরোক্ষ জ্ঞান পঞ্চবিধ—অনুমতি, উপমিতি, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি।

অদ্বৈতমতে জ্ঞান বস্তুতন্ত্র। অর্থাৎ বিষয় ছাড়া জ্ঞান হয় না। এই ক্ষেত্রে যোগাচার মতের সঙ্গে অদ্বৈত মতের পার্থক্য সুস্পষ্ট। যোগাচার মতে বিজ্ঞান বাহ্য বিষয়াকারে প্রকাশিত হয়। শঙ্করাচার্য এই মত খণ্ডন করেছেন।

বিষয় ছাড়া জ্ঞান হয় না, একথা বলায় অদ্বৈত মতকে এদিক থেকে আমরা বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদ (Realism) বলে মানতে পারি। জ্ঞানের বিষয় পরোক্ষও হতে পারে, আবার অপরোক্ষও হতে পারে। অপরোক্ষ বিষয় বাহ্যবস্তু ও আন্তর অবস্থা, দুই-ই হতে পারে। পূর্বে আলোচিত অপরোক্ষ জ্ঞানের শর্তাবলির যে কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলেই অপরোক্ষ জ্ঞান হয়না।

মানুষের জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তূরীয়—এই চতুর্বিধ অভিজ্ঞতা হতে পারে। আমরা এতক্ষণ অভিজ্ঞতার কথা বলছিলাম। এবার স্বাপ্ন অভিজ্ঞতার কথা-স্বাপ্ন অভিজ্ঞতায় যদি আমাদের মনে হয় যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হচ্ছে এবং স্থূল শরীরও রয়েছে, বস্তুত স্বপ্নে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষও হয় না, স্থূল দেহের সঙ্গে সংযোগও থাকে না। স্বপ্নে স্মৃতিও থাকে, আবার নূতন সৃষ্টিও থাকে। জাগ্রত অভিজ্ঞতার বিষয়ের মতো স্বাপ্ন অভিজ্ঞতারও বিষয় থাকে। তবে বিষয়ের প্রকৃতি দুই ক্ষেত্রে ভিন্ন। জাগ্রত অভিজ্ঞতার বিষয় ব্যক্তি-বিশেষের অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য।

স্বাপ্ন অভিজ্ঞতার বিষয়ের স্থায়িত্ব খুব কম। স্বপ্ন ভেঙে গেলেই স্বাপ্ন অভিজ্ঞতার বিষয় থাকে না। কিন্তু জাগ্রত অভিজ্ঞতার বিষয় তুলনামূলকভাবে অনেক দীর্ঘস্থায়ী। পরিপূর্ণ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয় থাকে। এইসব পার্থক্যের কথা বিবেচনা করে শঙ্করাচার্য জাগ্রত অভিজ্ঞতার বিষয়কে ব্যবহারিক এবং স্বাপ্ন অভিজ্ঞতার বিষয়কে প্রাতিভাষিক বলেছেন। জাগ্রত অভিজ্ঞতার বিষয় নিয়ে লোক-ব্যবহার সম্ভব নয় কারণ তা প্রতিভাস-কালমাত্র স্থায়ী।

শঙ্কর-এর মতে প্রাতিভাসিক বিষয়ও বিষয়, ধারণামাত্র নয়। অদ্বৈত মতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই স্বপ্নে অন্তঃকরণ সক্রিয় থাকে এবং অন্তঃকরণ বৃত্তি সাক্ষীচৈতন্যভাস্বর হয়। জাগ্রত ও স্বপ্ন উভয়বিধ অভিজ্ঞতাতেই অন্তঃকরণ বৃত্তি এবং সাক্ষী-চৈতন্য থাকে। স্বাপ্ন অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয়-সংযোগ থাকে না, কিন্তু জাগ্রত অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয়-সংযোগ বর্তমান।

সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়-সংযোগ থাকে না, অন্তঃকরণ তার কারণে অবিদ্যায় লীন হয় এবং সাক্ষী-চৈতন্য পরবর্তী অবস্থাগুলির মতোই বর্তমান থাকে। অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় অবিদ্যা এবং সাক্ষী-চৈতন্য থাকে। অবিদ্যা ও সাক্ষী-চৈতন্য মিলে কারণ শরীর গঠন করে।

এই অবস্থায় জীব থাকে না, কারণ জীব অন্তঃকরণবিশিষ্ট এবং এই অবস্থায় অন্তঃকরণ থাকে না। তবে জীবত্ব এই অবস্থাতেও থাকে, সাক্ষী ও অবিদ্যার সংযোগে এই সময় জীবত্ব গঠিত হয়। অবিদ্যাও এই অবস্থায় থাকে বটে, কিন্তু বিক্ষেপ করে না। অর্থাৎ অবিদ্যা চরমসত্তা সত্যকে আবৃত করে। কিন্তু নাম-রূপাত্মক বিচিত্র-জগৎ বিক্ষিপ্ত করে না। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, শঙ্করের মতে অবিদ্যার দ্বিবিধ কর্ম—আবরণ ও বিক্ষেপ। উদাহরণ : কোনো ব্যক্তির রজ্জু বিষয়ে অজ্ঞান সর্প নামক বস্তু বিক্ষিপ্ত করে। ফলে রজ্জু বিষয়ে অজ্ঞানী ব্যক্তি রজ্জু জানে না এবং তার স্থানে সর্প জানে। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে সুষুপ্তি অবস্থায় জীবত্ব থাকে। বৈচিত্র্য থাকে না। মানুষ সুষুপ্তি থেকে উঠে যখন বলে কিছুই টের পাইনি, তখনই বোঝা যায় সুষুপ্তি অবস্থায় তার বৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতা ছিল না। সুষুপ্তি অবস্থায় আনন্দের অভিজ্ঞতা হয়। এই আনন্দ অদ্বৈতমতে সমল আনন্দ। কারণ, এই অবস্থায় আনন্দের সঙ্গে অবিদ্যা থাকে এবং অবিদ্যাকে মল বলা হয়। এই সমল আনন্দ সুষুপ্তি অবস্থা থেকে জাগ্রত হওয়ার পরও কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়। ক্রমশ জাগ্রত

অভিজ্ঞতার অভিঘাতে তা লুপ্ত হয়ে যায়। সুষুপ্তি অবস্থার কোনো কথাই সুষুপ্তি অবস্থায় জানা যায় না। কারণ তখন অন্তঃকরণ থাকে না। সুষুপ্তির পর সুষুপ্তি অবস্থার স্মরণের ভিত্তিতে আমরা সুষুপ্তির পরিচয় পাই।

তূরীয় অভিজ্ঞতায় অবিদ্যাও থাকে না। অবিদ্যা না থাকায় সাক্ষীত্ব লুপ্ত হয়। শুধু চৈতন্য থাকে। এই চৈতন্য আত্মা বা ব্রহ্ম। এই চৈতন্য সদরূপ এবং আনন্দরূপ। অদ্বৈতমতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা। এরই নাম পারমার্থিক সত্তা। তূরীয় অভিজ্ঞতায় এই সত্তাই অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা। এরই নাম পারমার্থিক সত্তা। তূরীয় অভিজ্ঞতাতেই এই সত্তার যথার্থ প্রকাশ ঘটে। অন্যান্য অভিজ্ঞতায় এই সত্তার প্রকাশ অজ্ঞানে আবৃত থাকে। অবশ্য সুষুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞানের প্রভাব অনেক কমে যায় বলে চরম সত্তার প্রকাশ জাগ্রত ও স্বপ্নকালের চেয়ে সুষুপ্তিকালে বেশি হয়। জাগ্রতকালীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বাপ্ন অভিজ্ঞতার বিষয়ে ব্যবহারিক-জগৎও তেমনি মিথ্যা বলে প্রতিভাত হয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, অদ্বৈত দর্শনে আত্মা বা ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ বলে জ্ঞানস্বরূপও বটে। কিন্তু এই জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান নয়। আমরা যে জ্ঞানকে অদ্বৈতমতে অনুসরণ করে অধ্যাসাত্মক বলেছি তা বৃত্তিজ্ঞান।

শঙ্করাচার্য বলেন, বিষয় এবং বিষয়ী নিত্য-বিরুদ্ধ। এদের সম্বন্ধ কখনোই সত্য হতে পারে না। অথচ সব সময়েই আমাদের অভিজ্ঞতায় এদের সম্বন্ধ দেখতে পাই। আমরা বিষয়ীর ধর্ম বিষয়ে আরোপ করি এবং বিষয়ের ধর্ম বিষয়ীতে প্রয়োগ করি—শঙ্কর একেই অধ্যাস বলেছেন।

আমরা যে জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছি তা-ও অধ্যাসাত্মক। কারণ, আমরা দেখেছি জ্ঞাত হতে হলে সাক্ষী-চৈতন্য এবং অন্তঃকরণবৃত্তির সংযোগ আবশ্যক। কিন্তু সাক্ষী-চৈতন্য নিত্য-বিষয়ী এবং অন্তঃকরণবৃত্তি বিষয়। সুতরাং এদের সম্পর্ক স্বাভাবিক বা লৌকিক হলেও তা সত্য নয়, অধ্যাসাত্মক।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, অদ্বৈতমতে বিষয় ছাড়া জ্ঞান হয় না, জ্ঞান হতে গেলেই কোনো না কোনো বিষয় চাই। এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—আমাদের যে ভ্রান্ত জ্ঞান হয় তার বিষয় কী? আমরা অন্ধকার রাত্রিতে রজ্জুকে সর্প বলে দেখি।

লোকে এই প্রকার জ্ঞানকে ভ্রান্তজ্ঞান বলে। এই জ্ঞানের বিষয় তো সত্য হতে পারে না। যদি সত্যই হয়, তবে পরে আমরা এটি সর্প নয়, রজ্জু মাত্র একথা জানি কী করে? সত্য জিনিস তো কখনো নস্যাৎ হতে পারে না। অদ্বৈতবাদীরা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা এই জাতীয় ভ্রান্তজ্ঞান ব্যাখ্যার জন্য অনির্বচনীয় বিষয় স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, যজ্ঞদত্ত দিনের বেলায় না খেলেও যদি তাকে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ দেখা যায়, তবে আমরা অর্থাপত্তি প্রমাণের ভিত্তিতে বলি, সে রাত্রে খায়। সেইরূপ আমাদের ভ্রান্তজ্ঞান হয়, অথচ তার বিষয় সত্য নয়, সুতরাং এই ভ্রান্তজ্ঞানের ব্যাখ্যার জন্য অর্থাপত্তি প্রমাণের সাহায্যে সত্য ভিন্ন কোনো বিষয় স্বীকার করতেই হবে। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় যেমন সৎ নয়, তেমনি তা অসৎও নয়। যা অসৎ তা কখনোই প্রকাশিত হয় না। বন্ধ্যাপুত্র একান্ত অসৎ বলে কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়, যেমন রজ্জুতে সর্প অল্পক্ষণের জন্য হলেও দেখা যায়। সুতরাং ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় অসৎ নয়। ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় যদি সৎ না হয়, অসৎও না হয়, তবে কি সদসৎ? তা-ও অসম্ভব। কারণ একই জিনিস একই সঙ্গে সৎ ও অসৎ দুই-ই হতে পারে না। তাহলে ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়ের প্রকৃতি কী? অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় সৎ, অসৎ, সদসৎ ভিন্ন অথচ বিষয়। এই অবস্থায় একে অনির্বচনীয় না বলে কোনো উপায় নেই!

ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই মতবাদ অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদ ভ্রান্তজ্ঞানের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারে বলে মনে হয়। ভ্রান্তজ্ঞানে কোনো বিষয় যে প্রতিভাত হয় এবং তা লোকে জানে এবং ফলে সেই সময় কিছু ব্যবহারও হয়, একথা অস্বীকার করা যায় না। আবার এই বিষয় পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় তা-ও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় মিথ্যা, একথা না বলে উপায় নেই। কারণ, একমাত্র মিথ্যাই বাধিত হতে পারে। সত্য কখনো বাধিত হয় না। যা মিথ্যা তা

অসৎ নয় বলেই প্রকাশিত হয়। অসৎ কখনো প্রকাশিত হতে পারে না। সুতরাং ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় সৎ নয়, অসৎ নয়, অনির্বচনীয় মিথ্যা, অদ্বৈতবাদীদের একথা না বলে উপায় কী!

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় এবং তার অধিষ্ঠান একই রূপ সত্তার অধিকারী হতে পারে না। রজ্জুতে যখন আমরা সর্প দেখি, তখন অধিষ্ঠান রজ্জু ব্যবহারিক সত্তাবিশিষ্ট, কিন্তু সর্প প্রতিভাসিক সত্তাবিশিষ্ট। প্রতিভাস-কালের পর সর্প থাকে না, রজ্জু থাকে। সুতরাং রজ্জুর উন্নত সত্তার কথা স্বীকার করতেই হয়।

সর্বশেষে জগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্মের জ্ঞান হলে জগৎও বাধিত হয়। ব্রহ্ম পারমার্থিক সৎ, কিন্তু জগৎ ব্যবহারিক সৎ।

আরও কথা, অদ্বৈত মতে, অধিষ্ঠানের জ্ঞান হলেই ভ্রান্তি থাকে না। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান স্থলে অধিষ্ঠান রজ্জুর জ্ঞান হলে সর্প থাকে না এবং ভ্রান্তিও ঘোচে।

তেমনি জগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্মের জ্ঞান হলে জগৎও থাকে না এবং জগৎ বিষয়ে ভ্রান্তি দূর হয়। যা কখনোই বা তিন কালেই বাধিত হয় না, তা-ই পারমার্থিক সৎ। যা একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে বাধিত হয়, তা ব্যবহারিক সৎ। আর যা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়, তা প্রাতিভাসিক সৎ। আর যা প্রতিভাতই হয় না, সুতরাং বাধিত হওয়ার প্রশ্ন নেই, তা অসৎ। এই অর্থে ব্রহ্ম কখনোই বাধিত হয় না বলে ব্রহ্ম পারমার্থিক সৎ, জগৎ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় বলে জগৎ ব্যবহারিক সৎ, আর সর্প-রজ্জু ভ্রমকালে রজ্জুতে প্রতিভাত সর্প রজ্জুজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় বলে তা প্রাতিভাসিক সৎ। বন্ধ্যাপুত্র যা কখনোই প্রতিভাত হয় না, তা অসৎ। এই ক্ষেত্রে অসৎ থেকে ভিন্ন বলেই ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিককে সৎ বলা হয়েছে। আসলে পারমার্থিকই একমাত্র সৎ, কারণ তা বাধিত হয় না। যা বাধিত হয় তা বস্তুত সৎ নয়, মিথ্যা, সেজন্য ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক দুই অবস্থাই পরমার্থত মিথ্যা। ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিককে সৎ বলা হয়েছে। আসলে পারমার্থিকই একমাত্র সৎ, কারণ তা বাধিত হয় না। যা বাধিত হয় তা বস্তুত সৎ নয়, মিথ্যা। সেজন্য ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক দুই অবস্থাই পরমার্থত মিথ্যা। ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক উভয় মিথ্যাই অজ্ঞানতার জন্য, তবে প্রাতিভাসিক মিথ্যার ক্ষেত্রে অজ্ঞানতা ভিন্ন কাচকামলাদি বা নিদ্রা প্রভৃতি আগন্তুক দোষ থাকে। স্বপ্নে-দৃষ্ট বস্তু প্রাতিভাসিক। এখানে অজ্ঞান ব্যতীত নিদ্রাদোষ বর্তমান। আবার রজ্জুতে যখন সর্প দেখা যায় তখন দৃষ্টিশক্তির ন্যূনতারূপ দোষ স্বীকার করতে হয়। আরও কথা এই যে, **ব্যবহারিক বস্তু সকলের কাছে দৃশ্য, কিন্তু প্রাতিভাসিক বস্তু ব্যক্তি বিশেষের কাছেই প্রকাশিত।**

অদ্বৈত মতে জ্ঞান স্বতঃই প্রমাণ এবং জ্ঞানের অপ্রামাণ্য পরতঃসিদ্ধ। মীমাংসকেরাও জ্ঞানের প্রমাণ সম্বন্ধে এই মত-ই প্রকাশ করেছেন। মীমাংসকদের মতোই অদ্বৈতবাদীরা বলেন, জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার না করলে জ্ঞানের প্রামাণ্য কোনোভাবেই সিদ্ধ করা যায় না। কোনো জ্ঞান নিজে প্রামাণ্য না হলে অন্য কোনো জ্ঞানের দ্বারাই তো তাকে প্রামাণ্য বলে প্রমাণ করতে হবে। এই অবস্থায় দ্বিতীয় জ্ঞানের প্রামাণ্য তৃতীয় জ্ঞানের ওপর এবং তৃতীয় জ্ঞানের ওপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। এই দোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য জ্ঞানকে স্বতঃপ্রামাণ্যই বলতে হয়। কোনো জ্ঞান যখন পরবর্তী অন্য কোনো জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়, তখনই তা অপ্রামাণ্য হতে থাকে। যেমন রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান রজ্জুজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় বলে রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান অপ্রামাণ্য।

সুতরাং জ্ঞানের অপ্রামাণ্য স্বতঃ নয় পরতঃ বা অন্যনির্ভর। ভাট্ট মীমাংসকদের মতোই অদ্বৈতবাদীরা অনধিগত এবং অবাধিত বিষয়ক জ্ঞানকে প্রমা বলেছেন। যে জ্ঞানের বিষয় পূর্বে অধিগত বা জ্ঞান হয়নি এবং যা বিপরীত জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না, সেরূপ জ্ঞানকে প্রমা বলে।

ঘটের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হলে 'এটি ঘট' জ্ঞান হয়, এ স্থলে জ্ঞানের পূর্বে ঘট অজ্ঞাত ছিল এবং জ্ঞানের পর রজ্জু সর্পের মতো বাধিত হয় না, এজন্য এ জ্ঞানকে প্রমা বলে। স্মৃতিজ্ঞ সব সময়েই পূর্বানুভূত বিষয়ক হয়। অর্থাৎ স্মৃতিজ্ঞানের বিষয় পূর্বানুভূত বা পূর্বজ্ঞাত সেজন্য এই লক্ষণ অনুসারে স্মৃতিজ্ঞান প্রমা হতে পারে

না। তবে বেদান্ত পরিভাষাকার ধর্মরাজাধ্বরীচন্দ্র রামদ্বয়াচার্যকে অনুসরণ করে স্মৃতিকে ও প্রমার অন্তর্গত করে প্রমার আর-একটি লক্ষণও দিয়েছেন। এই লক্ষণ অনুসারে অবাধিত বিষয়ক জ্ঞানই প্রমা।

যে জ্ঞানের বিষয় পরবর্তী কোনো জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না, সেই জ্ঞানই প্রমা। স্মৃতিজ্ঞানের বিষয় পূর্বজ্ঞাত হলেও পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না, সেজন্য এই লক্ষণ অনুসারে স্মৃতি প্রমা হতে পারে। এস্থলে একটি আপত্তি হতে পারে যে, স্মৃতিকে প্রমা বললে স্মৃতির কারণ পূর্বানুভবকে প্রমাণ বলতে হবে। এর উত্তরে বক্তব্য এই যে, স্মৃতির করণকে প্রমাণ বলে স্বীকার করলে প্রমাণগত সংখ্যার বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তবে এই ক্ষেত্রে স্মরণীয় এই যে, অধিকাংশ অদ্বৈতবাদীরাই স্মৃতিকে প্রমা বলেন না এবং প্রমার দ্বিতীয় লক্ষণ (অবাধিত বিষয়ক জ্ঞান) মানেন না।

অনেকে বলেন, অনধিগত অবাধিত বিষয়ক জ্ঞান প্রমা, প্রমার এই লক্ষণ বস্তুত ভাট্ট-মীমাংসাসম্মত। 'ব্যবহারে ভাট্ট নয়' এই নীতি অনুসরণ করে বেদান্ত পরিভাষাকার প্রমার এই লক্ষণ দিয়েছেন। অদ্বৈত-বেদান্তমতে যা অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করে তা-ই জ্ঞান। স্মৃতি ও ভ্রম অবিদ্যাবৃত্তি, প্রমাণবৃত্তি নয়। এজন্য এরা অজ্ঞানের নিবৃত্তি করে না এবং সেইজন্যই এরা জ্ঞান নয়। তবে ইচ্ছাদির জনক হওয়ায় গৌণভাবে এদের জ্ঞান বলা যায়। মুখ্য অর্থে স্মৃতি ও ভ্রমজ্ঞান নয় বলে স্মৃতিকে প্রমা থেকে বাদ দেবার জন্য 'অনধিগত' বিশেষণ এবং ভ্রমকে প্রমা থেকে বাদ দেবার জন্য 'অবাধিত' বিশেষণ। প্রমার লক্ষণে দেওয়া হয়েছে একথা বলা অর্থহীন। অদ্বৈতবাদীদের মতে প্রমার লক্ষণ—'অজ্ঞাতার্থ বিষয়ক নিশ্চয়ত্ব'।

প্রমার করণকে প্রমাণ বলা হয়। অদ্বৈত মতে প্রমা ও প্রমাণ সংখ্যায় ছয়টি। প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, অর্থাপত্তি, শব্দ-জ্ঞান এবং অনুপলব্ধি—ছয়টি প্রমা। এদের করণ যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি, শব্দ এবং অনুপলব্ধি, ছয়টি প্রমাণ।

প্রত্যক্ষ প্রমার করণকে প্রমাণ বলা হয়। এখানে প্রত্যক্ষ প্রমা বলতে চৈতন্য অর্থাৎ ব্রহ্মকেই বুঝতে হবে। এই ক্ষেত্রে আপত্তি হতে পারে যে, যদি চৈতন্যই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়, তবে তার কারণ রূপে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে কীভাবে প্রমাণ বলা যায়? চৈতন্য অনাদি (নিত্য) বলে, তার কোনো করণ থাকতে পারে না। এর উত্তরে বলা যায়, চৈতন্য স্বরূপত অনাদি হলেও চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক অন্তঃকরণবৃত্তি ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষাদি দ্বারা উৎপন্ন হয় বলে বৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্য সাক্ষী। এইভাবে সাক্ষী চৈতন্যের করণ বলে চক্ষু প্রভৃতিকে প্রমাণ বলা যায়। চৈতন্য রূপ প্রমাজ্ঞানের অবচ্ছেদক বা অভিব্যঞ্জক অন্তঃকরণ বৃত্তিকেও গৌণভাবে জ্ঞান বলা হয়।

অদ্বৈতমতে ইন্দ্রিয়ের জন্য প্রত্যক্ষ এরূপ বলা অনুচিত। কারণ প্রত্যক্ষ যদি ইন্দ্রিয়ের জন্য হয়, তবে ন্যায়মতে মন ইন্দ্রিয় বলে (অবশ্য অদ্বৈতমতে মন ইন্দ্রিয় নয়) অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানও মনের জন্য বলে এদের প্রত্যক্ষ বলতে হয় এবং ঈশ্বরজ্ঞান ইন্দ্রিয়ের জন্য নয় বলে তা প্রত্যক্ষাত্মক হতে পারে না। তা হলে প্রশ্ন হবে—অদ্বৈত মতে প্রত্যক্ষত্ব ব্যবহারের প্রয়োজক কী? এর উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষস্থলে জ্ঞান (প্রমা), জ্ঞানের করণ (প্রমাণ) ও জ্ঞানের বিষয় (প্রমেয়) তিনটিকেই প্রত্যক্ষ বলা হয়। বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষ প্রমার করণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হয়। প্রমাণ-চৈতন্যের সঙ্গে বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদই জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্ব ব্যবহারের নিয়ামক। অদ্বৈতমতে চৈতন্য স্বরূপত এক হলেও উপস্থিতিরূপে বিবিধ-প্রমাণ চৈতন্য, প্রমাতৃ চৈতন্য ও বিষয় বা প্রমেয় চৈতন্য। ঘট প্রভৃতি বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য। অন্তঃকরণ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাণ চৈতন্য অন্তঃকরণবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাতৃচৈতন্য। জলাশয়ের জল যেমন ছিদ্রপথে নির্গত হয়ে নালার ভেতর দিয়ে শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করলে তা শস্যক্ষেত্রের আকার ধারণ করে, তেমনি তৈজস অন্তঃকরণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করে দেহের বহির্ভাগে নির্গত হয়ে সম্মুখে অবস্থিত ঘটাদি বিষয়ে সংযুক্ত হয় এবং সে সমস্ত বিষয়াকারে পরিণত হয়। অন্তঃকরণের এই বিষয়াকারে পরিণামকে বৃত্তি বলা হয়। 'এটি ঘট' এ রূপ প্রত্যক্ষস্থলে যখন অন্তঃকরণ চক্ষুরিন্দ্রিয়কে অবলম্বন করে ঘট স্থলে গমন করে, তখন তা ঘটাকারে পরিণত হয় এবং তখন ঘট ও ঘটাকার অন্তঃকরণবৃত্তি একস্থানগত হয় বলে ঘটরূপ বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যও বৃত্তিরূপ প্রমাণবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্ন হয়ে যায়, এই ঘটজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা হয়।

'ঘট' প্রভৃতি বিষয়ের মতো সুখাদি বিষয় বাহ্যবস্তু নয়, তা আন্তরবস্তু। সেজন্য সুখাদি বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধের জন্য অন্তঃকরণের বহির্দেশে গমনের প্রয়োজন নেই। সুখ প্রভৃতির জ্ঞানস্থলে সুখাদি বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও সুখাদি বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য নিয়তই একস্থানস্থিত বলে উভয় চৈতন্য অভিন্ন। এজন্যই 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী' প্রভৃতি জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক।

তবে যোগ্য ও বর্তমান বিষয়েই প্রত্যক্ষ সম্ভব বলে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যোগ্য ও বর্তমান বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সঙ্গে বৃত্তাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভিন্নতাই জ্ঞানগত প্রত্যক্ষ।

প্রমাতৃচৈতন্যের সঙ্গে বিষয়ের অভিন্নতাই ঘটাদি বিষয়গত প্রত্যক্ষতার নিয়ামক। কিন্তু প্রশ্ন এই যে ঘটাদি বিষয়ের সঙ্গে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের (প্রমাতৃচৈতন্যের) অভেদ কীভাবে সম্ভব? 'আমি ঘট প্রত্যক্ষ করছি' এইরূপ ঘট প্রত্যক্ষস্থলে 'আমি' অর্থাৎ প্রমাতৃচৈতন্যের সঙ্গে ঘটাদি বস্তুর ভেদই অনুভূত হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, অভেদ শব্দের অর্থ ঐক্য নয়, প্রমাতৃসত্তার অতিরিক্ত বিষয়ের সত্তা না থাকাই এস্থলে প্রমাতৃচৈতন্য ও বিষয়ের অভেদ। অদ্বৈতমতে ঘটাদি সমস্ত বিষয় ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যস্ত, সুতরাং অধিষ্ঠানীভূত। বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সত্তাই বিষয়ের সত্তা। অধিষ্ঠান সত্তার অতিরিক্ত অধ্যস্থ বস্তুর সত্তা নেই। ঘট প্রত্যক্ষস্থলে অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়পথে বিষয়দেশে গমন করলে ঘট বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা প্রমাতৃচৈতন্যের অভিন্নতা হয় এবং বিষয়-চৈতন্যের সঙ্গে অভিন্নতাপ্রাপ্ত প্রমাতৃচৈতন্য ঘটের অধিষ্ঠান হয়, ফলে ঘটের সত্তা প্রমাতৃসত্তার অতিরিক্ত না থাকায় ঘট প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়। 'রূপবান ঘট' এরূপে রূপ প্রত্যক্ষস্থলে ঘটগত পরিমাণের প্রত্যক্ষতার আপত্তি হতে পারে। কারণ রূপাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও পরিমাণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যও অভিন্ন, অতএব পরিমাণের সত্তা প্রমাতৃসত্তার অতিরিক্ত নয়।

এর উত্তরে বলা হয় যে 'তত্বৎ বিষয়াকার বৃত্তুপহিত' এই বিশেষণ দিলেই এই আপত্তির কারণ হয়। রূপবান ঘট এই স্থলে রূপাকার বৃত্তি হয়েছে, পরিমাণাকার বৃত্তি হয়নি; অতএব পরিমাণাকার বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃচৈতন্যের সত্তার সঙ্গে অভিন্নতা যুক্ত না হওয়ায় তৎকালে পরিমাণের প্রত্যক্ষ হয় না। বিষয়ের ক্ষেত্রে পূর্বের মতোই যোগ্য ও বর্তমান এ দুটি বিশেষণ দিতে হবে। তা হলে বলা যায়, যার স্বকার বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃচৈতন্য সত্তার অতিরিক্ত সত্তা থাকে না এবং যা যোগ্য ও বর্তমান এমন বিষয়ের প্রত্যক্ষত্ব ব্যবহার হবে।

ন্যায়দর্শন আলোচনা কালে আমরা ন্যায়-স্বীকৃত ছয় প্রকার সন্নিকর্ষের কথা বলেছি। সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত সমবেত সমবায়, সমবেত সমবায় ও বিশেষণতা বিশেষ বিভিন্ন সন্নিকর্ষ। অদ্বৈতবাদীরা সমবায় স্বীকার করেন না, অভাব তাঁদের মতে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, অনুপলব্ধি প্রমাণ লভ্য।

সেজন্য বেদান্ত পরিভাষাকার মাত্র তিনটি সন্নিকর্ষ স্বীকার করেছেন—সংযোগ, সংযুক্ত তাদাত্ম্য এবং তাদাত্ম্য। দ্রব্য প্রত্যক্ষস্থলে সংযোগ, দ্রব্যের গুণ বা কর্ম প্রত্যক্ষস্থলে সংযুক্ত তাদাত্ম্য এবং গুণ বা কর্মে গুণত্ব বা কর্মত্ব প্রত্যক্ষস্থলে তাদাত্ম্য সন্নিকর্ষের মাধ্যমে অন্তঃকরণ বিষয়দেশে গমন করে।

প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ—সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক। যে জ্ঞান বৈশিষ্ট্যাবগাহী, অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ বিষয়ক তা সবিকল্পক। যেমন—আমি ঘট জানছি, এই জ্ঞান যা সংসর্গানবগাহী, অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণের সম্বন্ধকে বিষয় করে না, তা নির্বিকল্পক জ্ঞান। যেমন—'এই সেই দেবদত্ত' বা 'তত্ত্বমসি' (তুমি সেই ব্রহ্ম) ইত্যাদি বাক্যজ্ঞান জ্ঞান।

এই ক্ষেত্রে আপত্তি হতে পারে যে, এই স্থলগুলি নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত কীভাবে হবে? বাক্যজন্য জ্ঞান (শব্দবোধ) পরোক্ষই হয়, ইন্দ্রিয়জন্য নয়, কারণ, অদ্বৈত মতে ইন্দ্রিয়জন্যত্ব নয় বলে তাকে প্রত্যক্ষ বলা যায় না। এ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, প্রত্যক্ষত্বের নিয়ামক নয় এবং যোগ্য বর্তমান বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সঙ্গে প্রমাণ চৈতন্যের অভিন্নতাই প্রত্যক্ষতার নিয়ামক। 'এই সেই দেবদত্ত' এই বাক্যজনিত জ্ঞান ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট দেবদত্ত বিষয়ক অতএব বিষয়দেশে নির্গত অন্তঃকরণের দেবদত্তাকারে বৃত্তি হওয়ায় দেবদত্তরূপ বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্ন হয়েছে। এইভাবে এ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ

বলা হয়। 'তত্ত্বমসি' (তুমি সেই ব্রহ্ম) ইত্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞানও প্রত্যক্ষাত্মক। এই স্থলে ত্বম পদবাচ্য প্রমাতৃচৈতন্যই জ্ঞানের বিষয় বলে বিষয়চৈতন্য ও প্রমাণ চৈতন্যের অভেদ সুস্পষ্ট।

পুনরায় আপত্তি হতে পারে যে, এই ক্ষেত্রগুলিতে বাক্যজন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা হলেও নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ কীরূপে বলা যায়? কারণ, বাক্যজনিত জ্ঞানমাত্রই পদার্থদ্বয় সম্বন্ধ বিষয়ক বলে সংসর্গানবগাহী হয় না। এর উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন, বাক্যজন্য জ্ঞান মাত্রই যে পদার্থদ্বয় সম্বন্ধ বিষয়ক হবে এরূপ কোনো নিয়ম নেই। এইরূপ নিয়ম স্বীকার করলে বক্তার অনভিপ্রেত সম্বন্ধ ও বাক্যজন্য জ্ঞানের বিষয় হতে পারে। কিন্তু তাৎপর্য বিষয়ীভূত পদার্থই বাক্যজন্য জ্ঞানের বিষয় হয়, এই নিয়মই স্বীকার্য। তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যে তৎ ও ত্বমের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। তৎ ও ত্বম অভিন্ন বলে এখানে সম্বন্ধের কোনো প্রশ্ন হয় না। এইরূপ বাক্যকে অখণ্ডার্থক বলা হয়।

শব্দজন্য জ্ঞানও কখনো কখনো অপরোক্ষ হতে পারে এমত শাব্দাপরোক্ষবাদ। বিবরণ ও বেদান্তপরিভাষা এ মত সমর্থন করে। কিন্তু আচার্য বাচস্পতি মিশ্র এ মত সমর্থন করেন না। তাঁর মতে শব্দ জন্য জ্ঞান কখনো অপরোক্ষ হয় না। তাঁর মতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের প্রতি তত্ত্বমসাদি বাক্য করণ নয়, মনই করণ।

অদ্বৈতবাদীরা প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সাক্ষী স্বীকার অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছেন। একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, সবার সব সময় সব বিষয়ে জ্ঞান হয় না। তার কারণ এই যে, যে বিষয়ে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় সে বিষয়াকারে অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ পরিণাম হয় এবং তখনই সে বিষয়ের জ্ঞান হয়।

এই বৃত্তিরূপ জ্ঞান অন্তঃকরণরূপ প্রমাতারই পরিণাম। এই জ্ঞানাকারে পরিণামী অন্তঃকরণ জ্ঞানের আশ্রয় কিন্তু দ্রষ্টা নয়, যেহেতু পরিণামী মাত্রই দৃশ্য। নিজে নিজের পরিণামের দ্রষ্টা হতে পারে না। এতে কর্তৃকর্ম বিরোধ হয়। এজন্য 'আমি ঘট দেখছি' এই স্থলে ঘট ঘটজ্ঞান ও ঘটজ্ঞাতার যিনি দ্রষ্টা বা ভাসক তিনিই অদ্বৈত মতে সাক্ষী চৈতন্য। আবার আমি ঘট জানছি পট জানছি, পুস্তক জানছি—এমন বিভিন্ন বস্তুর একই জ্ঞাতা সাক্ষী স্বীকার না করলে ব্যাখ্যা করা যায় না। অজ্ঞানের জ্ঞানের জন্যও সাক্ষী স্বীকার করতে হয়।

বেদান্ত পরিভাষাকার সাক্ষীকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন—জীবসাক্ষী ও ঈশ্বরসাক্ষী।

অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব বা প্রমাতা। এই জীব অন্তঃকরণ বিশিষ্টরূপে দৃশ্য, বিকারী ও জড়, এজন্য আমি ঘট জানছি এরূপ ঘট বিষয়ক জ্ঞানাশ্রয় প্রমাতার বোধ বা প্রকাশ সাক্ষী চৈতন্য ব্যতীত হতে পারে না। যদিও প্রমাতৃচৈতন্য ও সাক্ষী চৈতন্য উভয়ই চৈতন্য স্বরূপে এক, তবু অন্তঃকরণ বিশিষ্টরূপে প্রমাতা বা জীব এবং অন্তঃকরণোপহিত রূপে সাক্ষী বলা হয়। অন্তঃকরণ সাক্ষীর উপাধি মাত্র, স্বরূপের অন্তর্গত নয়। জীবোপধি অন্তঃকরণাবচ্ছেদে বিষয় প্রকাশ করেন বলে জীবসাক্ষী। জীবসাক্ষীর জীব প্রত্যক্ষ। এই জীবসাক্ষী জীব ভেদে নানা জীবসাক্ষীকে এক বললে যখন এক ব্যক্তি ঘট প্রত্যক্ষ করেছে তখন কালান্তরে অন্য ব্যক্তি ঘট স্মরণ করুক এরূপ আপত্তি হয়, কারণ উভয়ের সাক্ষী-ই এক।

যে যুক্তিতে জীবসাক্ষী স্বীকার করা হয় সেই যুক্তিতে ঈশ্বরসাক্ষীও স্বীকার করতে হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে ঈশ্বর বলা হয়। মায়াবৃত্তিতে ভাসমান সমস্ত বস্তুও মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যের ভাসক ঈশ্বরসাক্ষী। পরিভাষাকার ব্যবহার-অনুসারে সাক্ষী চৈতন্যের ভাগ করেছেন। শ্রুতিতে কোথাও সাক্ষী চৈতন্যের নানাত্ব স্বীকৃত নয়।

অনুমতির কারণ অনুমান। ব্যাপ্তিজ্ঞানরূপে ব্যক্তিজ্ঞান যার জনক এমন জ্ঞানকে অদ্বৈতবাদীরা অনুমিতি বলেন। ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুব্যবসায় হলে এই অনুব্যবসায়ের জনক ব্যাপ্তিজ্ঞান। তবে এ ব্যাপ্তি বিষয় এবং এই ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান বিষয়রূপে অনুব্যবসায়ের জনক, ব্যাপ্তিজ্ঞানত্ব রূপে নয়। আবার যখন ব্যাপ্তিজ্ঞানের স্মৃতি হয় তখন ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুভবরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের স্মৃতির জনক।

অদ্বৈত মতে অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান। ব্যাপ্তিজ্ঞান থেকে যে ব্যাপ্তি বিষয়ক সংস্কার হয় তা-ই ব্যাপ্তিজ্ঞান ও অনুমিতির মধ্যবর্তী ব্যাপার।

উদ্দ্যোতকর প্রমুখ বহু প্রাচীন নৈয়ায়িক লিঙ্গ পরামর্শকে অনুমিতির করণ বলেছেন। অদ্বৈতবাদী ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র বেদান্ত পরিভাষা গ্রন্থে এ মত খণ্ডন করেছেন। পরিভাষাকারের মতে পরামর্শ অনুমিতির করণই হতে পারে না। সুতরাং করণ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

তাৎপর্য এই যে, নৈয়ায়িকগণের মতে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার বিশেষণগুলি ক্ষণিক বলে দুই ক্ষণ পর্যন্ত থাকে, তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয় এবং দুটি জ্ঞান যুগপৎ উৎপন্ন হয় না, ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়। প্রথমে পক্ষধর্মতাজ্ঞান, পরে ব্যাপ্তিজ্ঞান, পরে পরামর্শজ্ঞান ও সর্বশেষে অনুমিতি জন্মে। অনুমিতির প্রতি পরামর্শকে কারণ বললে অনুমিতির পূর্বে পরামর্শের উৎপত্তি ক্ষণে ক্ষণিক পক্ষধর্মতা জ্ঞান বিনষ্ট হয় বলে তা অনুমিতির করণ হবে না। কার্যের অব্যবহিত পূর্বে যা থাকে না, তা কারণ নয়।

ন্যায় মতে কেবলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী এবং অন্বয় ব্যতিরেকী এই ত্রিবিধ অনুমান স্বীকৃত। যে অনুমানে ব্যাপ্তি কেবল অন্বয় সহচারের দ্বারা গৃহীত হয় সেই অনুমানকে কেবলান্বয়ী অনুমান বলে। যে অনুমানে ব্যাপ্তি কেবল ব্যতিরেক সহচারের দ্বারা গৃহীত হয় তা অন্বয় ব্যতিরেকী নামে খ্যাত।

ন্যায়দর্শন আলোচনা কালে এই বিভাগ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কোনো বিষয়ই এমন নয় যার অত্যান্তাভাব অন্তত ব্রহ্মে পাওয়া যায় না। অদ্বৈত মতে ব্রহ্মে সমস্ত কিছুই নিষিদ্ধ বা সমস্ত কিছুরই অত্যান্তাভাব।

সুতরাং অত্যান্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না, এমন সাধ্য নেই। অথচ যে স্থলে সাধ্য অত্যান্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না, এরূপ অনুমিতির করণকে কেবলান্বয়ী অনুমান বলা হয়। সুতরাং কেবলান্বয়ী অনুমান হতে পারে না। সাধ্য ও হেতুর অব্যভিচারী সহচার সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলে। কিন্তু ন্যায় মতে কেবল ব্যতিরেকী অনুমানে সাধ্যের অনুপস্থিতি ও হেতুর অনুপস্থিতির মধ্যে অব্যভিচারী সহচার সম্বন্ধের কথা বলা হয়। তাহলে কেবল ব্যতিরেকী অনুমানের ক্ষেত্রে সাধারণত স্বীকৃত ব্যাপ্তি থাকে না। সুতরাং একে অনুমান বলা যায় না।

ব্যতিরেক ব্যাপ্তি সম্ভব নয় বলে অন্বয় ব্যতিরেকী অনুমান ও অসিদ্ধ। অদ্বৈতবাদীরা একমাত্র অন্বয়ী অনুমান স্বীকার করেন। অদ্বৈত মতে সহচার দর্শন ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের হেতু। ব্যভিচারের জ্ঞান না থাকলে একমাত্র সহচর দর্শন হলেও ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয়। নৈয়ায়িকদের কেবলান্বয়ী অনুমানে ব্যভিচার অদর্শনের দ্বারা ব্যাপ্তি প্রমাণের ব্যবস্থা নেই।

অদ্বৈতবাদীরা স্বার্থ ও পরার্থভেদে দ্বিবিধ অনুমান স্বীকার করেন। নিজের জ্ঞানের জন্য স্বার্থানুমান এবং অপরকে বোঝাবার জন্য পরার্থানুমান নৈয়ায়িকেরা পঞ্চাবয়বী ন্যায় স্বীকার করেছেন। অদ্বৈতমতে পঞ্চাবয়বের প্রয়োজন নেই। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ অথবা উপনয় ও নিগমন এই তিনটি অবয়বই যথেষ্ট।

অদ্বৈতবাদীরা অনুমানের সাহায্যে ব্রহ্ম ভিন্ন নিখিলপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি করেছেন। অনুমানটি নিম্নরূপ—

ব্রহ্মভিন্নং সর্বং মিথ্যা, ব্রহ্ম ভিন্নতাৎ, যদেবম্, তদেবম্, যথা শুক্তিরূপ্যম্

এস্থলে পক্ষ = ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত কিছু,

সাধ্য = মিথ্যাত্ব,

হেতু = ব্রহ্মভিন্নত্ব,

দৃষ্টান্ত = শুক্তিরজাত

শুক্তির মত সাধারণত মিথ্যা বলেই স্বীকৃত। যাঁরা শুক্তির জাতকে মিথ্যা বলেন না, তাঁদের মত অদ্বৈতবাদীরা খণ্ডন করেছেন। আমরা মীমাংসা-দর্শন আলোচনা কালে এই খণ্ডন প্রদর্শন করেছি।

সাদৃশ্য বিষয়ক প্রমাজ্ঞানের করণকে উপমান বলা হয়। যে ব্যক্তি নিজ গৃহপ্রাঙ্গণে 'গো' প্রত্যক্ষ করেছে, সে ব্যক্তি বনে গেলে যখন 'গবয়' নামক জন্তুর সঙ্গে তার ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হয়, তখন 'এইজন্তু গো-সদৃশ' এই জ্ঞান হয় এবং তারপর আবার 'সেই গরু এই জন্তুর মতো' এরূপে সাদৃশ্য জ্ঞান হয়। এই সাদৃশ্য জ্ঞানের ফল গো-

নিষ্ঠ। গবয় সাদৃশ্য জ্ঞান একেই উপমিতি বলে।

আর গবয় নিষ্ঠ গোসাদৃশ্য জ্ঞান তার করণ অর্থাৎ উপমান। এই যে গো-নিষ্ঠ গবয় সাদৃশ্য জ্ঞানরূপ উপমিতি, তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা হতে পারে না। কারণ, তৎকালে 'গো'-র সঙ্গে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ নেই। অনুমান প্রমাণ দ্বারাও এরূপ জ্ঞান হতে পারে না, কারণ গবয় নিষ্ঠ গোসাদৃশ্য রূপ হেতু দ্বারা 'গো'তে গবয় সাদৃশ্যের অনুমান হতে পারে না, তাছাড়া 'উপমান করছি' এরূপ অনুব্যবসায়ও হয়। অতএব উপমান একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ।

উপপাদ্য জ্ঞানের দ্বারা উপপাদকের কল্পনাকে অর্থাপত্তি বলে। উপপাদ্য জ্ঞান করণ (প্রমাণ) এবং উপপাদক জ্ঞান ফল (প্রমিতি)। যা ব্যতীত যার উৎপত্তি হয় না। তার তা-ই উপপাদ্য। যা ব্যতীত উপপত্তি হয় না তা-ই উপপাদ্য। যা ব্যতীত উৎপত্তি হয় না তা উপপাদক। যেমন রাত্রিভোজন ব্যতীত দিনে উপবাসী ব্যক্তির স্থূলতা উৎপন্ন হয় না। এজন্য স্থূলত্ব উপপাদ্য। রাত্রিভোজন ব্যতীত স্থূলত্ব উৎপন্ন হয় না।

এজন্য রাত্রিভোজন উপপাদক। অতএব উপপাদ্য স্থূলত্বের জ্ঞান থেকে যে উপপাদক রাত্রিভোজনের কল্পনা করা হয় তা অর্থাপত্তি।

'অর্থাপত্তি' শব্দটি ফল ও করণ অর্থাৎ প্রমিতি ও প্রাণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অর্থস্য আপত্তির এরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হলে অর্থের উপপাদকের কল্পনা যা থেকে এরূপ অর্থলাভ হয় বলে অর্থাপত্তি শব্দের স্থূলত্ব জ্ঞানরূপ প্রমাণের বোধ হয়।

অর্থাপত্তি দ্বিবিধ। দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি। দৃষ্টার্থাপত্তির উদাহরণ—সম্মুখের শুক্তিতে 'ইদং রজত' এরূপ রজতের প্রত্যক্ষ হচ্ছে, কিন্তু রজতের মিথ্যাত্ব প্রত্যক্ষ হচ্ছে না। পরে সে শুক্তিতেই 'নেদং রজতং' এরূপে তার নিষেধ হচ্ছে। রজত সত্য হলে 'নেদং রজতং' এরূপ প্রত্যক্ষ বাধজ্ঞানের দ্বারা তার নিষেধ উপপন্ন হত না; কারণ জ্ঞানের দ্বারা কোনো সত্য বস্তুর নিষেধ বা নিবৃত্তি হয় না। অথচ নিষেধ হচ্ছে, এতেই কল্পনা করতে হয় রজত মিথ্যা।

শ্রুতবাক্যের স্বার্থের উপত্তি না হলে যে অন্য অর্থ কল্পনা করা হয় তা শ্রুতার্থাপরি জীবিত দেবদত্তকে উদ্দেশ্য করে যখন বলা হয় যে, 'দেবদত্ত গৃহে নেই' তখন এ বাক্য শ্রবণ করে 'জীবিত ব্যক্তির গৃহে অসত্তা বহিঃসত্তা ব্যতীত উপপন্ন হয় না' বলে বহিঃসত্তা কল্পনা করা হয়। অর্থাৎ কল্পনা করা হয় যে, দেবদত্ত গৃহের বাইরে আছে। শ্রুতার্থাপত্তি দু-প্রকার—অভিধানাণুপপত্তি ও অভিহিতাণুপপত্তি। যে স্থলে বাক্যের একাংশ মাত্র শ্রবণ করায় সম্পূর্ণ অর্থবোধ হয় না, সে স্থলে অর্থবোধের উপযোগী অন্য পদের কল্পনা করা হয়। অভিধানাণুপপত্তি। যেমন বৃষ্টি হলে শুধু 'দ্বার' বললে অর্থবোধ হয় না, 'বন্ধ কর' এরূপ তাৎপর্য স্বীকার করতে হয়। যে স্থলে বাক্যার্থ অবগত হলেও তার অণুপপত্তির জ্ঞানের দ্বারা অর্থান্তর কল্পনা করা হয় না তা অভিহিতাণুপপত্তি।

'স্বর্গকাম ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করবে,' এ স্থলে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের স্বর্গ সাধনত্তা অবগত হলে পর 'ক্ষণস্থায়ী' যজ্ঞক্রিয়াতে বহুপরভাবি স্বর্গের সাধনতা অণুপপন্ন এরূপ অণুপপত্তি জ্ঞান থেকে স্বর্গ ও যজ্ঞের মধ্যবর্তী যজ্ঞজন্য 'অপূর্ব' কল্পনা করা হয়।

জ্ঞানরূপ করণ থেকে উৎপন্ন নয় এমন যে অভাবের অনুভব তার অসাধারণ কারণই অনুপলব্ধি প্রমাণ। ব্যাপ্তিজ্ঞানাদিরূপকরণ থেকে উৎপন্ন অতীন্দ্রিয় ধর্মাদির অভাবানুমিতি স্থলে অনুমিতিকরণে অতিব্যাপ্তি করণের জন্য 'অসাধারণ' পদ। অভাব স্মৃতির অসাধারণ সংস্কারে অতিব্যাপ্তি করণের জন্য অভাবের জ্ঞান না বলে অভাবের অনুভব বলা হয়েছে। অনুপলব্ধি হলেই অভাব জ্ঞান হয় না। সেজন্য অদ্বৈতবাদীরা যোগ্যানুপলব্ধি অভাবজ্ঞানের করণ বা প্রমাণ বলেছেন।

'যোগ্য যে অনুপলব্ধি' এরূপ কর্মধারয় সমাস করে যোগ্যানুপলব্ধি শব্দটি সিদ্ধ প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীর ব্যাপ্য ব্যতীত উপলব্ধির যাবতীয় করণের বিদ্যমান দশাতে যদি কোনো স্থানে অভাবের প্রতিযোগীর সত্ত্বের আপাদান দ্বারা সেই প্রতিযোগীর উপলব্ধির আপাদিত হয়, তা হলে সে অভাবের প্রতি সেই অনুপলব্ধিই হবে

যোগ্যানুপলব্ধি। উজ্জ্বল আলোক বিশিষ্ট ভূতলে যদি ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট থাকত তবে অবশ্যই ঘটের উপলব্ধি হত, এরূপ আপাদন সম্ভব বলে অদৃশ্য ভূতলে ঘটের যে অনুপলব্ধি তা-ই যোগ্যানুপলব্ধি। অদ্বৈতবাদীরা অনুপলব্ধি বলতে প্রত্যক্ষের অভাব বোঝেন।

অদ্বৈত মতে অভাবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ সম্ভব নয় বলে অভাব প্রমার প্রতি ইন্দ্রিয়ের কারণত্ব সিদ্ধ হয় না। এ স্থলে সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হতে পারে না, কারণ এরা ভাবের সম্বন্ধ, অভাবের সম্বন্ধ নন। বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবও সন্নিকর্ষ হতে পারে না, কারণ এরা ভাবের সম্বন্ধ অভাবের সম্বন্ধ নয়। বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবও সন্নিকর্ষ হতে পারে না। নৈয়ায়িকরা অভাবের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে এই সন্নিকর্ষই স্বীকার করেন, কারণ দুটি সম্বন্ধ বস্তুরই বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব হয়, অসম্বন্ধের বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব হয় না।

ইন্দ্রিয় ও অভাব কোনো সম্বন্ধে সম্বন্ধ নয় বলে তাদের বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব হতে পারে না। ইন্দ্রিয় সংযুক্ত 'ভূতলে ঘট নেই' এই ক্ষেত্রে অভাব বিশেষণ স্বীকার করে অভাবে যে সংযুক্ত বিশেষণতা আছে তাকে প্রত্যক্ষের হেতু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বললে প্রত্যক্ষ-পক্ষ অনুমান মাত্রের উচ্ছেদ হবে। যে স্থলে পক্ষ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। সে স্থলে অনুমেয় পদার্থটি ইন্দ্রিয় সংযুক্ত পক্ষে বিশেষণ হয় বলে অনুমেয় পদার্থের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হেতু স্ব-সংযুক্ত বিশেষণতা সন্নিকর্ষ হয়েছে। অতএব এই ক্ষেত্রে সাধ্যের অনুমিতি না হয়ে প্রত্যক্ষই হতে পারে। সমান বিষয়ে অনুমিতি সামগ্রী অপেক্ষা প্রত্যক্ষ সামগ্রী বলবান।

বেদান্ত পরিভাষাকার অনুপলব্ধি প্রমাণের বিষয় চতুর্বিধ অভাব—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব স্বীকার করেছেন। নৃসিংহাশ্রমের মতে অভাব তিন প্রকার। তিনি প্রাগভাব স্বীকার করেননি। অভাবের বিস্তারিত আলোচনা অধ্যাপক পঞ্চানন ভট্টাচার্য তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ রচিত বঙ্গানুবাদ বিবৃতি টিপ্পনাদি সম্বলিত বেদান্ত পরিভাষা গ্রন্থের ২৩৭-২৪৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

জ্ঞান কী করে জানা যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন, জ্ঞান স্বপ্রকাশ। জ্ঞান যখন বিষয় প্রকাশ করে, তখন নিজেও অপ্রকাশিত থাকে না। জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় হয় না, কিন্তু অপ্রকাশিতও থাকে না। (অবেদ্যত্ব সতি অপরোক্ষ ব্যবহারযোগ্যত্বম স্বপ্রকাশত্বম) প্রকাশই জ্ঞানের স্বরূপ।

অদ্বৈতমতে বেদ-প্রমাণ বিষয়ে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষণীয় :

(১) মীমাংসকেরা কোনো বেদ-রচয়িতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকেরা ঈশ্বরকে বেদ-রচয়িতা বলে উল্লেখ করেন। শঙ্করাচার্য এই দুই মতের মধ্যপথ অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন, বেদ অপৌরুষের। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, বেদ-রচয়িতা বলে কেউ নেই বা বেদ নিত্য। এ কথার নিহিতার্থ এই যে প্রতিকল্পে ঈশ্বর নতুন করে বেদের উপস্থাপন করেন। কিন্তু তিনি বেদের বক্তব্য বা শব্দ বিন্যাসের কোনো পরিবর্তন করেন না।

পূর্ব সৃষ্টিতে বেদের যে স্বরে উচ্চারণ হত, বর্তমান সৃষ্টিতে সে স্বরেই এই বেদের উচ্চারণ হচ্ছে। এজন্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বর পূর্ব-সৃষ্ট বেদের উচ্চারণ স্মরণ করে হিরণ্যগর্ভকে সে স্বরে বেদের উচ্চারণ করতে উপদেশ দেন। তাই বেদের উচ্চারণ সজাতীয় বেদের উচ্চারণ সাপেক্ষ উচ্চারণ। ঈশ্বর বেদের রচয়িতা, কিন্তু তিনি সাধারণ গ্রন্থের রচয়িতার মতো গ্রন্থের বক্তব্য ও শব্দ-বিন্যাস নিজ অভিরুচি অনুসারে উপস্থিত করেন না। তিনি বেদের উপস্থাপন-কর্তা হিসেবে বেদের রচয়িতা। বেদে যা আছে চিরকালই তা আছে। শুধু বেদের ভিন্ন ভিন্ন উপস্থাপন ভিন্ন ভিন্ন কল্পে প্রচারিত হচ্ছে।

(২) শঙ্কর ভাট্ট-মীমাংসকদের মতোই বেদকেই একমাত্র শব্দপ্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। বেদ-বহির্ভূত শব্দপ্রমাণও স্বীকার করেন। কিন্তু ভাট্ট মীমাংসকেরা বেদে বিধি বাক্যগুলির স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করেন এবং ভূতবস্তু বিষয়ক বাক্যকে বিধিবাক্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। শঙ্করাচার্য এ মত গ্রহণ করেন না। তিনি ভূতবস্তু বিষয়ক বাক্য এবং বিধিবাক্য উভয়ই সমান প্রমাণ বলে মনে করেন।

(৩) শঙ্করের মতে সমস্ত সত্তার ঐক্য-প্রদর্শনই বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য। মীমাংসকেরা এ মত স্বীকার করেন না। সমস্ত সত্তার ঐক্য বলতে সমস্ত সত্তাই যে এক ব্রহ্ম বা চৈতন্য সত্তা, শঙ্কর একথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

অদ্বৈত তত্ত্ব : অদ্বৈতবাদ প্রসঙ্গে অগণিত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে পণ্ডিতেরা বলেন, অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অর্ধশ্লোকাকারেই প্রকাশ করা সম্ভব।

অদ্বৈতমতে—'ব্রহ্ম সত্যং, জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব, না পরং ; (ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মস্বরূপ) আমরা এখন—

১। ব্রহ্ম সত্য

২। জগৎ মিথ্যা এবং

৩। জীব ব্রহ্ম-স্বরূপ

এই কথাগুলির তাৎপর্য বিশদভাবে বিশ্লেষণ করব।

১। ব্রহ্ম সত্য : আমাদের অভিজ্ঞতাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) জাগ্রত

(২) স্বপ্ন

(৩) সুষুপ্তি এবং

(৪) তূরীয়

জীবনে এমন কোনো অভিজ্ঞতা হতে পারে না যা এই চার রকম অভিজ্ঞতার অন্তর্গত নয়। জেগে থেকে আমরা যে অভিজ্ঞতার অধিকারী হই, তাকেই বলে জাগ্রত অভিজ্ঞতা। স্বপ্ন দেখার সময়ে যে অভিজ্ঞতা হয়, তা-ই স্বাপ্ন অভিজ্ঞতা। স্বপ্নহীন গভীর ঘুমে মগ্ন হলে যে অভিজ্ঞতা পাই, তার নাম সুষুপ্তি এবং সমাধি হলে সাধক যে অভিজ্ঞতার অধিকারী হন, তা-ই তূরীয় অভিজ্ঞতা।

জাগ্রতকালে জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয় দুই-ই বর্তমান। জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতার জ্ঞানের সৃষ্টি নয়। স্বপ্ন দেখার সময়ে জ্ঞানের বিষয় এবং জাগ্রতকালীন জ্ঞানের বিষয় একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। স্বাপ্ন জ্ঞানের বিষয় ব্যক্তিবিশেষের কাছে স্বপ্নকালেই শুধু প্রতিভাত হয় এবং জাগ্রতকালে তা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু জাগ্রতকালে জ্ঞানের বিষয় সাধারণত সকলের কাছেই প্রতিভাত হয়। কোনো ব্যক্তি বিশেষের কাছে প্রতিভাত হয় না। কিন্তু এজন্য স্বাপ্ন-জ্ঞানের বিষয় একান্ত অসৎ নয়। শঙ্করের মতে যা কখনোই কোনো জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না, তা-ই অসৎ। এই অর্থে 'বন্ধ্যাপুত্র', 'শশশৃঙ্গ', 'আকাশ-কুসুম' প্রভৃতি অসৎ। কারণ এদের পক্ষে কোনো জ্ঞানের বিষয়রূপে প্রতিভাত হওয়া অসম্ভব।

স্বপ্নকালীন অভিজ্ঞতার বিষয় জাগ্রতকালীন অভিজ্ঞতার বিষয়ের তুল্যরূপ না হলেও অন্তত স্বপ্নকালে প্রতিভাত হয় বলে 'বন্ধ্যাপুত্র'-এর মতো কখনোই অসৎ নয়। শঙ্কর এই জাতীয় বিষয়কে প্রাতিভাসিক সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। এই বিষয় একান্তভাবেই বিশেষ ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বিষয় হলেও প্রতিভাত হয় এবং এই দিক থেকে এর বিষয়ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে এই জাতীয় বিষয় কখনোই সকলের অভিজ্ঞতার বিষয় হতে পারে না।

জাগ্রতকালীন অভিজ্ঞতার বিষয় সকলের পক্ষেই সাধারণত একরূপ। শঙ্কর এই জাতীয় বিষয়কে ব্যবহারিক সত্য নামে অভিহিত করেছেন। এই বিষয় নিয়ে লোকব্যবহার সম্ভব। কিন্তু স্বাপ্নবিষয় নিয়ে কোনো লোকব্যবহারই সম্ভব নয়। সেইজন্যই বলা হয় 'নিশার স্বপন সুখে সুখী যে, কী সুখ তার?'

জাগ্রতকালীন জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাননির্ভর নয়—জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয় উভয়ই এই ক্ষেত্রে ব্যবহারিক সত্য। এই দিক থেকে শঙ্করের মত বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ এবং পাশ্চাত্য দর্শনের বার্কলের ভাববাদ উভয়ই জাগ্রত অভিজ্ঞতার বিষয়কে জ্ঞান নির্ভর বলে মনে করে। সুষুপ্তিকালে বা স্বপ্নহীন গভীর ঘুমে জ্ঞান থাকে

বটে, কিন্তু তাতে জ্ঞানের কোনো সাধারণ বিষয় থাকে না। সুষুপ্তি থেকে উঠে আমরা বলি—'খুব সুখে ঘুমিয়েছিলাম, কিছুই টের পাইনি'।

সুষুপ্তি অভিজ্ঞতার এই প্রকাশ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, আত্মা এই অবস্থায় জ্ঞানরূপে বর্তমান; এখানে জানবার মতো বাইরের কোনো বিষয় নেই। তবে আনন্দরূপ আত্মা নিজেই প্রদীপের মতো প্রকাশিত থাকে। আত্মা যদি আনন্দরূপ না হত, তবে কখনোই সুষুপ্তিতে আনন্দের অভিজ্ঞতা হত না, কারণ সুষুপ্তিতে আত্মা ছাড়া আর থাকে অজ্ঞান। অজ্ঞানে আনন্দ থাকতে পারে না। সুষুপ্তির আনন্দকে শঙ্কর সমল বলেছেন কারণ, এখানে আনন্দ অজ্ঞানরূপ মলের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি যা পাওয়া যায় সবই আত্মার রূপ বলে মানতে হয়। এই জ্ঞানরূপ ও আনন্দরূপ আত্মা যে সদরূপও বটে (অস্তিত্বশীল), এই বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

কারণ, আত্মা নেই, একথা ভাবাই যায় না। তাছাড়া অন্য যে কোনো জিনিসের অস্তিত্বই তো আত্মার অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। আত্মচৈতন্য না থাকলে কোনো বিষয়েরই তো প্রকাশ হতে পারে না। জাগ্রত বা স্বপ্নকালীন অভিজ্ঞতার বিষয়ের মতো কোনো বিষয় ছাড়াও আত্মা থাকতে পারে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত সুষুপ্তি অবস্থায় সৎ, চিৎ (জ্ঞান) ও আনন্দরূপ আত্মাই থাকে। সুষুপ্তিকালে এই আত্মার আভাসমাত্র পাওয়া যায়, সাধক তাঁর তূরীয় অভিজ্ঞতায় এই আত্মার পরিপূর্ণ ও অনাবৃত প্রকাশ উপলব্ধি করেন। শঙ্করের মতে যা অবাধিত বা কখনোই নেই এমন হয় না, তা-ই পারমার্থিক সত্য। এই অর্থে সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপ আত্মাই পারমার্থিক বা আত্যন্তিক সত্য। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তূরীয় এই সমস্ত অভিজ্ঞতাতেই আত্মা অবাধিত। অর্থাৎ আত্মা নেই, এমন কোনো অভিজ্ঞতাই হতে পারে না। সেইজন্য শঙ্কর আত্মাকেই চরম সত্য বলে উল্লেখ করেছেন।

অস্তিত্ব (সৎ), জ্ঞান (চিৎ) এবং আনন্দ এই আত্মার কোনো গুণ নয়, স্বরূপ। আত্মা জ্ঞানের বিষয় না হয়েও কখনোই অপ্রকাশিত থাকে না। এই অর্থেই আত্মা স্বপ্রকাশ। শঙ্করের মতে এই আত্মা অদ্বিতীয় এবং স্বরূপত নির্গুণ। এই আত্মাকে যখন নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত প্রভৃতি বলা হয়, তখন এই আত্মা অনিত্য নয়, বিভিন্ন মিশ্রণে অশুদ্ধ নয়, অবুদ্ধ বা অচেতন নয়, অমুক্ত বা বদ্ধ নয়, এসবই বোঝানো হয়ে থাকে। উপনিষদে এই জন্যই 'নেতি নেতি' করে এই আত্মার পরিচয় উদঘাটনের চেষ্টা হয়েছে। এই আত্মাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের সজাতীয় বিজাতীয় বা স্বগত কোনো ভেদই নেই।

একই জাতির অন্তর্গত দুটি ব্যক্তির যে ভেদ তাকে বলে সজাতীয় ভেদ; যেমন একটি গোরুর সঙ্গে অন্য আর-একটি গোরুর পার্থক্য। এই অর্থে ব্রহ্মের কোনো সজাতীয় ভেদ থাকতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। তার সঙ্গে ভেদ থাকবে কার? দুটি ভিন্ন জাতির যে ভেদ, তাকে বলে বিজাতীয় ভেদ; যেমন গোরুর সঙ্গে ঘোড়ার পার্থক্য। এই অর্থেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কোনো ভেদ থাকতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মের কোনো বিজাতি নেই। একই জিনিসের অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের ভেদকে স্বগত-ভেদ বলে; যেমন আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ভেদ। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ হওয়ায় নিরস। সুতরাং তাঁর স্বগতভেদ অসম্ভব।

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ বলে শূন্য নয়। তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে বলেছেন মন্দমতিরাই নির্গুণ ব্রহ্মকে শূন্য বলে মনে করে। ব্রহ্ম পূর্ণ স্বরূপ। সমস্ত বিশ্বই এই সনমূল, সদাশ্রম এবং সৎপ্রতিষ্ঠা। ভাবপদার্থ কখনোই অভাব বা শূন্যপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না। সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্ম বৌদ্ধদের শূন্য নয়।

আলোচনার সময়ে আমরা এই নির্গুণ ব্রহ্মকেই নামরূপ এবং কর্ম দ্বারা বিশেষিত করি। পণ্ডিতরা এই সব বিশেষণ আমাদের অপূর্ণ এবং অক্ষম আলোচনার অনুষঙ্গ বা অজ্ঞানের ফল বলে জানেন, কিন্তু মূর্খেরা এগুলোকে সত্য বলে মনে করে। নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা এই সমস্ত অনুষঙ্গের ব্যবহার ভিন্ন সম্ভব নয়। নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই আমরা ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা রক্ষক এবং সংহারক রূপে কল্পনা করি। এই ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। এই ঈশ্বরকে আমরা করুণাসিদ্ধ, পরম প্রেমিক ও ভক্তের ভগবান বলেও মনে করি।

সৎ-চিৎ-আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। স্রষ্টা, রক্ষক, সংহারক প্রভৃতি তাঁর তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপত ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ; সৎ-চিৎ ও আনন্দ ভিন্ন নয়। চিৎ-ই সৎ, চিৎ-ই আনন্দ। চিৎ অবাধিত বলে সৎ। চিৎ ইষ্ট বলে আনন্দ। আনন্দ ভিন্ন অন্য কিছু পরম ইষ্ট নয়। ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত আত্মা এবং একান্ত নির্গুণ। কিন্তু আমাদের লোকব্যবহারে এই ব্রহ্মই আবার স্রষ্টা, রক্ষক, সংহারক, করুণামৃতসিন্ধু ও ভক্তের ভগবান বলে কথিত। এঁর নাম ঈশ্বর। পারমার্থিক দৃষ্টিতে যে ব্রহ্ম নির্গুণ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সে-ই সগুণ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, শঙ্করের মতে পারমার্থিক সৎও সত্য। অদ্বিতীয় আত্মার নির্গুণ সেই ব্রহ্ম এবং যা কোনো জ্ঞানেরই বিষয় নয়। যা জ্ঞানের বিষয় তা কখনোই অসৎ হতে পারে না। সেই জন্যই শঙ্কর জাগ্রত এবং স্বাপ্ন অভিজ্ঞতার বিষয়কে সৎ বা সত্য বলেছেন। অসতের দিক থেকে এরা সৎ বা সত্য। কিন্তু পারমার্থিক সৎ বা সত্য আত্মার দিক থেকে এরা মিথ্যা।

শঙ্করের মতে যা আত্মার মতো সৎ নয় আবার বন্ধ্যাপুত্রের মতো অসৎ নয় বা সৎ ও অসৎ দুই-ই একসঙ্গে নয়, তা-ই মিথ্যা। এই মিথ্যা আবার দ্বিবিধ—ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক।

শঙ্করের মতে পারমার্থিক ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক ভেদে তিন প্রকার সৎ বস্তু নেই, পারমার্থিক সৎ ভ্রান্তিবশত ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক রূপে প্রতীত। যে জ্ঞানের বিষয় দিয়ে ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় এবং যার লোকব্যবহার আছে, তা-ই ব্যবহারিক মিথ্যা। এই জাতীয় মিথ্যা বিষয় সকলের কাছেই সাধারণত একরূপ এবং সাধারণত সবাই তা একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করতে পারে। সমস্ত জাগতিক বস্তুই এই জাতীয় মিথ্যা। এদের দ্বারা ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সকলের কাছেই সাধারণত এদের একই রূপে প্রকাশ এবং সবাই এদের একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করতে পারে। স্বাপ্ন অভিজ্ঞতার বিষয়, ভ্রান্ত জ্ঞানের বিষয় (যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রমকালে সর্প) প্রভৃতি প্রাতিভাসিক মিথ্যা। এরা জ্ঞানের বিষয় হিসাবে প্রতিভাত হয় বলে অসৎ হতে পারে না; আবার আত্মার মতো একান্ত অবাধিত নয়, সুতরাং পারমার্থিক সৎ-ও নয়। জগতের মতো এদের দিয়ে কোনো লোকব্যবহার হতে পারে না। এমনকি এরা একই সঙ্গে জগতের মতো সকলের জ্ঞানের বিষয়ও হতে পারে না, এজন্যই এদের ব্যবহারিক মিথ্যা থেকে নিম্নশ্রেণির প্রাতিভাসিক মিথ্যা নামে অভিহিত করা হয়েছে। রাখাল বালক রঙ্গমঞ্চে রাজার ভূমিকায় অভিনয়কালে রাজ্য জয় করে তা শাসন করে। স্বরূপত সে রাখাল, কিন্তু অভিনয়ের দিক থেকে সে রাজা। শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম নির্গুণ, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে তা সগুণ ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হয়। উপনিষদে ব্রহ্মকে 'সত্যম, জ্ঞানম, অনন্তম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এইক্ষেত্রে ব্রহ্ম অসত্য নয়, অজ্ঞান নয় এবং সান্ত নয়—এমনিভাবে 'নেতি নেতি' করে বুঝতে হবে বা সত্য জ্ঞান ও অনন্তকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলেও বোঝা যেতে পারে।

২। জগৎ মিথ্যা : শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা। আমরা আগেই বলেছি, শঙ্কর দর্শনে যা আত্মার মতো নিত্য অবাধিত নয়, আবার বন্ধ্যাপুত্রের মতো জ্ঞানের বিষয়ই হতে পারে না, এমন অসৎ নয়, তাই মিথ্যা। জগৎ আত্মা নয়। আত্মার বিষয়। আমরা জগৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তূরীয় অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ কালে দেখেছি সমস্ত অভিজ্ঞতায় একমাত্র আত্মাই হল তা যা অনিত্য নয়, জ্ঞানের বিষয় নিত্য পরিবর্তনশীল।

আত্মা অনিত্য নয় বলেই পারমার্থিক সৎ, আর জ্ঞানের বিষয় জগৎ অনিত্য ও পরিবর্তনশীল বলেই মিথ্যা। এই জগৎ একদিকে স্বপ্ন অভিজ্ঞতার বিষয় ও রজ্জুতে সর্প ভ্রমকালে সর্পের মতো একান্তভাবে ব্যক্তি-বিশেষের কাছে প্রতিভাত নয়, অন্যদিকে আবার ব্রহ্মের মতো আত্যন্তিক সৎও নয়। পারমার্থিক সত্য বা ব্রহ্মের উপলব্ধি হলে জগৎ বাধিত হয়। জগৎ মিথ্যা বলতে শঙ্করাচার্য একথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

শঙ্করের পরবর্তীকালে অদ্বৈত বেদান্তীরা মিথ্যাত্বের পাঁচটি লক্ষণ দিয়েছেন। পঞ্চপাদিকার লেখক পদ্মপাদ মিথ্যাত্বের লক্ষণ দিয়েছেন 'সদসত্তানধিকরনত্বম'। যা সৎ বা অসতের অধিকরণ বা অধিষ্ঠান নয়, তা-ই মিথ্যা। জগৎ সৎ বা অসতের অধিকরণ নয়। যা কখনোই বাধিত হয় না তা সৎ আর যা কখনোই প্রতিভাত হয় না তা অসৎ (বন্ধ্যাপুত্র)। জগৎ ব্রহ্মজ্ঞান হলে বাধিত হয়, সুতরাং তা সৎ নয়, আবার জগৎ প্রতিভাত হয়, আমরা তা দেখি, সুতরাং তা বন্ধ্যাপুত্রের মতো অসৎ নয়।

বিবরণকার প্রকাশাত্মন বলেছেন, 'প্রতিপন্নোপাধো ত্রৈকালিক নিষেধ প্রতিযোগিত্বম মিথ্যাত্মক'। অর্থাৎ যা যেখানে জ্ঞান হয় সেখানেই ত্রিকালিক নিষিদ্ধ হয়, তা-ই মিথ্যা। শুক্তিতে রজত জ্ঞাত হয়, আবার শুক্তিতেই রজত ত্রিকালেই নিষিদ্ধ হয় বলে তা মিথ্যা। নিহিতার্থ এই যে, মিথ্যা প্রতিভাত হয়, কিন্তু নিষিদ্ধও হয়। জগৎ প্রতিভাত হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান হলে জগতের ত্রৈকালিক নিষেধ হয়। সেজন্যই জগৎ মিথ্যা।

প্রকাশাত্মন মিথ্যাত্বের আর-একটি লক্ষণও দিয়েছেন। 'জ্ঞান নির্বত্যত্বম মিথ্যাত্বম্' বিবরণ মতে মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ। যা জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়, তা-ই মিথ্যা। অর্থাৎ যা আমরা প্রত্যক্ষ করি বা জানি, কিন্তু পরে যথার্থ জ্ঞান হলে যা আর থাকে না তা-ই মিথ্যা। জগৎ আমরা প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু একমাত্র সৎ ব্রহ্মের জ্ঞান হলে জগৎ আর থাকে না বলে জগৎ মিথ্যা।

চিত্রসুখাচার্য মিথ্যাত্বের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন 'স্বাশ্রয় নিষ্ঠাত্যন্তভাব প্রতিযোগিত্বম বা মিথ্যাত্বম্'। যার অধিষ্ঠান তার ত্রৈকালিক নিষেধেরও অধিষ্ঠান, তা-ই মিথ্যা। অর্থাৎ যা প্রতিভাত হলেও ত্রিকালেই নিষিদ্ধ, তা-ই মিথ্যা। জগৎ প্রতিভাত হলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে তার ত্রৈকালিক নিষেধ হয় বলে জগৎ মিথ্যা। প্রকাশাত্মন মিথ্যাত্বের যে প্রথম লক্ষণ দিয়েছেন (প্রতিপন্নোপাধো ত্রৈকালিক নিষেধ প্রতিযোগিত্বম মিথ্যাত্মম) তারই পুনরুল্লেখ।

চিৎ সুখাচার্যের লক্ষণে হয়েছে বলে মনে হয়। তবে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেছেন, প্রকাশাত্মনের প্রথম লক্ষণের বিশেষ্য ও বিশেষণ চিৎসুখের লক্ষণে স্থান পরিবর্তন করেছে বলে এই দুটি লক্ষণের ভিন্নতা স্বীকার করতে হয়।

আনন্দবোধ অসৎকে কোনো কোটি না ধরে 'সদা বিবিক্তত্বম মিথ্যাত্বম' মিথ্যাত্বের এই লক্ষণ দিয়েছেন। যা সৎ ভিন্ন তা-ই মিথ্যা। যা কোনোকালে বাধিত হয় না, তা-ই সৎ। এই অর্থে ব্রহ্ম একমাত্র সৎ। জগৎ ব্রহ্ম বা চিৎ ভিন্ন বলে মিথ্যা।

পাঁচটি মিথ্যাত্বের লক্ষণের দ্বারা এই বোঝানো হয়েছে যে, মিথ্যাত্ব পাঁচ প্রকারের বোঝা যেতে পারে এবং এই প্রত্যেক প্রকারই স্বতন্ত্রভাবে গ্রাহ্য। আসলে যা প্রতিভাত হয়েছে বাধিত হয়, তা-ই মিথ্যা।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—জগতের মিথ্যাত্ব কি মিথ্যা, না সত্য? যদি জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হয়, তবে জগৎ সত্য হবে এবং তাতে অদ্বৈতবাদের হানি হবে। আর যদি মিথ্যাত্ব সত্য হয়, তা হলেও একই দোষ হবে। মিথ্যাত্ব দৃশ্য হয়েও যদি সত্য হবে এবং তাতে অদ্বৈতবাদের বিনাশ হবে।

এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন—যে কারণে জগৎ মিথ্যা (দৃশ্য বলে) সে-কারণেই মিথ্যাত্বও মিথ্যা। সুতরাং জগতের মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব জ্ঞান সত্য একথা সূচনা করে না। যেমন অট্টালিকা নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাগভাবের নাশ হয়। কিন্তু যখন অট্টালিকা ধ্বংস হয় (প্রাগভাবের নাশের নাশ) তখন আবার প্রাগভাবের উদ্ভব হয় না, যার উদ্ভব হয় তার নাম ধ্বংসভাব। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় অদ্বৈতমতে জগৎ দৃশ্য, পরিচ্ছিন্ন এবং জড় বলে মিথ্যা।

অদ্বৈত সিদ্ধান্ত গ্রন্থে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে। বর্তমান লেখকের 'The Advaita concept of Falsty—A critical study' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে।

উপনিষদে 'নেহনানাস্তি কিঞ্চন', 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহনানেব পশ্যতি' প্রভৃতি। বৈচিত্র্যের সত্যতা বিরোধী সুস্পষ্ট বাক্য পাওয়া যায়। 'যতো বাচা নিবর্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ', 'যস্যামতং মতং, তস্য মতং যস্য নবেদ সঃ'—প্রভৃতি বাক্যে ব্রহ্ম নির্গুণ একথাও সুস্পষ্ট। নির্গুণ ব্রহ্ম তো জগতের স্রষ্টা হতে পারেন না। সর্বশেষে 'সদেব সৌম্যেদম্ অগ্রে আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্' প্রভৃতি উপনিষদ বাক্যে সত্য এক ও অদ্বিতীয় সৎ বলে কথিত হয়েছে। এই সমস্ত বাক্য বিচারে জগৎ বৈচিত্র্যকে মিথ্যা না বলে উপায় নেই।

এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—কোনো কোনো উপনিষদে তো আবার জগৎ-সৃষ্টিকে সত্য বলেই উল্লেখ করা হয়েছে, ঈশোপনিষদের 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম'—প্রভৃতি বাক্য বিস্মৃত হলে চলবে কেন?

শঙ্করাচার্য জগৎ সৃষ্টির সত্যতা নির্দেশক উপনিষদ বাক্য এবং বৈচিত্র্য নিষেধক উপনিষদ বাক্যের মধ্যে সঙ্গতি প্রদর্শনের জন্য উপনিষদ থেকেই 'মায়া' কথাটি গ্রহণ করে জগতের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। ঋক বেদে 'ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' (এক ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বহুরূপে প্রকাশিত হন) এই বাক্য পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদও এ কথার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঈশ্বরের মায়াশক্তি থেকেই যে জগতের উৎপত্তি তা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শঙ্কর বলেন, জগৎ মায়ার সৃষ্টি বা জগৎ মায়া। মায়াকে ঈশ্বরের শক্তি হিসেবে কল্পনা করা যায়। অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন অগ্নি থেকে অভিন্ন, মায়া শক্তিও তেমনই ঈশ্বর থেকে অভিন্ন। যাদুকরের যাদুশক্তির মতোই ঈশ্বরের এই শক্তি একমাত্র অজ্ঞ লোককেই ভ্রান্তিতে ফেলে। যাদুকর যখন একটি টাকাকে দশটি টাকায় রূপান্তরিত করে, তখন যারা যাদুশক্তির ফাঁকি বোঝে না, তারাই তা সত্য বলে মনে করে এবং যাদুশক্তির তারিফ করে। কিন্তু যারা যাদুশক্তির ভেল্কি বোঝে, তারা যাদুশক্তিকে একান্তভাবেই ফাঁকি বলে জানে এবং যাদুর সৃষ্টিকে মিথ্যা বলেই মানে।

তেমনই আমরা যারা অজ্ঞ তারাই ঈশ্বরের মায়াশক্তিকে সত্য বলে মনে করি এবং এই শক্তিসৃষ্ট জগৎকে সত্য বলে গ্রহণ করি। কিন্তু যাঁরা প্রাজ্ঞ তাঁরা মায়াশক্তি যে আসলে কোনো শক্তিই নয় এবং জগৎ যে মিথ্যা, তা সহজেই উপলব্ধি করেন। যাদুকর কখনোই যাদুশক্তিকে কোনো সত্যিকারের শক্তি বলে মনে করেন না, ঈশ্বরেরও মায়া যে কোনো শক্তি নয় তা বোঝেন।

আসলে অজ্ঞলোকের কাছেই মায়া ঈশ্বরের শক্তি এবং জগৎ এই শক্তির সৃষ্টি, প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বরের কাছে মায়া কোনো শক্তিই নয় এবং জগৎও সত্য নয়।

মায়া স্বরূপত ভ্রান্তি উৎপাদনকারী অজ্ঞান বিশেষ। ভ্রান্তিতে আমরা একটি জিনিসের স্থানে অন্য আর-একটি জিনিস দেখি, যেখানে রজ্জু আছে সেখানে দেখি সর্প। একটি জিনিসে আর-একটি জিনিস দেখার কারণ সত্য জিনিসটির অজ্ঞান। রজ্জুকে রজ্জু বলে জানলে রজ্জুতে সর্প-দর্শন অসম্ভব। রজ্জুর অজ্ঞানের জন্যই রজ্জুতে সর্পের ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। অজ্ঞানের দুই কাজ—আবরণ ও বিক্ষেপ।

অজ্ঞান যেমন সত্য জিনিসকে ঢেকে দেয় (আবরণ), তেমনই আবার অন্য আর-একটি জিনিস তাতে প্রকাশিতও করে (বিক্ষেপ)। আমরা রজ্জুর অজ্ঞানজন্য যখন রজ্জুতে সর্প দেখি, তখন রজ্জুর অজ্ঞান যেমন রজ্জুকে আবৃত করে, তেমনি আবার রজ্জুতে সর্প বিক্ষেপও করে। শঙ্করের মতে অজ্ঞান বা অবিদ্যা কোনো অভাব পদার্থই নয়, একান্তভাবেই অবরূপ।

কোনো অভাব পদার্থই বিক্ষেপ সৃষ্টি করতে পারে না। পরবর্তীকালে বিবরণকার অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব প্রদর্শনের জন্য অনেক প্রমাণ দিয়েছেন। আমরা স্থানাভাবে এবং অত্যন্ত জটিল বলে তা এখানে উদ্ধৃত করছি না। তবে পরে সদানন্দকৃত অজ্ঞানের লক্ষণ আলোচনাকালে অজ্ঞান কেন জ্ঞানভাব হয় না তা আলোচনা করেছি। অজ্ঞান বা মায়া শুধু ভাবরূপ নয়, অনাদিও বটে। কারণ, অজ্ঞান বা মায়া কখন উৎপন্ন হয়েছিল তা নির্ণয় করা অসম্ভব। নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে অজ্ঞানজন্যই আমরা তাঁর পরিচয় না পেয়ে বিচিত্র জগতের পরিচয় পাই। তবে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা সত্যের স্বরূপ বোঝেন এবং জগতের বৈচিত্র্য তাঁদের আর ভোলাতে পারে না। অজ্ঞান অনাদি হলেও অনন্ত নয়। অজ্ঞান জ্ঞান নাশ্য, অর্থাৎ সত্যের জ্ঞান হলে অজ্ঞান থাকে না।

সদানন্দ 'বেদান্তসার' গ্রন্থে অজ্ঞানের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন—'সদাসদভ্যাম নির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং, জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি অজ্ঞান।' 'সদসদভ্যাম নির্বচনীয়ম্' অর্থাৎ অজ্ঞান সৎ-ও নয়, অসৎ-ও নয়, অনির্বচনীয়। অজ্ঞান সৎ নয়, কারণ জ্ঞান হলে অজ্ঞানের নাশ হয়। যার নাশ হয় তা সৎ নয়। অজ্ঞান অসৎ-ও নয়, কারণ অজ্ঞানের কার্য জগৎ প্রতিভাত হয়, কিন্তু অসৎ কখনোই প্রতিভাত হয় না। বন্ধ্যাপুত্র অসৎ, কারণ তা কখনোই প্রতিভাত হতে পারে না।

অজ্ঞানকে সৎ বা অসৎ বলে উল্লেখ করা যায় না বলে তা অনির্বচনীয়। অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪।৫) 'অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ' বাক্যে এই তিন গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাংখ্য দর্শনে এই তিনটি গুণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমরা সাংখ্য দর্শন আলোচনা কালে তার বিবরণ দিয়েছি। অজ্ঞানে এই তিনটি গুণ বর্তমান। অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন যে কোনো বস্তুতেই এদের পাওয়া যায়। অজ্ঞান জ্ঞান-বিরোধী। অর্থাৎ জ্ঞান হলে অজ্ঞান থাকে না। অজ্ঞান ভাবরূপ। একথা বলার তাৎপর্য এই যে, অজ্ঞান জ্ঞানাভাব বিলক্ষণ।

ন্যায়মতে, অজ্ঞান জ্ঞানাভাব। অদ্বৈতবাদীরা এইমত মানেন না। তাঁরা প্রশ্ন করেন—অজ্ঞান বলতে কোন জ্ঞানের অভাব বোঝায়? তা চৈতন্যরূপ জ্ঞানের অভাব হতে পারে না। কারণ চৈতন্য নিত্য। যা নিত্য তার অভাব অসিদ্ধ। তবে কি অজ্ঞান বৃত্তিজ্ঞানের অভাব? তাও হতে পারে না। কারণ, বৃত্তি স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞান নয়। চৈতন্যের দ্বারা ভাস্বর হলেই বৃত্তি জ্ঞান পদবাচ্য, আর চৈতন্যের অভাব অসিদ্ধ। অজ্ঞান কি তবে বিশেষ বা সাধারণ জ্ঞানের অভাব? বিশেষ জ্ঞানের অভাব হতে পারে না, কারণ কোনো বিশেষ বিষয়ের জ্ঞানের অভাবের ক্ষেত্রেও অন্য কোনো না কোনো বিষয়ের জ্ঞান থাকেই।

অজ্ঞান সাধারণ জ্ঞানের অভাবও হতে পারে না, কারণ তা হলেও তাতে অজ্ঞানকে ব্রহ্মের মতো সৎ বলা যায় না। যদি তা বলা হয় তবে অজ্ঞানের নাশ হবে না এবং মুক্তিও হবে না। আসলে অজ্ঞানকে ভাবরূপ বলার অর্থ তা অভাব বিলক্ষণ। বস্তুত অজ্ঞান ভাববস্তুও নয়। অবিদ্যা ভাব ও অভাব থেকে বিলক্ষণ। ভাবত্বও অভাবত্ব রূপে অজ্ঞান নিরূপণ করা যায় না বলে অবিদ্যা অনির্বাচ্য। অজ্ঞানকে 'যৎকিঞ্চিদিতি' বলা হয়েছে। তার অর্থ অজ্ঞান অনির্বচনীয় হলেও অসৎ নয়। জগতের কারণ রূপে তা কিছু একটা অস্থির পদার্থ। অবিদ্যা অনাদিও বটে।

অবিদ্যার আর কোনো উপাদান নেই। সমস্ত কার্যপ্রপঞ্চের যা উপাদান তাকে সাদি বলা যায় না। বিশেষত যা সৃষ্টির আদি কার্যের উপাদান—সৃষ্টির প্রারম্ভে যে কার্য উৎপন্ন হয়, তার উপাদান অবশ্যই সৃষ্টির পূর্বে ছিল স্বীকার করতে হবে। সুতরাং সৃষ্টিতে তার উৎপত্তি হয়নি। সৃষ্টিতে যে বস্তু উৎপন্ন হয় না তা-ই অনাদি। শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি অবস্তু, তা উৎপন্ন না হলেও অনাদি বলা যায় না। উৎপত্তি-রহিত বস্তুকেই অনাদি বলে। সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকগণই মূল উপাদানকে অনাদি বলেছেন। বৈশেষিক মতে পরমাণু অনাদি, সাংখ্য মতে প্রকৃতি অনাদি, এইরূপ অদ্বৈত বেদান্তীদের মতে প্রপঞ্চের কারণ অজ্ঞান অনাদি।

বিবরণ, চিৎসুখী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে অজ্ঞানের তিনটি লক্ষণ পাওয়া যায়—

(১) অনাদি ভাবরূপ হয়েও যা জ্ঞান নির্বত তা-ই অজ্ঞান।

(২) যা ভ্রমের উপাদান তা অজ্ঞান।

(৩) যা জ্ঞান নির্বত্য তা-ই অজ্ঞান।

এই সমস্ত লক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা মহামহোপাধ্যায় ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ রচিত 'অদ্বৈতবাদে অবিদ্যা' গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

এই প্রসঙ্গে বলা ভালো, মায়াকে প্রকৃতি ও অব্যক্ত বলা হয়। তবে সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি ও শঙ্কর দর্শনের মায়া এক নয়। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি সত্য বলে কথিত। কিন্তু শঙ্কর দর্শনে মিথ্যা বলে পরিচিত। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত, শঙ্কর মতে ব্রহ্ম ভিন্ন মায়া অগ্রাহ্য। মায়াকে মিথ্যা বলার কারণ, মায়া ব্রহ্মের মতো নিত্য অবাধিত বা পারমার্থিক সৎ নয়, আবার বন্ধ্যাপুত্রের মতো একেবারে প্রতিভাত হতে পারে না, এমন অসৎ-ও নয়।

যা সৎ ও অসৎ কোনোটাই নয়, তা যেমন মিথ্যা, তেমনই অনির্বচনীয়। মায়া অনির্বচনীয় এইজন্য যে, সৎ ও অসৎ কোনো প্রত্যয় দিয়েই একে বোঝা যায় না। সুতরাং মায়া অনাদি, অনির্বচনীয়, মিথ্যাভূত ও ভাবরূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যা।

শঙ্করের মায়াবাদ পরস্পর বিরুদ্ধ উপনিষদ বাক্যের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া ছাড়াও কয়েকটি অত্যন্ত জটিল দার্শনিক সমস্যারও যুক্তিযুক্ত সমাধান দেয়।

(১) সত্য যদি অদ্বৈত হয়, তবে জগৎ-বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দেওয়া খুবই কষ্টকর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে অদ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা এই ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্য দর্শনে স্পিনোজা, হেগেল, ব্রেডলি প্রমুখ অনেকেই এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছেন।

আমাদের বিশ্বাস, একমাত্র শঙ্করই এই বিষয়ে যা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত, তা যতই মানসিক প্রবণতা বিরোধী হোক না কেন, গ্রহণ করতে একটুও পশ্চাৎপদ হননি। যুক্তি অনুধাবনের এই বলিষ্ঠতা অন্য কোনো দার্শনিকের মধ্যেই দেখা যায় না। আত্মা যদি অদ্বিতীয় ও একান্ত সত্য হয়, তবে অনাত্মা এই জগৎ মিথ্যা বা মায়া ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না। আত্মা অনাত্মা উভয়ই সত্য, সত্য হলে অদ্বৈতবাদ থাকে না।

আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করব, আবার অনাত্মা জগৎকেও সত্য বলব। এ কখনোই হতে পারে না। আমরা পূর্বেই আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে, একমাত্র আত্মাই সমস্ত অভিজ্ঞতায় অবাধিত বা নিত্য বর্তমান। সুতরাং আত্মাই পরমার্থ সত্য একথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। যা থাকে না তা কি কখনো সত্য হতে পারে? আর সত্যই বা-কি কখনো না-ই এমন হতে পারে? এই যদি প্রকৃত অবস্থা হয়, তবে অনাত্মা জগৎ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। জগৎ স্বপ্ন বা রজ্জুতে প্রতিভাত সর্পের মতো কোনো ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতার বিষয় নয়, আবার আত্মার মতো নিত্য অবাধিতও নয়। একে ব্যবহারিক মিথ্যা ছাড়া আর কী বলা যাবে?

(২) মায়াবাদের আর-এক নাম বিবর্তবাদ। আমরা সাংখ্য দর্শন আলোচনার সময় বলেছি, অসৎ কার্যবাদ অপেক্ষা সৎ কার্যবাদই অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য, আবার সৎ কার্যবাদের দুটি রূপের মধ্যে পরিণামবাদ থেকে বিবর্তবাদই অধিকতর সঙ্গত।

আমরা পুনরুক্তি পরিহারের জন্য প্রাসঙ্গিক সমস্ত কথা আবার বলছি না। পাঠক অনুগ্রহ করে সাংখ্য দর্শন অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত এই প্রসঙ্গ অনুধাবন করবেন। সৎ কার্যবাদ অনুসারে কার্যকারণে সৎ বা বর্তমান থাকে? যার মধ্যে যে-বস্তুর সম্ভাবনা নেই, তার থেকে সে-বস্তুর উদ্ভব হতে পারে না। কাঠে তেলের কোনো সম্ভাবনা নেই বলেই কাঠ থেকে তেল বের হয় না। কিন্তু তিলে তেলের সম্ভাবনা আছে, তাইতো তিল থেকে তেল পাই।

কার্য যদি বস্তুত কারণেই থাকে, তবে কার্যকে কারণের বিবর্ত বা প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না। সর্প যেমন রজ্জুতে বিবর্ত বা প্রকাশ। সুতরাং কার্য জগৎকে কারণব্রহ্মের বিবর্ত বা মায়া ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। উপনিষদেও 'বাচারম্ভর্ণো বিকারনামধেয়ং মৃত্তিক্যেত্যেব সত্যম' প্রভৃতি বাক্যে মৃত্তিকা নির্মিত বিভিন্ন বস্তুতে বা কার্যে মৃত্তিকা বা কারণের সত্যতাই ঘোষিত হয়েছে। কারণই সত্য। কার্য তার বিবর্ত মাত্র। এই ক্ষেত্রে স্মরণীয় এই যে, বস্তুত অদ্বৈতমতে কারণের অতিরিক্ত কার্যের কোনো সত্তা নেই। শঙ্করাচার্য 'তদনন্যত্ব মারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ' (২।১।১৪)। এই সূত্রের ভাষ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এইজন্য অনেকে বলেন, অদ্বৈতমতে যেহেতু কারণের অতিরিক্ত কার্য সৎ নয়, মিথ্যা; সুতরাং অদ্বৈতমতকে সৎ কার্যবাদ না বলে সৎ কারণবাদ বললেই ভালো হয়। অবশ্য যখন কার্য থাকে না তখন কারণও থাকে না। অদ্বৈতমতে একমাত্র সত্যব্রহ্ম নির্গুণ। পরমার্থত ব্রহ্ম কারণ নন। জগৎ নামক কার্যও নেই।

কারণের অতিরিক্ত কার্য যে নেই তা যেমন ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্যে 'যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয় মৃত্তিক্যেত্যেব সত্যম্' (হে সৌম্য—শ্বেতকেতো, যেমন মৃত্তিকা জানলে সমস্ত মৃন্ময় বস্তু জানা হয়, জানা হয় যে মৃত্তিকাই সত্য; বাক্যসৃষ্ট বিকার সকল নাম ব্যতীত অন্য কিছু নয়) থেকে জানা যায়, তেমনি বিচার করেও বোঝা যায়।

যদি কারণের অতিরিক্ত কার্য স্বীকার করা হয়। তাহলে প্রশ্ন হবে—কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ কী? তারা কি একান্ত অভিন্ন, একান্ত ভিন্ন না ভিন্নাভিন্ন? একান্ত অভিন্ন হতে পারে না, হেতু এই যে, কারণ ও কার্য অভিন্ন

হলে তাদের সম্বন্ধের কোনো প্রশ্ন হতে পারে না, এবং কারণ ও কার্য আলাদা করে স্বীকারেরও অর্থ হয় না। আর যদি একান্ত ভিন্ন হয়, তবে কারণ ও কার্য উৎপন্নই করতে পারবে না এবং কার্যকে কারণের কার্যও বলা যাবে না। কারণ ও কার্য ভিন্নাভিন্নও হতে পারে না। কারণ ভিন্ন ও অভিন্ন বিরুদ্ধ বলে কখনোই একসঙ্গে কোথাও থাকতে পারে না। এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, কার্য কারণ থেকে ভিন্নও হতে পারে না, অভিন্নও হতে পারে না, আবার ভিন্নাভিন্নও হতে পারে না। অর্থাৎ কার্য অনির্বচনীয় মিথ্যা। সুতরাং যাকে আমরা কার্য বলি তা কারণের মিথ্যা প্রকাশ বা বিবর্ত।

(৩) জগতের যে কোনো বস্তুই অনির্বচনীয় স্বভাব। সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না বলে জাগতিক বস্তু অনির্বচনীয়। যা নিত্য তাই তো সৎ! জাগতিক বস্তু তো নিত্য নয়। তবে তা সৎ হবে কী করে? কিন্তু সেজন্য কি জগতের বস্তু অসৎ? তাও তো নয়, বন্ধ্যাপুত্রের মতো যে-সমস্ত জিনিস কখনোই প্রতিভাত হয় না, তা-ই তো অসৎ। জাগতিক বস্তু তো আমরা সকলেই দেখি, তবে তা অসৎ হবে কেন? সুতরাং যে কোনো জাগতিক বস্তুই সৎ বা অসৎ নয় বলে অনির্বচনীয়। যে কোনো একটি জাগতিক বস্তু অন্য আর-একটি জাগতিক বস্তুর সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু অনির্বচনীয় জগৎ কী করে হল? যা অনির্বচনীয় তা সৎ বা অসৎ কারোরই সৃষ্টি হতে পারে না। একমাত্র অনির্বচনীয়ই অনির্বচনীয়ের কারণ হতে পারে। জগতের নির্বচনীয় কারণ আবার যদি সাদি হয়, তবে তারও একটি অনির্বচনীয় কারণ খুঁজতে হবে এবং এমনি করে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। এই অনবস্থা পরিহারের জন্য অনির্বচনীয় জগৎ অনির্বচনীয় অনাদি মায়ার সৃষ্টি বলেই স্বীকার করা সঙ্গত।

(৪) জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব স্বয়ংসিদ্ধ নয়। চৈতন্য ভিন্ন এদের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। কিন্তু চৈতন্য স্বপ্রকাশ, অন্য বস্তু নিরপেক্ষ। আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি চৈতন্য ছাড়া বিষয় থাকতে পারে না, কিন্তু বিষয় ছাড়া (সুষুপ্তি অবস্থায়) চৈতন্য থাকতে পারে। সুতরাং বিষয়ের অস্তিত্ব চৈতন্যসিদ্ধ, কিন্তু চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বয়ংসিদ্ধ। চৈতন্য সবসময়েই প্রকাশিত।

স্বয়ংসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ চৈতন্য যদি সত্য হয়, তবে তন্নির্ভর বস্তু কী হবে? কখনোই চৈতন্যের মতো সত্য হবে না। অবশ্য বন্ধ্যাপুত্রের মতো অসৎ বা স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতার বিষয় বা রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির বিষয়ের মতো প্রতিভাসকাল মাত্রও স্থায়ী হবে না। শঙ্কর এই জাতীয় বস্তুর নামই দিয়েছেন ব্যবহারিক মিথ্যা। একে মিথ্যা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যাবে?

এই প্রসঙ্গে পরিষ্কার করে বলে রাখা দরকার শঙ্কর বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের মতো মনের ভাব বাহ্য বিষয়াকারে প্রকাশিত হয়, এমন কথা কোথাও স্বীকার করেননি। বরং তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করেছেন। শঙ্কর জ্ঞানকে বস্তুতন্ত্র বলেছেন। সুতরাং তাঁর মতে সাধারণ জ্ঞান কখনোই বিষয় ছাড়া হতে পারে না। এই মত বিজ্ঞানবাদ হবে কী করে? শঙ্করের মায়াবাদ শূন্যবাদও নয়। শঙ্কর বলেছেন, অধিষ্ঠানের সত্যতা স্বীকার না করলে জগৎ কোথায় নিষিদ্ধ বা নাই বলা হবে? জগতের নিষেধ বা জগৎ নাই বলতে হলে কোথায় জগৎ নাই তা নিশ্চয়ই বলা দরকার।

শূন্যবাদীরা এ কথার জবাব দিতে পারেন না। শুধু বলেন, ব্রহ্মে জগৎ নিষিদ্ধ হয়। ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান। আর-একটি কথা, শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা হলেও স্বপ্নের মতো অলীক নয়। আমরা আগেই বলেছি, শঙ্করের মতে স্বাপ্ন অভিজ্ঞতার বিষয় প্রাতিভাসিক মিথ্যা, কিন্তু জগৎ ব্যবহারিক মিথ্যা।

মায়া সংযুক্ত ব্রহ্ম থেকে কি ক্রমানুসারে বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে সমস্ত উপনিষদেই একরকম বিবরণ পাওয়া যায় না। একটি বিশিষ্ট বিবরণ অনুসারে আত্মা বা ব্রহ্ম থেকে প্রথমত আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ এবং ক্ষিতি এই ক্রমানুসারে পঞ্চমহাভূতের আবির্ভাব ঘটে। এই পঞ্চমহাভূত পাঁচ প্রকার বিভিন্নভাবে মিশ্রিত হয়ে পঞ্চভূতের সৃষ্টি করে। ভৌত আকাশ ১/২ ভূত আকাশ এবং বাকি চারটি মহাভূতের প্রত্যেকটির ১/৮ অংশ থেকে সৃষ্টি। এমনি করে অন্যান্য ভূতও সেই মহাভূতের অর্ধাংশ এবং অন্যান্য মহাভূতের প্রত্যেকটির এক-অষ্টমাংশের সংমিশ্রণে সৃষ্টি। এই প্রক্রিয়ার নাম পঞ্চীকরণ। শঙ্করাচার্য এই প্রক্রিয়া স্বীকার করেছেন।

ভ্রান্ত জ্ঞানের বিষয় সৎ ও অসৎ-বিবিক্ত অনির্বচনীয় এই ধারণার ওপর নির্ভর করেই শঙ্করের জগৎ-মিথ্যাত্ব ধারণা গড়ে উঠেছে। রজ্জুতে সর্প দর্শনরূপ ভ্রান্তজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় সর্প, শঙ্করের মতে অসৎ নয়। বন্ধ্যাপুত্রের মতো অসৎ জিনিস কখনোই প্রতিভাত হয় না এবং তাতে লোকে ভয়ও পায় না। রজ্জুতে সর্প দর্শনকালে সর্প প্রতিভাত হয় এবং ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সর্পকে ভয় করে ছুটেও পালায়। সুতরাং এই সর্প অসৎ নয়।

যা সৎ তা কখনোই না-ই হতে পারে না। কিন্তু আলো নিয়ে এলেই রজ্জুতে প্রতিভাত সর্প আর থাকে না। সুতরাং এই সর্পকে সৎ-ও বলা যাবে না। কোনো জিনিস একই সঙ্গে সৎ ও অসৎ দুই-ই হতে পারে না। সুতরাং এই সর্প সদসৎ-ও নয়। অর্থাৎ এই সর্প সৎ নয়, অসৎ নয়, আবার সদসৎ-ও নয়। শঙ্কর দর্শনে এরই নাম অনির্বচনীয়। শঙ্করের মতে জগতেরও এই প্রকৃতি। ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে শঙ্করের এই ব্যাখ্যা অনির্বচনীয় খ্যাতি নামে পরিচিত। অন্যান্য দার্শনিকেরা এই মত স্বীকার করেন না। বৌদ্ধেরা অসৎ খ্যাতি নৈয়ায়িকেরা অন্যথা খ্যাতি, মীমাংসকেরা অখ্যাতি এবং রামানুজ সৎখ্যাতি প্রচার করেছেন।

বৌদ্ধদের মতে যা অসৎ ভ্রান্তজ্ঞানে তা-ই প্রকাশিত হয়, নৈয়ায়িকদের মতে অন্যথা বস্তু এইখানে ভ্রান্তজ্ঞানে ভাসে, ভাট্ট-মীমাংসকদের মতে ভ্রান্তজ্ঞানে প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির সমন্বয় হয় এবং এদের ভেদ উপলব্ধি হয় না, রামানুজ মতে ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়ও সৎ বস্তু। আমরা রামানুজ ভিন্ন অন্যান্য দার্শনিকদের মতো বিভিন্ন অধ্যায়ে যথাস্থানে আলোচনা করেছি। রামানুজের মতে রামানুজ-দর্শন আলোচনাকালে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করব। এই সমস্ত মত শঙ্কর-মত বিরোধী।

এদের যে কোনো একটা সত্য হলে শঙ্করের জগৎমিথ্যাত্ব মত অগ্রাহ্য হয়ে যাবে। সেইজন্য শঙ্করপন্থীরা এই সমস্ত মত বিস্তারিত ভাবে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে এই খণ্ডন চেষ্টার একটি চমৎকার প্রকাশ পাওয়া যাবে। উৎসাহী পাঠক তা পড়লে উপকৃত হবেন। আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিপুলাকার বলে আমরা তা উদ্ধৃত করছি না।

শঙ্কর নিঃসন্দেহে অধ্যাত্মবাদী। কারণ, তাঁর মতে আত্মাই পারমার্থিক সত্তা ও সত্য। কিন্তু বস্তু ব্যক্তি-জ্ঞানের সৃষ্টি বা বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বস্তু নেই এমন বিজ্ঞানবাদী মতবাদ তিনি কখনোই প্রচার করেননি। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ সত্য। শঙ্কর-মতে জ্ঞান বস্তুতন্ত্র। সুতরাং এই দিক থেকে শঙ্কর রিয়ালিস্ট বা বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী। পারমার্থিক দৃষ্টিতে একমাত্র আত্মাই সত্য। সুতরাং এই দিক থেকে শঙ্কর অধ্যাত্মবাদী।

৩। জীব ব্রহ্মস্বরূপ : শঙ্করাচার্য আপসহীন অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। সুতরাং তাঁর মতে ভেদ বলে কিছু থাকতে পারে না। ভেদ-খণ্ডন অদ্বৈতদর্শনে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। উৎসাহী পাঠক ডঃ অনিলকুমার রায়চৌধুরী লিখিত 'Doctrine of Maya' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা পাবেন। শঙ্করের মতে ভেদ নয়, অভেদ বা অদ্বৈতই আসল কথা। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। জীব স্বরূপত ব্রহ্ম।

জীব এমনিতে আত্মা এবং অনাত্মার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। আত্মা এবং অনাত্মা সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব। আমাদের অভিজ্ঞতা এবং লোকব্যবহার সবই আত্মা এবং অনাত্মার একীকরণ অধ্যাসের ফল (ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর ভাষ্য ১।১।১)। অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধি সংযুক্ত হয়ে আত্মা ভোক্তা বিষয়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তার বার বার জন্ম হয়। আমরা যখন জীবের জন্ম ও বৃদ্ধির কথা বলি, তখন আসলে আত্মার উপাধি অন্তঃকরণ প্রভৃতির যে জন্ম ও বৃদ্ধি হয়, এই কথাই বোঝাতে চাই। আত্মা অনিত্য নয়। সুতরাং তাঁর জন্ম, মৃত্যু ও বৃদ্ধি কিছুই সম্ভব নয়। অনাত্মার সঙ্গে একীকরণ বা অধ্যাসের জন্যই অনাত্মার জন্ম, মৃত্যু ও বৃদ্ধিকে আমরা আত্মার জন্ম, মৃত্যু ও বৃদ্ধি বলে মনে করি। এরই নাম বন্ধন।

অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধিযুক্ত হলে জীব চৈতন্যরূপে অবস্থান করে। এই চৈতন্য জ্ঞানস্বরূপ। এটা কোনো জ্ঞানপ্রক্রিয়া নয়। একে জ্ঞান-তত্ত্ব বলা যেতে পারে। জ্ঞান-প্রক্রিয়া শঙ্করদর্শনে বৃত্তিজ্ঞান নামে পরিচিত। ব্রহ্ম যে অর্থে জ্ঞানস্বরূপ, বৃত্তিজ্ঞান সেই অর্থে জ্ঞান নয়। ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলার সময় জ্ঞানকে একটি তত্ত্ব

(Metaphysical entity) বলে মনে করা হয়। কিন্তু বৃত্তিজ্ঞান বলতে জ্ঞান-প্রক্রিয়া বোঝায়। অন্তঃকরণ বিষয়াকারে পরিণত হলে তা সাক্ষী-ভাস্বর হয়। এরই নাম বৃত্তিজ্ঞান। অন্তঃকরণ পঞ্চভূতের সৃষ্টি। তবে পঞ্চভূতের মধ্যে অন্তঃকরণে তেজসেরই প্রাধান্য। সেইজন্য অদ্বৈত দর্শনে অন্তঃকরণকে তৈজস বলা হয়।

ইন্দ্রিয় বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হলে ইন্দ্রিয়পথে অন্তঃকরণ বহির্গত হয় এবং বিষয়াকার লাভ করে। এই বিষয়াকারে রূপায়িত অন্তঃকরণ সাক্ষী চৈতন্য ভাস্বর হলেই বৃত্তিজ্ঞান জন্মে। সাক্ষী স্বয়ং প্রকাশ, নিজেই ভাস্বর। সাক্ষীকে প্রকাশের জন্য অন্য কোনো জ্ঞানের দরকার হয় না। আমরা এ বিষয় পূর্বে প্রমা, প্রমাণ ও প্রমেয় আলোচনাকালে বিস্তারিতভাবে পরিবেশন করেছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, জীব অন্তঃকরণ বিশিষ্ট আত্মা এবং অন্তঃকরণ মুক্ত আত্মাই জীবনের স্বরূপ; জীব চৈতন্যস্বভাব, অন্তঃকরণ তার উপাধি মাত্র। অনাত্মা বা শরীর আত্মার মতোই জীবে বর্তমান। তবে শরীর আসলে মায়া বা মিথ্যা। শরীর দ্বিবিধ—স্থূল এবং সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করি। ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্তঃকরণ প্রভৃতি মিলে সূক্ষ্ম শরীর গঠন করে। স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর উভয়ই মায়াসৃষ্ট মিথ্যা। আমরা অজ্ঞানের জন্য এই শরীরকে জীবের স্বরূপাঙ্গ বলে মনে করি। আসলে জীব স্বরূপত চৈতন্যস্বভাব। আমরা পূর্বেই দেখেছি, অদ্বৈত মতে চৈতন্য আত্মার স্বরূপ এবং আত্মাই ব্রহ্ম। জীব ও চৈতন্য স্বরূপ হওয়ায় আসলে আত্মা বা ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। চৈতন্য স্বরূপ আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। সাংখ্যকারেরা যে আত্মাকে বহু বলেছেন, তা খুবই অসঙ্গত হয়েছে। দেহের বিভিন্নতার জন্যই জীব বিভিন্ন বলে মনে হয়।

স্বরূপত চৈতন্য-স্বভাব সমস্ত জীবই এক ও অভিন্ন। উপনিষদে 'তত্ত্বমসি' বাক্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নত্বই ঘোষিত হয়েছে। তৎ বলতে চৈতন্যরূপ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এবং ত্বম বলতে জীবাত্মা বুঝতে হবে। জীবের আসল রূপ তাঁর আত্মা বা চৈতন্যেই প্রকাশিত। সুতরাং স্বরূপের দিক থেকে জীবে ও ব্রহ্মে কোনো ভেদ নেই।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—অভেদ বাক্য তো নিরর্থক, তবে তৎ (সেই) ত্বম্ (তুমি), একথা বলে লাভ কী? রাম রাম একথা তো কেউ বলে না। এই ক্ষেত্রে শঙ্কর বলেন, সাধারণত জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন মনে করা হয়। 'তত্ত্বমসি' বাক্যে এই ভিন্নত্ববোধ যে মিথ্যা তা-ই নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং এইবাক্য নিরর্থক হবে কেন?

জীব যে স্বরূপত চৈতন্যস্বভাব, শঙ্কর তা জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থা বিশ্লেষণ করেও দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, জাগ্রত অবস্থায় চৈতন্য ও বিষয় দুই-ই থাকে, স্বপ্নকালে চৈতন্য ও বিষয়ের স্মৃতি বর্তমান। কিন্তু সুষুপ্তিকালে শুধু চৈতন্যই বর্তমান। সেখানে তো কোনো সাধারণ বিষয় নেই। আমরা সুষুপ্তিতে যে আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করি তা আত্মচৈতন্যরই আনন্দ। কারণ, সেই অবস্থায় আত্মচৈতন্য ভিন্ন আর তো কিছুই থাকে না। বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় অবাধিত যে আত্মচৈতন্য তাকেই জীবনের স্বরূপ বলে গ্রহণ করতে হবে। কারণ যা বাধিত বা নাই হয়ে যায় তা তো কখনোই সত্য হতে পারে না। সুষুপ্তিতে জীবাত্মার স্বরূপের যে আভাস পাওয়া যায়, সাধক সমাধি কালে তূরীয় অবস্থায় তা-ই সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন। জীব যে স্বরূপত চৈতন্য ও আনন্দরূপ আত্মা এই উপলব্ধির নামই মুক্তি। জীব স্বরূপতই চৈতন্য ও আনন্দরূপ আত্মা বলে জীব স্বরূপতই মুক্ত। অর্থাৎ জীব স্বরূপে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা।

অদ্বৈতবাদীরা 'তত্ত্বমসি' বাক্যকে অখণ্ডার্থবোধক বলে উল্লেখ করেন। বেদান্তসার গ্রন্থে পদের সম্বন্ধত্রয় স্বীকৃত হয়েছে। সামানাধিকরণ, বিশেষণ-বিশেষ্যভাব এবং লক্ষ্যলক্ষণভাব এই সম্বন্ধত্রয়। সামানাধিকরণ বলতে একই অধিকরণ বিশিষ্ট দুটি পদের সম্বন্ধ বোঝায়, বিশেষণ-বিশেষ্যভাব বলতে পরস্পরকে বিশিষ্ট করে এমন দুটি পদের সম্বন্ধ (যা একটি সাধারণ বস্তুকে নির্দেশ করে) বোঝায়, লক্ষ্যলক্ষণভাব বলতে দুটি পদ যা অভিন্ন বিষয়ে (যেমন প্রত্যগাত্মা) তাৎপর্য প্রকাশ করে তাদের সম্বন্ধ বোঝায়।

'সোহয়ং দেবদত্তঃ' এই বাক্যে 'সঃ' পদ অতীতের দেবদত্তকে বোঝায় এবং 'অয়ং' পদ বর্তমানের দেবদত্তকে বোঝায়। তবে এ দুটি পদই একই ব্যক্তি দেবদত্তকে নির্দেশ করে। এখানে সমানাধিকরণ্য হয়েছে।

'তত্ত্বমসি' বাক্যের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে 'তৎ' পদ পরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্য এবং 'ত্বম' পদ অপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্য বোঝায় এবং এরা উভয়ই একই চৈতন্য অর্থাৎ ব্রহ্মকে নির্দেশ করে।

বিশেষ্য-বিশেষণভাব নিম্নরূপ। 'সোহয়ং দেবদত্ত' এই বাক্যে 'সঃ' পদ অতীতে অবস্থিত দেবদত্ত এবং 'অয়ং' পদ বর্তমান দেবদত্ত বোঝায়। 'সঃ' এবং 'অয়ং' পদ বিপরীত হলেও তারা পরস্পরকে বিশেষিত করে এবং একই দেবদত্তকে নির্দেশ করে। অনুরূপভাবে 'তত্ত্বমসি' বাক্যে তৎ পদ পরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্য এবং 'ত্বম্' পদ অপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্য বোঝায়। 'সঃ' এবং 'অয়ং' বিপরীত হলেও এরা পরস্পরকে বিশেষিত করে এবং একই চিৎ বা ব্রহ্মে তাৎপর্য প্রকাশ করে।

লক্ষ্যলক্ষণভাব এইরূপে দৃষ্ট হবে। 'সোহয়ং দেবদত্তঃ' এই বাক্যে 'সঃ' এবং 'অয়ং' পদদ্বয় লক্ষ্যলক্ষণভাব সম্বন্ধে একই দেবদত্তে তাৎপর্য প্রকাশ করে। অনুরূপ ভাবে 'তত্ত্বমসি' বাক্যে 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদদ্বয় লক্ষ্যলক্ষণভাব সম্বন্ধে একই চিৎ বা ব্রহ্ম বোঝায়।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় লক্ষণা ত্রিবিধ—জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা এবং জহদজহল্লক্ষণা। জহল্লক্ষণা—যখন বাক্যের মুখ্য অর্থ বর্জন করে গৌণ অর্থে গ্রহণ করা হয় তখন জহল্লক্ষণা হয়। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বলতে মুখ্য অর্থ 'গঙ্গায় ঘোষপল্লি' পরিত্যাগ করে গৌণ অর্থ—'গঙ্গা-তীরে ঘোষপল্লি' গ্রহণ করা হয়েছে। যখন বাক্যের মুখ্য অর্থ সম্পূর্ণ ত্যাগ না করে কিছুটা গ্রহণ করে অর্থ প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে বলে অজহল্লক্ষণা।

'শ্বেতং ধাবতি' বললে আমরা 'শ্বেত' বিশেষণটি গ্রহণ করে তার সঙ্গে 'অশ্ব' পদ যুক্ত করে বাক্যার্থ নির্ণয় করে বলি 'শ্বেতঃ অশ্বঃ ধাবতিঃ'। যখন কোনো বাক্যের মুখ্য অর্থের অংশ বিশেষ বর্জন করে এবং অংশবিশেষ গ্রহণ করে বাক্যের অর্থ নির্ণয় করা হয়, তখন জহদজহল্লক্ষণা হয়ে থাকে।

'সোহয়ং দেবদত্তঃ' বাক্যে 'সঃ' এবং 'অয়ং' অংশের বর্জন হয় এবং 'দেবদত্ত' অংশ শুধু গ্রহণ করা হয়। অনুরূপভাবে 'তত্ত্বমসি' বাক্যে তৎ এর পরোক্ষত্ব, সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি এবং ত্বম্-এর অপরোক্ষত্ব, কিঞ্চিতজ্ঞত্ব প্রভৃতি পরিত্যাগ করে শুদ্ধ চিৎ যা তৎ ও ত্বম্-এ সমভাবে বর্তমান, তা-ই গ্রহণ করা হয়েছে।

এখানে জহদজহল্লক্ষণা হয়েছে। বস্তুত তৎ ও ত্বম্ অখণ্ড অর্থ প্রকাশ করে। 'তত্ত্বমসি' বাক্যজন্য সংসর্গানবগাহী জ্ঞান হয়। অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' বাক্যের জ্ঞান স্থলে কোনো সংসর্গ জ্ঞানের বিষয় নয়। 'তৎ' ও 'ত্বম্' স্বরূপত অভিন্ন বলে 'তত্ত্বমসি' বাক্যজন্য জ্ঞান সম্বন্ধ অবিষয়ক অর্থাৎ সম্বন্ধ বা সংসর্গ বিষয়ক নয়। চিৎসুখাচার্য বলেছেন—

সংসর্গাসঙ্গি সম্যগধীহেতুতা যা গিরামিয়ম্।
উক্তাখণ্ডার্থতা যদ্বা তৎ প্রাতি পদিকার্থতা।।

সম্বন্ধ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের জনকতাই বাক্যের অখণ্ডতা। অথবা প্রাতিপদিকার্থ (শব্দার্থ) মাত্র বোধকথাই অখণ্ডার্থতা।

জীবের বন্ধন ও মুক্তি : জীব হল একটি নিত্য এবং শুদ্ধ আত্মা। জীবকে বুদ্ধ ও মুক্ত আত্মাস্বরূপ চিন্তা করতে পারি। তবে জীব তার এই স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে বসবাস করে। অজ্ঞানতার জন্য জীব ঠিকমতো নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে না। সে অনাত্মা দেহের সঙ্গে তার একাত্মতা অনুভব করে। তাই দেহের জন্মকে নিজের জন্ম বলে মনে করে। দেহের মৃত্যুকেই ভাবে নিজের মৃত্যু। এরই নাম হল বন্ধন। জীব স্বরূপের অজ্ঞানই হল এই বন্ধনের আসল কারণ।

কীভাবে আমরা এই অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে নিজেদের অন্য কোথাও নিয়ে যাব? শঙ্করের মতে এই অজ্ঞানতা দূর করতে হলে জীব স্বরূপের সাক্ষাৎ জ্ঞান অর্জন করা দরকার। তবে যে কেউ খুব সহজে এই জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। এরজন্য বিশেষ প্রস্তুতির দরকার। কীভাবে আমরা এই প্রস্তুতি করব? অনেক বেদান্ত ভাষ্যকার বলেছেন, কর্ম-মীমাংসা নির্দিষ্ট যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর প্রস্তুতি করা যেতে পারে। মহর্ষি শঙ্কর অবশ্য এ বিষয়ে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন—যাগযজ্ঞকর্ম উপাস্য এবং উপাসকের ভেদবুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এই ভেদবুদ্ধি আসে অজ্ঞানতা থেকে। তাই যাগযজ্ঞ করলে কোনো লাভ

হয় না। যে যাগযজ্ঞ অজ্ঞানতার দ্বারা উৎপাদিত তার দ্বারা আমরা কী সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারি? যাগযজ্ঞের ফল হল অভ্যুদয় বা স্বর্গলাভ, এই ফল ক্ষণস্থায়ী। মুক্তি নিত্য-সিদ্ধ-স্বভাব। কর্মকাণ্ড এই স্বভাব উপলব্ধির পক্ষে সাক্ষাৎভাবে প্রয়োজনীয় নয়।

বেদান্তের অধিকারী এই বিষয়ে সদানন্দ বেদান্তসার গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যিনি বিধিপূর্বক বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং তার মূল মর্ম গ্রহণ করেন, তিনিই প্রকৃত অধিকারী। যে ব্যক্তি ইহজন্মে কি জন্মান্তরে কাম্য কর্ম এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করতে পারেন তিনিই হলেন অধিকারী। যিনি নিত্য-নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্য অনুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাপ ও নির্মল চিত্তে থাকেন তিনিই প্রকৃত অধিকারী।

কাম্য কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সদানন্দ বলেছেন শাস্ত্রে স্বর্গ কী অন্যান্য সুখের কামনায় যে সমস্ত কর্ম করার উপদেশ আছে সেগুলি হল কর্মকাম্য। যেমন—জ্যোতিষ্টোম যাগ, সোমযাগ, রাজসূয় যজ্ঞ ইত্যাদি।

আবার নিষিদ্ধ কর্ম বলতে কী বোঝানো হয়েছে? নরক কী অন্য কোনো অনিষ্টের হেতু বলে শাস্ত্রে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলি নিষিদ্ধ কর্ম। এই তালিকাতে আছে ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, বৃথা হিংসা প্রভৃতি।

যেগুলি না করলে আমাদের সঞ্চিত পাপ থেকে যায়। যেমন সন্ধ্যাবন্দনা—তাকে নিত্যকর্ম বলে।

যে সমস্ত কর্ম কোনো একটি বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হয়, তা হল নৈমিত্তিক কর্ম। যেমন—পুত্রেষ্টিযজ্ঞ এবং জাতকর্ম।

যে সমস্ত কর্ম শুধুমাত্র পাপক্ষয়ের জন্য হয়ে থাকে, যেমন—চান্দ্রায়ন প্রভৃতি তা প্রায়শ্চিত্য। শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবলম্বন করে সগুণ ব্রহ্মে মনোনিবেশ করাকে উপাসনা বলা হয়। শাস্ত্রে নানা ধরনের উপাসনার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে 'শাণ্ডিল্য বিদ্যা' হল প্রধান।

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে, আত্যন্তিক জ্ঞানলাভের জন্য চতুর্বেদ অভ্যাস এবং সাধন চতুষ্টয় অর্জন করা দরকার। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহামূত্রার্থ ফলভোগ বিরাগ, শমদমাদি সাধন সম্পদ, মুমূক্ষুত্ব চারটি অভ্যাস বা চারটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে। এই জগৎ এবং পরজগতের সর্বকর্মফল ত্যাগ করতে হবে। ইন্দ্রিয় সংযম এবং সন্তোষ দ্বারা সদগুণের অধিকারী হতে হবে। মুক্তির জন্য ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করতে হবে। তবেই আমরা ওই পর্বে পৌঁছোতে পারব।

৬টি বিষয়কে সমাদিষটক বলা হয়। এই ৬টি বিষয় হল—শম্, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা এবং মুমূক্ষুত্ব। আমরা একে একে এই ৬টি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করব।

'শম্' বলতে কী বোঝায়? শম হল অন্তরিন্দ্রিয়ের নিয়ম। আত্মজ্ঞানের অনুপযোগী বৃথা বিষয় থেকে অন্তঃকরণকে প্রতিনিবৃত্ত করাকেই বলে শম।

'দম' অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় দমন। আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতার বিষয় থেকে অন্তঃকরণকে দূরীভূত করাকে দম বলে।

বিষয়ের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হলে যাতে পুনরায় মনের মধ্যে এই জাতীয় আকাঙ্ক্ষার জন্ম না হয় তাকেই বলে উপরতি।

শীতোষ্ণ, মানোপমান, শোক, হর্ষ প্রভৃতিতে উদ্বিগ্ন না হওয়া হল তিতিক্ষা। আমরা যখন গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস রাখব আমাদের মনে শ্রদ্ধাভাব জাগ্রত হবে।

মুক্ত হবার ইচ্ছা হল মুমূক্ষুত্ব।

এইভাবে ধাপে ধাপে মানুষ নিজেকে প্রস্তুত করবেন। তারপর তিনি ব্রহ্মত্বের কাছে পৌঁছে যাবেন। কায়মনবাক্য কেন্দ্রীভূত করে শ্রবণ করবেন উপনিষদের সেই চিরন্তন বাণী 'তত্ত্বমসি'। ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে এক অন্যভাবনার উদ্বোধন ঘটে যাবে। তিনি স্থিরচিত্তে কোনোকিছুর বিবেচনা করবেন। এই ব্যাপারে অনন্ত অসম্ভাবনা দূর করবেন। যুক্তিতর্ক ও মনন দ্বারা বিপরীত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবেন।

এই তত্ত্বে গভীরভাবে নিবিষ্ট হবেন। অবশেষে তিনি হবেন ধ্যানমগ্ন। ক্রমশ তাঁর জ্ঞানের পরিধি দশদিগন্তে পরিব্যাপ্ত হবে। জ্ঞানের আলোকে সমস্ত অন্ধকার হবে অপসৃত। অবশেষে তিনি সেই শাশ্বত তত্ত্ব উপলব্ধি করবেন যে 'সোহহম্' অর্থাৎ আমিই সেই আত্মা বা ব্রহ্ম।

যেভাবে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে মেঘ অপসারিত হলে সূর্য প্রকটিত হন, ঠিক সেইভাবেই অজ্ঞান অন্ধকারের অবসানে আত্মচৈতন্য স্বরূপ সূর্য প্রকট হয়ে উঠবেন। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, তা হল, এই অবস্থায় পৌঁছোনো কিন্তু সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এই মুক্তি কোনো লব্ধ জিনিস নয়। এর জন্য দৃঢ়-সংকল্প এবং কঠিন কঠোর অনুশাসন প্রয়োজন।

মুক্তিকে আমরা নিত্য শুদ্ধ স্বরূপ ধরব। জীব নিত্যই স্বরূপত্ব সচ্চিদানন্দ আত্মার মধ্যে বিরাজ করবেন। ভ্রান্তির জন্য জীব এই পরম সত্য বিস্মৃত হন। মুক্তি অর্থাৎ বিস্মৃতি-বিদূরণ। মুক্তি অর্থে আমরা নতুন কিছু পাই না। যা আমাদের মধ্যে নিহিত ছিল তাকে উপলব্ধি করতে পারি। তাই শঙ্করের দর্শনের মুক্তির উপলব্ধিকে বলা হয় প্রাপ্তপ্রাপ্তি। মুক্তি হল জীবের নিত্য প্রাপ্যস্বরূপ। বিস্মৃতি অপসারণের পর এই প্রাপ্ত বিষয়টিকেই আমরা আবার গ্রহণ করি। তাই একে বলে পুনঃপ্রাপ্তি। তাই যখন পরমব্রহ্মজ্ঞ আমাদের এ বিষয়ে অবগত করেন তখন মনে হয় আমরা যেন নতুন করে এই অনুধ্যানটিকে গ্রহণ করতে পেরেছি।

মুক্ত হলেও জীবের দেহ থাকতে পারে। কিন্তু সে যে দেহের সঙ্গে অভিন্ন, এই বোধ আর তার মধ্যে থাকে না। তখনো জগৎ তার কাছে দৃশ্যমান হতে পারে। কিন্তু তিনি জগতের বিভিন্ন জাদুকরী কর্মপদ্ধতির দ্বারা আর বিভ্রান্ত হন না। জাগতিক কোনো বস্তুর প্রতি তাঁর মনে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বা আসক্তি থাকে না।

এই অবস্থায় তাঁর মনের মধ্যে একটি আশ্চর্য বোধের জাগরণ হয়, তিনি জগতে বাস করেও জগতের তিনি কেউ নন। এই অবস্থাকে শঙ্কর-দর্শন জীবন্মুক্তি নামে অভিহিত করেছে। বৌদ্ধ, সাংখ্য, জৈন প্রমুখ দার্শনিকদের মতো শঙ্করও বলেছেন আমরা এই জীবনে পরিপূর্ণতা বা মুক্তিলাভ করতে পারি।

এখন প্রশ্ন উঠবে যে দেহ যদি অজ্ঞানজন্য হয়, তবে মুক্তিতে অজ্ঞান নষ্ট হলেও দেহ কেন থাকবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শঙ্করপন্থীরা নানা কথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন মানুষের ত্রিবিধ কর্ম থাকে—প্রারব্ধ, সঞ্চিত এবং সঞ্চিয়মান। যে কোনো কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। আমরা যেমন কর্ম করব তেমন ফল লাভ করব।

প্রারব্ধ কর্ম বলতে কী বোঝায়? যে কর্ম ফল দিতে শুরু করেছে তা-ই হল প্রারব্ধ কর্ম। আর যে কর্মফল সঞ্চিত আছে তাকে বলে সঞ্চিত কর্ম। যে কর্ম এখন করা হচ্ছে তা হল সঞ্চিয়মান কর্ম।

জ্ঞানকে আমরা সঞ্চিত কর্মের কর্মফল নাশক বলতে পারি। জ্ঞানদ্বারা সঞ্চিয়মান কর্মফল নাশ হয়। কিন্তু যে প্রারব্ধ কর্ম ফল দিতে শুরু করেছে তাকে কি আমরা রোধ করতে পারি?

দেহ ধারণ হল প্রারব্ধ কর্মের একটি অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। যদি একটি চক্র আবর্তিত হয় এবং পুনরায় তাকে সাহায্য করা না হয় তাহলে একসময় সেই আবর্তন শেষ হবে। ঠিক সেইভাবে প্রারব্ধ কর্মফল নিঃশেষিত হলে দেহ বিনষ্ট হয়ে যায়। এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মুক্তি হলেও দেহ থেকে যায়। দেহের বিনষ্টি হলে দেহ মুক্তি লাভ করে।

কর্মসন্ন্যাসের প্রকৃতি সম্পর্কে শঙ্করবাদীরা নানা কথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন জীব মুক্ত হয়েও কর্মফল বাসনা ত্যাগ করে কাজ করতে পারে। এই অবস্থায় জীব যে কাজ করে সেখানে কর্মফলের কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না। থাকে না বন্ধনের সামান্যতম আশঙ্কা। গীতার বিভিন্ন ভাষ্যকে উত্থিত করে শঙ্কর বলেছেন, সকাম কর্মই হল বন্ধনের হেতু। নিষ্কাম কর্মকে আমরা কর্মসন্ন্যাসের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এটি হল আমাদের বৈরাগ্য অবস্থা, এই অবস্থায় মানুষ কখনোই আবদ্ধ থাকে না। যে ব্যক্তি আত্যন্তিক জ্ঞান লাভ করেননি, তিনি কিন্তু এই জাতীয় কর্ম করে আত্মশুদ্ধি সহায়ক হয়ে উঠতে পারেন। যিনি জ্ঞান লাভ করে মুক্ত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে নিষ্কাম কর্ম, যাঁরা এখনো মুক্ত হননি তাদের কল্যাণের জন্য করা প্রয়োজন।

মুক্ত জীব সমাজের আদর্শস্বরূপ বিরাজ করেন। উপনিষদে বলা হয়েছে যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তিনি ব্রহ্ম হয়েছেন, তাই এই বিষয়ে আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়। জীব স্বরূপত সচ্চিদানন্দ আত্মা। ব্রহ্মকেও আমরা তা-ই বলতে পারি। তাই জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই। জীবস্বরূপ জ্ঞান যখন আমরা অর্জন করি তখন বুঝতে পারি জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে এক অলৌকিক ঐক্য বিদ্যমান।

অনেক সমালোচক বলে থাকেন অদ্বৈতদর্শনে ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে সমস্ত ভেদ মিথ্যা। তাই ন্যায় এবং অন্যায়ের ভেদও মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হবে। যদি মানুষের মনে একবার এই ধারণা জন্মায় যে, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই তাহলে সমাজ, সংস্কৃতি সংসার বজায় থাকবে কী করে? এই প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব দিতে গিয়ে শঙ্কর অনুগামীরা বলেছেন যে, শঙ্কর ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ভেদকে অস্বীকার করেননি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আন্তন্তিক জ্ঞান লাভ না করে মুক্ত না হতে পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহারিক দৃষ্টিকে আমরা সত্য বলে উপলব্ধি করব। এই অবস্থায় একজন মানুষের কাছে ন্যায়-অন্যায় ভেদ সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। মুক্ত জীবের কাছে ন্যায়-অন্যায়ের কোনো ভেদ নেই। কারণ তাঁর কাছে এই জগৎ পরিদৃশ্যমান নয়। তাঁর ন্যায়-অন্যায়, ভেদ বুদ্ধি না থাকলে জগতের লোকের কোনো ক্ষতি হবে কী? তিনি কখনোই দুষ্কর্ম করতে পারবেন না। কারণ সকাম কর্ম হল তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

শঙ্করাচার্যের জীবনের ব্রত ছিল ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া বৌদ্ধধর্মের গ্রাস থেকে প্রাচীন বৈদিক ধর্মকে উদ্ধার করা, যাতে ভারতের আপামর জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু ধর্মের মূল সত্যগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেজন্য তিনি জীবনব্যাপী সাধনা করে গেছেন। হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর এই প্রয়াসের কথা বার বার আলোচনা করেছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকরা বলেছেন পূর্ব-মীমাংসা দর্শনের ভাষ্যকার কুমারিল ভট্ট এবং অদ্বৈতবাদী শঙ্কর ছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৌদ্ধ দর্শনের প্রথম ও প্রধান সমালোচক। শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে অদ্বৈতমত প্রতিপাদনের জন্য এই মতবিরোধী সমস্ত তত্ত্বকে যুক্তি দিয়ে নস্যাৎ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ মত খণ্ডন করাকেই আমরা তাঁর সবিশেষ কৃতিত্ব বলব। কারণ তখন রাজানুগ্রহে বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের ধর্ম হয়ে উঠেছিল।

সেকালের হিন্দু ধর্মের ভিতর বেশ কিছু কুসংস্কার থাকায় সাধারণ মানুষ হিন্দু ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মের আধুনিক প্রগতিপন্থী কল্যাণবাচক দিকগুলির প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে থাকেন। কিন্তু শঙ্কর যখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিস্পর্ধী একটি ধর্মমতকে উত্থাপিত করেন তখন তিনি বৌদ্ধচিন্তার দ্বারা বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। গৌতমবুদ্ধের জীবন এবং দর্শন তাঁকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। পদ্মপুরাণে মায়াবাদকে অসৎ শাস্ত্র এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলে অভিযোগ করা হয়েছে। বৌদ্ধরাও অদ্বৈতবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানবাদী এবং শূন্যবাদী বৌদ্ধমতের সদৃশ্যতার কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। অদ্বৈতমতকে অনেকে বৌদ্ধবাদ এবং শূন্যবাদের সংমিশ্রণ দ্বারা সৃষ্ট বলে ঘোষণা করেছেন। শঙ্কর যখন নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলেন তখন মনে হয় তিনি শূন্যবাদীদের শূন্যের কথাই বলছেন। শঙ্কর অদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য বৌদ্ধধর্ম অনুসৃত বেশ কয়েকটি বিষয়কে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। শঙ্করের গুরুদেব গৌরপাদ তাঁর মাণ্ডুক্য কারিকায় বৌদ্ধদের ব্যবহৃত অনেক শব্দের উপমাকে নতুন আঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর বক্তব্যে এমন কিছু দিক আছে যা শুনলে মনে হয় আমরা বুঝি এক মহান বৌদ্ধ দার্শনিকের মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী শ্রবণ করছি। শিষ্য শঙ্করও তাই বৌদ্ধ মতের দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক সত্যটি আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

যদি আমরা নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে শঙ্কর দর্শন বিশ্লেষণ করি তাহলে বুঝতে পারব তাঁর মতবাদ উপনিষদ এবং ব্রহ্মসূত্র থেকে সযত্নে সংগৃহীত হয়েছে। বৌদ্ধ প্রভাব এই মতবাদের মধ্যে কিছু মাত্রায় বিদ্যমান সেকথা স্বীকার করতে হবে। কারণ শঙ্করের মতবাদ এবং বৌদ্ধ মতবাদ উভয়ই উপনিষদ-ভিত্তিক। এই তথ্যটিকে অস্বীকার করা উচিত নয়। অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণভাবেই বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত একথা কখনোই বলা যায় না।

বৌদ্ধদের সঙ্গে আলোচনাকালে শঙ্কর বারবার বৌদ্ধ ধর্মের একাধিক বৈসাদৃশ্যের বিরুদ্ধে শাণিত তরবারির মতো যুক্তিতর্ক ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের অস্ত্র দিয়েই তিনি প্রতিপক্ষকে আঘাত করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয় তাঁর বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বগুণ কোন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। বৌদ্ধদের মত খণ্ডন করার জন্য শঙ্কর বৌদ্ধদের তার্কিক বিচারশৈলীকে বারবার অসাধারণ নৈপুণ্যে পরাস্ত করেছেন।

এখানে আর-একটি কথা পরিষ্কারভাবে বলা উচিত, তা হল শূন্যবাদীরা যে শূন্যের কথা বার বার ঘোষণা করেছেন তা অদ্বৈত বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম হতে পারে না। কারণ শঙ্কর বলেছেন, ব্রহ্ম নির্গুণ একথা সত্য, কিন্তু ব্রহ্ম শূন্য নন, তিনি সৎ, চিৎ এবং আনন্দের স্বরূপ। পূর্ণব্রহ্ম কখনোই শূন্য হতে পারেন না। শঙ্কর ব্রহ্মকে সপ্রকাশ বলেছেন আর বৌদ্ধরা বলেছেন অপ্রকাশ নয়, স্বপ্রকাশ নয়। এক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে যে শঙ্কর এমন কিছু কথা তাঁর ভাষ্যে প্রকাশ করেছেন যা বৌদ্ধধর্মের বিপরীত কথাই বলে।

শঙ্কর-দর্শন সম্পর্কে আলোচনার একেবারে অন্তিম পর্যায়ে আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে, উপনিষদের সমগ্র অস্তিত্বের মৌলিকৃত এক ও একক কেন্দ্রীয় সত্তার কথা উচ্চারিত হয়, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ হল এই ধ্যান ধারণার দার্শনিক উপস্থাপনা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দর্শন-চিন্তার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু শঙ্করের মতো কেউ এত সু-সঙ্গতভাবে কোনো একটি ধর্মমতকে প্রকাশ করেননি। এই প্রসঙ্গে উইলিয়ম জোন্সের মতো বিখ্যাত মানুষ বলেছেন, ‘‘The paragon at all, monistic systems is the vedanta philosophy of Hindustan.’’ অর্থাৎ জগৎ, জীব, প্রকৃতি সবকিছু নিয়ে এই তত্ত্ব কাজ করেছে। এই তত্ত্বের মধ্যে একদিকে আছে বৌদ্ধিক জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে চিন্তার বলিষ্ঠতা। হয়তো সাধারণ মানুষের কাছে এই অদ্বৈতবাদের সবকিছু বিষয় ঠিকমতো অনুভূত হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু যাঁরা উপযুক্ত প্রণিধান সহকারে অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে পঠনপাঠন করবেন, তাঁরা এই মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। অদ্বৈতবাদ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সু-উন্নত করে তোলে। আমাদের সাংস্কৃতিক অভিযাত্রাকে করে অহংকারী এবং আলংকারিক। বিশ্বের কাছে ভারতীয় দর্শনের যে পরিচয় তা কিন্তু এই অদ্বৈতবাদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দও শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে এই মতবাদেরই জয়গান গেয়েছেন। তাই শঙ্করকে আমরা ভারতীয় দর্শনবিদ্যা-বিশারদদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে অবশ্যই গণ্য করব। তাঁর আবির্ভাব যদি না হত তাহলে ভারতবর্ষ আবার বৈদিক হিন্দুধর্মের অধীনে আসতে পারত না। আজও ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী, এর জন্য আমরা অবশ্যই শঙ্করাচার্যের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব।